ভারতে
মুসলিম সংস্কৃতির ক্রমবিকাশ

[প্রথম খণ্ড]

মোবারক করীম জওহর

বজ্মুলুল্লাহ্ মশনের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি, স্কুল-মাদ্রাসা ও কলেজের
বিভিন্ন আরবী, উর্দূ ও বাংলা গ্রন্থ প্রণেতা।



স্ট্যাণ্ডার্ড পাবলিশার্স
২৫-২৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-৭০০০০৭

প্রথম প্রকাশ :
আশ্বিন, মহালয়া—১৩৬৭

প্রকাশক :
রমানাথ ঘোষ
স্ট্যাণ্ডার্ড পাবলিশার্স
২৫-২৬ কলেজ-স্ট্রীট :মার্কেট
কলিকাতা-৭

শ্রীশুভেন্দু রায়
রামকৃষ্ণ-সারদা: প্রিণ্টার্স
৯এ, রামধন মিত্র লেন
কলিকাতা-৫

প্রচ্ছদ :
জয়ন্ত চৌধুরী

বাঙালী মুসলমানদের একমাত্র মুখপত্র ঐতিহ্যবাহী
দৈনিক 'পয়গাম' পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক
আবদুল জলিল তরফদারকে

প্রকাশকের নিবেদন

প্রকাশকের নিবেদন এটা একটা চলিত ধারা মাত্র, কারণ সচেতন পাঠক নিজেই খুঁজে বের করেন তার মানসিক পুষ্টির উপকরণ, প্রকাশকের আবেদন নিবেদন সেখানে ব্যর্থ। যদি সেই পুষ্টির উপকরণ যোগাতে অঙ্গীকারবদ্ধ প্রকাশক হন বিশ্বাসঘাতক। পাঠকের জন্য আমি এই প্রতিজ্ঞা পূরণের প্রচেষ্টায়………এই বইখানি প্রকাশে যত্নবান হয়েছি। এখন এই বইখানি সহৃদয় প্রতিটি পাঠকের কাছে পৌছে দেওয়া শুধু দায়িত্ব। পুষ্টি এনেছে কিনা সে বিচার পাঠকের তবে লেখকের বলিষ্ঠ প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানাই।

বইখানি প্রকাশে যাঁর উৎসাহ ও পরামর্শ বিশেষ-ভাবে আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছে তিনি হলেন অশ্বিনীনগর নরনারায়ণ গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক। তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা আমার নেই। সমস্ত প্রুফই দেখে দিয়েছেন লেখক স্বয়ং; সুতরাং আশা করা যায় তাঁর দৃষ্টি এড়ানো ভুল ত্রুটির সংখ্যা হবে নগন্য।

সবশেষে প্রেস ও বাইণ্ডারের প্রতিটি কর্মী যে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে কাজ করেছেন তাঁদের সবার কথা বিশেষভাবে স্মরণ করছি।

ইতি—

শ্রীরামনাথ ঘোষ

ভূমিকা

(১)

*　　*　　*　　*

সংস্কৃতি কথাটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। ইংরেজীতে যাকে কালচার বলে বাংলায় তাকে আমরা সংস্কৃতি বলতে পারি। অনেকে কালচার কে কৃষ্টি বলে থাকেন। জাতির মানস-প্রকৃতি,শিল্প, সাহিত্য, শিক্ষা-দীক্ষা, রাজনীতি, ঐতিহ্য প্রভৃতির কল্যাণ সংযোগে তার সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। এক কথায় বলতে গেলে, জাতির পরিচয়ই তার সংস্কৃতিতে। বহু দিনের নানা ধ্যান ধারণা এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে আমাদের (ভারতীয়দের) নিজস্ব সংস্কৃতি গড়ে ওঠেছে।

সেদিনের কথা, মোঘল-পাঠান আমলে বাঙালী সংস্কৃতি সম্মিলিত শক্তির সংস্কৃতি রূপ ধারণ করে। এ সময় থেকে বাঙালীর সংস্কৃতি ক্রমোৎকর্ষের পথ বেয়ে অগ্রসর হতে থাকে। বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন বৌদ্ধগান ও দোঁহা প্রাক-মুসলমান যুগের বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। দ্বাদশ শতাব্দী হতে আরম্ভ করে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত দীর্ঘ ছয় শতাব্দী ধরে বাঙালীর সাহিত্য সাধনায় চরম বিকাশ ঘটে ; মঙ্গল কাব্য, পদাবলী, জীবনী কাব্যের মুসলমান কবিদের ধর্ম নিরপেক্ষ প্রণয়মূলক রচনা প্রভৃতিতে।

মুসলমান স্যুফীভাবাদর্শ বাঙালীর ধর্ম কিতাবে অনেক গান প্রভাবিত করে। মুসলমানরাও এদেশকে নিজেদের মাতৃভূমি বলে অকুণ্ঠ চিত্তে স্বীকার করে নেন। এবং তার পর থেকে হিন্দু মুসলমানের সম্মিলিত বাঙালী সমাজ মধ্যযুগের বাংলাদেশকে সংস্কৃতির গৌরবাসনে প্রতিষ্ঠিত করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে (১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে) বাঙালীর জাতীয় জীবনে ভাগ্য বিপর্যয় ঘটে। পলাশী প্রাঙ্গনে বাঙালী তার স্বাধীনতা হারায়। পলাশী প্রাঙ্গনে যে পরাজয় তা বাঙালী হিন্দু মুসলমানেরই পরাজয়

সুদূর দেশাগত ইংরেজ এই দেশকে তার উপনিবেশ হিসাবে গ্রহণ করল। পূর্বে যে মুসলমান সংস্কৃতি ও হিন্দু সংস্কৃতি মোটামুটি একটা সমন্বয়ে এসে নিজেদের প্রায় এক করে নিয়েছিল—তার ওপর ইংরেজরা আঘাত হানল। ফলে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের এক প্রকার ফাটল ধরলেও একেবারে বিনষ্ট হয়নি। বরং তা মূল্যায়নের অভাবে বার বার বাধা প্রাপ্ত হয়েছে মাত্র। সংস্কৃতি শব্দ দ্বারা এক কথায় বা সোজা কথায় উৎকর্ষ বুঝায়। উৎকর্ষ বহু ব্যাপক ভাবধারার অর্থবোধক একক শব্দ। উৎকর্ষ নানা ধরণে নানা বিষয়ে হতে পারে: মনের উৎকর্ষ, চিন্তাধারার উৎকর্ষ, চলা-ফেরা, খাদ্য-খাওয়া, পোষাক-পরিচ্ছদ এমনি বহু উৎকর্ষ চিন্তা ভাবনা, বিচার বিবেচনার মধ্যে গণ্য করা যেতে পারে। সব কিছুর উৎকর্ষ দ্বারা সংস্কৃতি রূপলাভ করে অথবা সংস্কৃতি গড়ে তুলতে সাহায্য করে। উৎকর্ষতা দ্বারাই সংস্কৃতির সৃষ্টি, উৎকর্ষতাই সংস্কৃতির মাপকাঠি। দুগ্ধের উপরে যেমন ননী ভাসে, উৎকর্ষতার উপর সংস্কৃতি তেমনি দানা বাঁধে। অন্য কথায় উৎকর্ষতা মূল ও কাণ্ড, সংস্কৃতি শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট মহীরুহ। চেতনা ও চিন্তা ধারা, আত্মিক ও ব্যবহারিক জীবন, জীবন-যাত্রা, সংস্কৃতি রূপ মহীরুহে রস স্বরূপ ক্রিয়া প্রকাশ করে। ফলতঃ সংস্কৃতির মধ্যে মানুষ ও জাতির সব কিছুর ছাপ বর্তমান ও তার চিহ্ন বহন করে। সুতরাং সংস্কৃতি অত্যন্ত মূল্যবান সম্পদ ও কোন জাতির ও দেশের সামগ্রিক রূপের পরিচয় বহনকারী সাক্ষ্য স্বরূপ। যে জাতির নিজস্ব সংস্কৃতি নেই সে জাতির আত্ম পরিচয় দেবার কোন সার্থকতা নেই।

এই সংস্কৃতির মূল্যায়ন হলে তদ্বারা যা পাওয়া যায়, তাই ঐতিহ্য রূপে দাঁড় করান হয়। বস্তুতঃ ঐতিহ্য সংস্কৃতির অতীব গৌরবের সনদ মাত্র। সংস্কৃতি ব্যতীত ঐতিহ্যের মূল্য নেই; তা প্রমাণ সাপেক্ষ নয়। ঐতিহ্যের প্রমাণ হল সংস্কৃতি। সংস্কৃতি অতীত ও বর্তমানকে আত্মস্থ করে থাকে, আর ঐতিহ্য অতীতের গৌরবের ওপর আসীন। এই সম্পর্কযুক্ত সূক্ষ্ম প্রভেদটা অনুধাবন যোগ্য। কৃষ্টি শব্দ দ্বারা

সংস্কৃতিও বুঝায় না, ঐতিহ্যও বুঝায় না। কৃষ্টি হল শিক্ষা ও সংস্কৃতির ব্যবহারিক প্রয়োগের ফলশ্রুতি। শিক্ষা মানুষকে নানা প্রকারে জ্ঞানের সন্ধান দেয়, বোধগম্য করে তোলে। সুতরাং শিক্ষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও কৃষ্টি শব্দ—প্রয়োগ বা ব্যবহার কালে একটু বিচার বিবেচনার অবকাশ বর্তমান। শব্দগুলির যথেচ্ছ ব্যবহার অবাঞ্ছনীয়। শিক্ষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও কৃষ্টি সবগুলো মিলেই জাতীয়তাবাদ জন্ম দেয়। অর্থাৎ জাতীয়তাবাদ নিরূপিত হয় সবগুলির সমন্বয়ে, প্রকাশে ও বিকাশে। প্রকাশের সুষ্ঠ বিকাশের ক্রমবিবর্তন বিবেচনা যোগ্য ও বিচার সাপেক্ষ। প্রকাশ স্বাভাবিক পরিণতি অথবা যথার্থ ফলশ্রুতি বৈ আর কিছু নয়।

* * *

আজকের সংস্কৃতি নানা উৎস হতে উৎসারিত। সংস্কৃতি হল নতুন নতুন রূপে জীবনের পরিক্রমা ও জীবনকে নতুন করে এগিয়ে নেয়া। সৌন্দর্য উপলব্ধি হল সংস্কৃতিক জীবনের মৌল উপাদান। মানুষ প্রকৃত জীবনের অপরিচ্ছন্নতা দূর করে জীবনকে একটি পরিচ্ছন্নতার ভেতর চালিত করতে চাওয়াই হল সংস্কৃতি। প্রবাহিত জীবন ধারার সে খণ্ড খণ্ড বৈচিত্র্যই ঐ কালের ঐ দেশের সংস্কৃতি। সংস্কৃতি কোন স্থবির পদার্থ নয়। কালের কোন এক বিন্দুতে তা থেমে নেই। যুগে যুগে মানুষের নব নব রূপায়ন, নব নব উপলব্ধি তার সংস্কৃতির ও নব রূপায়ন, নবতর অভিব্যক্তি।

* * *

আর একটু খোলসা করে বলতে গেলে বলতে হয়, একটি বিষয়েরই উহ্যরূপ হচ্ছে সভ্যতা এবং তার বাহ্যরূপ হচ্ছে কালচার। সভ্যতার বিচার হয়—কালচারের প্রকাশ ভঙ্গিমায় বা তার বিষয় বস্তুর উৎকর্ষের মানদণ্ডে। যে কোন সভ্যতার উন্নতি বা অবনতি প্রকাশিত হয় তার কালচারের মধ্যে। সভ্যতাকে একটা বিমূর্ত ধারনা বলা যায়, তার মূর্ত ক্রিয়া হচ্ছে কালচার এবং মূর্তরূপ হচ্ছে কালচার সৃষ্ট-বিষয় বস্তু।

মানব জীবনই কালচারের মুল উৎস। কালের ধারায় মানব জীবন এক পর্যায় থেকে অন্য পর্যায়ে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। এ পরিবর্তনের

বিভিন্ন ধাপ বিভিন্ন ক্ষেত্রে গ্রহণও দানের ফলেই গড়ে ওঠে মানুষের কালচার। এ তুনিয়া থেকে অপরিসীম সম্পদ—আহরণ করে মানুষ হচ্ছে ধনী। তার মূল্য হিসাবে পৃথিবীকে সে তা দান করে তারই সাক্ষর রয়েছে মানুষের কালচারে। কালচারের উৎপত্তি তাই ক্রিয়াও প্রতিক্রিয়াজাত এবং জীবনের বিভিন্ন দিকের সঙ্গে তার রয়েছে সংযোগ।

(২)

*   *   *

দেশের ঐক্য ও উন্নতি কিরূপে স্থাপিত হতে পারে—তার রূপরেখা প্রসঙ্গে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য 'মূলতঃ দেশের প্রতি দেশবাসীর প্রেম এবং দেশের জন্য কাজও ত্যাগ করার আগ্রহ একটা দেশকে বেঁধে রাখে। এর সবটাই অবশ্য পরার্থে নয়; কারণ প্রত্যেকেই জানে যে দেশের ভবিষ্যতের সঙ্গে তার স্বার্থ অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত।'

আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, আমাদের দেশে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সংগঠন রয়েছে। এসব সংস্থা ও দলীয় আদর্শের মূল্যায়ন হওয়া বাঞ্ছনীয়। বিভিন্ন চিন্তাধারার মধ্যে ঐক্য আনয়ণে এবং পরস্পরে কাছাকাছি হওয়ার উদ্যোগ আয়োজনের প্রস্তুতি নেওয়া অপরিহার্য। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রশ্নে বিভিন্ন দলের মধ্যে যা কিছু রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকুন না কেন জাতীয় সংহতির প্রশ্নে তাদের সকলকে এক কাট্টা হওয়া উচিৎ।

বিভেদকামী ও ঐক্য নাশক শক্তিগুলির মোকাবিলায় জাতীয় পর্যায়ে আমাদের সচেষ্ট হতে হবে। বিশালদেশ ভারতের ঐক্য বিনষ্ট করার এবং বিভেদ সৃষ্টির যে প্রবণতা দেখা যাচ্ছে, তার মোকাবিলার জন্য সর্ব শক্তি নিয়োগ করা প্রয়োজন। আমরা যাতে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রকৃত ধারক ও বাহক হতে পারি—তার প্রতি অনুপ্রাণিত করাই আমার এ গ্রন্থ প্রণয়নের একমাত্র উদ্দেশ্য। কবির ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়—

'যাত্রা তব শুরু হোক, হে নবীন, কর হানি দ্বারে
নব যুগ ডাকিছে তোমারে।

তোমার উত্থান মাগি, ভবিষ্যৎ রহে প্রতিক্ষায়
রুদ্ধ বাতায়ন পাশে শঙ্কিত আলোক শিহরায়
সুপ্তি ত্যজি হরি লও তারে, লুপ্ত হোক অপমান,
দেখা দিক শাশ্বত কল্যাণ ॥
সৃজন উৎসব আজি, হে নবীন, খুলে দাও দ্বার।
আনো তব, নব উপহার,
নিখিল মানব মিলি, বিশ্ব প্রান্তে পাতিয়াছে মেলা—
উদ্বোধনী বাণী-তার তুমি আসি' গাহো এই বেলা
উদার পরাণ মেলি সবাকার লহ আলিঙ্গন
দৃঢ়হোক আত্মার বন্ধন ॥
ক্রন্দিছে নিখিল বন্দী, হে নবীন, মুক্ত করো তারে
নিয়ে চলো আলো অভিসারে।
পৃথিবীর অধিকারে বঞ্চিত যে ভিক্ষুকের দল
জীবনের বন্যাবেগে তাহাদের করো বিচক্ষণ।
অসত্যা অন্যায় যত ডুবে যাক সত্যের প্রসাদ
পিয়ে লভ অমৃতের স্বাদ ॥
অজস্র মৃত্যুরে লভি, হে নবীন, চলো অনায়াসে
মৃত্যুজয়ী জীবন উল্লাসে।
আসুক বেদনা ভীতি, আসুক ব্যর্থতা পরাজয়
সর্ব দ্বন্দ্ব বিস্মরিয়া ধ্বনি তোল অসীমের জয়।
কণ্ঠে ধরি বিধাতার জ্বালামাখা রক্ত মালা গাছি—
বলো মাভৈঃ আমি আসিয়াছি ॥"

২।১ তিলজলা প্লেস
(খানকাহ শরীফ)
কলিকাতা-১৭

মোবারক করীম জওহর

সূচীপত্র

॥ প্রথম অধ্যায় ॥

১. ভারতে ইসলাম ; ২. মুসলমানদের বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতের অবস্থা (ক) রাজনৈতিক অবস্থা (খ) প্রশাসনিক অবস্থা (গ) অর্থনৈতিক অবস্থা (ঘ) সামাজিক অবস্থা (ঙ) ধর্মীয় অবস্থা ৩. সিন্ধু অভিযানে মোহম্মদ বিন কাসেম ; ৪. সিন্ধু বিজয়ের ফলাফল ; ৫. ভারতীয় সাংস্কৃতিক বিপ্লব সাধনে দিল্লীর সুলতানগণের ভূমিকা ; ৬. সুলতান মাহমুদের ভারত আক্রমণের কারণ সমূহ ; ৭. সুলতান মাহমুদ—সমীক্ষা-১ ; ৮. মোহাম্মদ ঘুরী—সমীক্ষা-২ ৯. কুতব উদ্দিন—সমীক্ষা-৩ ; ১০. ইলতুৎমিশ—সমীক্ষা-৪ ; ১১. গিয়াসউদ্দিন বলবান—সমীক্ষা-৫ ; ১২. আলাউদ্দিন খলজী ও তাঁর প্রশাসনিক ব্যবস্থা ; ১৩. আলাউদ্দিন খলজী—সমীক্ষা-৬ ; ১৪. গিয়াসউদ্দিন তুঘলক—সমীক্ষা-৭ ; ১৫. মোহম্মদ বিন তুঘলকের শাসন পদ্ধতি ; ১৬. মোহাম্মদ বিন তুঘলক—সমীক্ষা-৮। পৃঃ ১—৪৭

॥ দ্বিতীয় অধ্যায় ॥

১৭. ফিরোজ শাহের প্রশাসনিক দক্ষতা ; ১৮. ফিরোজ শাহ্—সমীক্ষা-৯ ; ১৯. বখতিয়ার খিলজী—সমীক্ষা-১০ ; ২০. বলবনী বংশের শাসনামলে বাংলা ; ২১. ইলিয়াস শাহী বংশের শাসনামলে বাংলা, ২২. ইলিয়াস শাহী বংশ—সমীক্ষা-১১ ; ২৩. হোসেন শাহী বংশের শাসনামলে বাংলা ; ২৪. সুলতানী শাসন—সমীক্ষা-১২ ; ২৫. সুলতানী আমলে শাসন ব্যবস্থার রূপরেখা, ২৬. সুলতানী আমলে হিন্দুদের অবস্থা। পৃঃ ৪৮—৭৭

॥ তৃতীয় অধ্যায় ॥

২৭. ভারতীয় সংস্কৃতির ওপর ইসলামের প্রভাব ; ২৮. সুলতানী আমলে সমাজ ও সংস্কৃতি ; ২৯. সুফীবাদ ও তার প্রভাব ; ৩০. শেরশাহ্—সমীক্ষা-১৩। পৃঃ ৭৮—৯২

॥ চতুর্থ অধ্যায় ॥

৩১. আকবরের ভারত-ভারতই আকবর ; ৩২. আকবর—সমীক্ষা-১৪ ; ৩৩. জাহাঙ্গীর—সমীক্ষা-১৫ ; ৩৪. শাহ্জাহান—সমীক্ষা-১৬ ; ৩৫. ঔরঙ্গজেব—সমীক্ষা-১৬। পৃঃ ৯৩—১২৬

॥ পঞ্চম অধ্যায় ॥

৩৬. মুঘল আমলের শাসন ব্যবস্থা ; ৩৭. মুঘল শাসনে বঙ্গদেশ ; পৃঃ ১২৭-১৪৫

॥ ষষ্ঠ অধ্যায় ॥

৩৮. সংস্কৃতির আলোকে ধর্ম ও ধর্মশাস্ত্র (হিন্দুশাস্ত্র ও কোরআন সম্পর্কে আলোচনা)। পৃঃ ১৪৬—১৭২

॥ সপ্তম অধ্যায় ॥

৩৯. কোরআনের সূরা—বেদের সুক্ত। পৃঃ ১৭৩—২১৮

॥ অষ্টম অধ্যায় ॥

৪০. সাংস্কৃতিকভাবের আদান-প্রদান (বঙ্গে সুফী প্রভাব)। পৃঃ ২১৯—২৭৫

॥ প্রথম অধ্যায় ॥

ভারতে ইস্‌লাম

প্রাক—ইসলামী যুগ হতেই ব্যবসায়ের মাধ্যমে ভারতীয় উপমহাদেশের সঙ্গে আরব বণিকদের যোগাযোগ ছিল। সেই সুদূর অতীতে তারা ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে ভারতের উপকূলবর্তী বন্দর সমূহে এসে এই দেশীয় পণ্য দ্রব্য স্বদেশে এবং পরে মধ্য এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা এমন কি, ইউরোপের বিভিন্ন স্থানেও প্রেরণ করত। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে আরবে ইসলাম ধর্ম প্রচারিত হয়। এই সময় হতে আরবীয় মুসলমানগণ তাঁদের ঐতিহ্য অনুসারে ব্যবসায়-বাণিজ্যে অধিকতর উৎসাহী হন এবং এক সময় তাঁরা ভারত উপমহাদেশে পাড়ি জমান। ৬৩৬-৩৭ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমরের (রাঃ) আমলে মুসলমানগণ ভারত অভিযানের প্রথম প্রচেষ্টা শুরু করেন। কিন্তু তখন তা সফল হয়নি। দুরাভিযানের বিপদ এবং দুঃখ-দুর্দশার কথা বিবেচনা করে খলিফা পরবর্তী অভিযান বন্ধ করে দেন। খলিফা হযরত আলী (রাঃ) এবং মাবিয়ার খিলাফতের সময় অনেকগুলি অভিযান পরিচালিত হয়েছিল; কিন্তু একটিও সফলতা লাভ করতে পারেনি। এর পর মুসলমান সৈন্য বাহিনী পরবর্তী কয়েক বছর নিষ্ক্রিয় ছিল। কিন্তু উমাইয়া বংশের খলিফা ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিকের সিংহাসনারোহণের সঙ্গে সঙ্গে ইসলামের ইতিহাসে আবার নূতন অধ্যায় সংযোজিত হয়। তাঁর বিখ্যাত সেনাপতি মুসা বিন নুসাইর সমগ্র উত্তর আফ্রিকা অধিকার করেন এবং তাঁর সৈন্যাধ্যক্ষ তারিক স্পেন জয় করেন। প্রাচ্যদেশে কুতাইবা ইসলামের বিজয় পতাকা মধ্য এশিয়া পর্যন্ত বহন করে নিয়ে যান। অন্যদিকে আরব সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশের

শাসনকর্তা হাজ্জাজ বিন ইউসুফের স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা মোহাম্মদ বিন কাসিমের নেতৃত্বে ভারত ভূমিতে মুসলমানদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

মুসলমানদের বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতের অবস্থা

(ক) রাজনৈতিক অবস্থা ঃ

ইসলাম অভ্যুদয়ের পূর্বে ভারতীয় উপমহাদেশে কোনরূপ রাজনৈতিক ঐক্য ছিল না। সমগ্র ভূখণ্ড ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল এবং বিভিন্ন বংশ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির মধ্যে পারস্পরিক শত্রুতা বিদ্যমান ছিল। সেই সময় কনৌজের হর্ষবর্ধন উত্তর পশ্চিমে এক বিশাল সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন। হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর (৬৪৭ খ্রীঃ) পর বিভিন্ন রাজন্যবর্গের মধ্যে প্রভুত্ব স্থাপনের স্পৃহা জাগ্রত হওয়ার ফলে তাঁর বিশাল সাম্রাজ্য শতধা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। প্রায় ৫০ বছরেরও অধিক কাল উক্ত অঞ্চলে এই রাজনৈতিক বিশৃংখলা অব্যাহত থাকে। ভারতের অবশিষ্ট অংশ ও বহু স্বাধীন নৃপতির মধ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে। তখন কোন কেন্দ্রীয় সরকার ছিল না। কর্কট রাজবংশীয় দুর্লভ বর্ধনের অধীনে কাশ্মীর সপ্তম শতাব্দীতে একটি স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হয়। আরবদের সিন্ধু অভিযানের প্রাক্কালে দুর্লভ বর্ধনের পৌত্র চন্দ্রাপিদা এই রাজ্যের রাজা ছিলেন। তাঁর উত্তরাধিকারী ও ভ্রাত্রা মুক্তাপিদা ছিলেন কাশ্মীরের রাজাদের মধ্যে সর্বাধিক ক্ষমতাসম্পন্ন। তিনি একজন বড় বিজেতা ছিলেন। হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর নেপাল ও আসাম স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হয়। দূরত্বের জন্য অষ্টম শতাব্দীর গোড়ার দিকে এই দুটি রাজ্য কোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেনি। অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগে কনৌজ ছিল ভারতীয় উপমহাদেশের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য। যশোবর্মন সেই সময় এই রাজ্যের রাজা ছিলেন। তাঁর সময় কনৌজ তার হৃত গৌরব ও প্রতিপত্তি পুনরায় ফিরে পায়। যশোবর্মন একজন শক্তিশালী রাজা এবং সফল শাসক ছিলেন। তাঁর অধীনে

সাম্রাজ্য উত্তরে হিমালয় হতে শুরু করে দক্ষিণে নর্মদা পর্যন্ত এবং পূর্বে বঙ্গদেশ হতে শুরু করে দক্ষিণ পশ্চিমে থানেশ্বর পর্যন্ত প্রসারিত হয়। সিন্ধু ছিল সেই আমলে হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্যভুক্ত। কিন্তু হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর শুদ্রদের করতলগত হয়ে উহা একটি স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হয়। শূদ্র বংশের সর্বোত্তম রাজা ছিলেন শাহশী। 'চাচ' নামক সিন্ধুর জনৈক ব্রাহ্মণ মন্ত্রী শূদ্র শাসনের পতন ঘটিয়ে নিজে রাজা হয়ে বসেন এবং এক নূতন রাজবংশের পত্তন করেন। তাঁর ভ্রাতা চন্দ্র তাঁর পর সিংহাসনে আরোহণ করেন। চাচের পুত্র দাহির আরব অভিযানের সময় সিন্ধুর শাসনকর্তা ছিলেন। দাইবুল, নীরুন, সিওয়ান, ব্রাহ্মণ্যবাদ ও এলোর তাঁর সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। এলোর তখন সিন্ধুর রাজধানী ছিল। ব্রাহ্মণ সন্তান দাহির তাঁর বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী প্রজাদের বিরুদ্ধে কতিপয় ক্ষতিকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং এর ফলে তাঁর জনপ্রিয়তা হ্রাস পায়, বৌদ্ধরা তাঁর শত্রু হয়ে ওঠে। হর্ষবর্ধনের সমসাময়িক কালে বঙ্গের রাজা ছিলেন শশাঙ্ক। তাঁর মৃত্যুর পর বঙ্গদেশে মারাত্মক গোলযোগ দেখা দেয়। কিছুকাল এই অবস্থা চলবার পর অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগে বঙ্গের জনসাধারণ একত্রিত হয়ে গোপাল নামক এক ব্যক্তিকে তাদের শাসনকর্তা মনোনীত করে। গোপাল যে রাজবংশের পত্তন করেন তা পালবংশ নামে খ্যাত। পাল রাজাদের শাসনাধীনে বঙ্গদেশ শান্তি ও সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত পালবংশের শাসন অক্ষুণ্ণ ছিল। এর পর বঙ্গদেশ সেন রাজবংশের করতলগত হয়। অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে পল্লব ও চালুক্যদের মধ্যে মারাত্মক সংঘর্ষ আরম্ভ হয়। এই সংঘর্ষে চালুক্যরাজ শেষ পর্যন্ত বিজয়ী হয় এবং কাঞ্চীতে তারা শাসন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করে। ষষ্ঠ শতাব্দীতে চালুক্যরা দাক্ষিণাত্যে ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে। দ্বিতীয় পুলকেশী ছিলেন এই বংশের নরপতি। ৬৮১ খ্রীষ্টাব্দে বিক্রমাদিত্যের পুত্র বিনয়াদিত্য সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর পর বিজয়াদিত্য ক্ষমতাসীন হন (৬৯৬-৭৩৩ খ্রীঃ) এবং পল্লবগণের নিকট হতে কাঞ্চী জয় করেন। সুদূর দাক্ষিণাত্যে পাণ্ড্য, চোল ও

চেরা—এই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য ছিল। এই রাজ্যগুলি অনবরত নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত থাকত। ফলে এই সকল দেশে চরম অরাজকতা বিরাজিত ছিল।

(খ) প্রশাসনিক অবস্থা :

মুসলিম বিজয় পূর্ব ভারতবর্ষের শাসন ব্যবস্থায় রাজাই ছিলেন সর্বেসর্বা। সকল ক্ষেত্রে তাঁর মতামতই ছিল চুড়ান্ত। আইন প্রণয়ন, ক্ষমতার বন্টন, শাসন পরিচালনা এবং সামরিক ক্ষমতা প্রয়োগের চূড়ান্ত এক্তিয়ার একমাত্র তাঁর হস্তেই ন্যস্ত ছিল। সাধারণতঃ বংশানুক্রমিক ভাবে রাজা নিযুক্ত হতেন। কিন্তু বঙ্গদেশের পালবংশীয় গোপাল এবং কাঞ্চীর পল্লব বংশীয় নন্দীবর্মনের উদাহরণ হতে মনে হয় যে, রাজ্যের প্রভাবশালী ব্যক্তিরাও অনেক সময় রাজা নির্বাচন করে নিতেন। রাজকার্য নির্বাহের ব্যাপারে মন্ত্রীগণ রাজাকে পরামর্শ দান ও সাহায্য করতেন। তবে রাজা তাঁদের পরামর্শ গ্রহণে বাধ্য থাকতেন না। রাজার মন্ত্রীদের সংখ্যা রাজ্যের প্রয়োজন ও পরিস্থিতির উপর নির্ভর করত। গুরুত্ব পূর্ণ মন্ত্রীগণ সন্ধিবিগ্রাহক (যুদ্ধ ঘোষণা ও শান্তি স্থাপন কার্যের ভার প্রাপ্ত মন্ত্রী), অক্ষপা টলা ঘিকারিতা (দলিল রক্ষক মন্ত্রী), অমাত্য (অর্থমন্ত্রী), সুমন্ত (পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রী) এবং রাজপুরোহিত (ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রী) প্রভৃতি নামে অভিহিত হতেন। সাম্রাজ্য বিভিন্ন প্রদেশে বিভক্ত ছিল। প্রাদেশিক প্রধানকে বলা হত 'উপারিকা'; প্রদেশে শান্তি ও শৃংখলা রক্ষা, রাজার আদেশ কার্যকর করা এবং সামরিক অভিযান পরিচালনা করা তাঁর প্রধান কর্তব্য ছিল। প্রতেকটি প্রদেশ আবার কতকগুলি জেলায় বিভক্ত ছিল। জেলাকে বলা হত 'ভায্য'। জেলার শাসনকর্তা ভায্যপতি নামে অভিহিত হতেন। দেশের শাসন ব্যবস্থায় পল্লীগ্রাম ছিল সর্বনিম্ন ইউনিট। পল্লী গ্রামের শাসন ব্যবস্থা মোড়ল ও পঞ্চায়েত কর্তৃক সম্পাদিত হত। রাজ্যের আয়ের প্রধান উৎস ছিল ভূমি রাজস্ব। এ ছাড়া, অনুগত রাজন্যবর্গের নিকট হতে কর এবং আবগারী ও বানিজ্য শুল্ক হতেও রাজ্যের আয় সংগৃহীত হত।

(গ) অর্থনৈতিক অবস্থা :

এদেশ্ অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী ছিল। তাই লোকের অর্থনৈতিক অবস্থাও সচ্ছল ছিল। জনসাধারণ মোটামুটি অভাবমুক্ত ছিল। কৃষি কার্যই ছিল জনগণের প্রধান পেশা। দেশের শিল্প বাণিজ্য যথেষ্ট প্রসার লাভ করেছিল। বঙ্গদেশ ও গুজরাট কার্পাস বস্ত্র উৎপাদন ও রপ্তানীর জন্য বিখ্যাত ছিল। কিন্তু কৃষককে তাদের রুজী রোজগারের নিমিত্ত কঠোর পরিশ্রম করতে হত। অপরদিকে উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা বিলাসিতা ও আড়ম্বরের মধ্যে কাল কাটাত।

(ঘ) সামাজিক অবস্থা :

অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে সমাজ চারটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে, যথা—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। তবে কোন শ্রেণীর একান্ত ভাবে তাদের ওপর আরোপিত কার্য নিয়ে ব্যাপৃত ছিল না। তাই ব্রাহ্মণরাই যুদ্ধ বিগ্রহে অংশ গ্রহণ করতেন এবং ক্ষত্রিয়রা ব্যবসায়ে লিপ্ত হতেন। বৈশ্য ও শূদ্রদের মধ্যে অনেকে শাসন কার্যেও নিয়োজিত হয়েছিলেন। শূদ্ররা সমাজের সর্ব নিম্নস্তরে ছিল। তারা ছিল অস্পৃশ্য। জাতিভেদ প্রথা খুব কঠোর ছিল। জন সাধারণ স্ব স্ব সম্প্রদায়ে বিবাহ করত। আন্তঃসাম্প্রদায়িক বিবাহ কদাচিৎ অনুষ্ঠিত হত। সমাজে বহু বিবাহের প্রচলন ছিল; কিন্তু কোন নারীকে একাধিক বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে দেওয়া হত না। স্বামীর মৃত্যু ঘটলেও তাঁকে পুনরায় বিবাহ করতে দেওয়া হত না। শাসক গোষ্ঠীর উৎসাহে মহিলাদের মধ্যে সতীদাহ (সহমরণ) প্রথা জনপ্রিয় হয়ে ওঠেছিল। সমাজে অস্পৃশ্যতা বিদ্যমান ছিল। অধিকাংশ লোক নিরামিষ ভোজী ছিল এবং তারা পিঁয়াজ রসূন ও খেত না।

(ঙ) ধর্মীয় অবস্থা :

সে সময় ভারতীয় উপমহাদেশে তিনটি প্রধান ধর্ম প্রচলিত ছিল বৌদ্ধধর্ম, জৈনধর্ম এবং হিন্দু ধর্ম। জৈনধর্ম তত জনপ্রিয় ছিল না এবং বৌদ্ধ ধর্ম লুপ্ত হওয়ার পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল। হিন্দু ধর্ম ছিল দেশের প্রধান ধর্ম। অধিকাংশ রাজাই ছিলেন হিন্দু এবং তাঁরা

হিন্দু ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থাই করতেন। পুরোহিত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় ব্রাহ্মণদেরকে সমাজে উচ্চ মর্যাদা দেওয়া হত। ধর্মীয় সুযোগ নিয়ে তাঁরা সাধারণ লোকদেরকে শোষণ করতেন। ব্রাহ্মণ্য বাদের পুনর্জাগরণ এবং এর আক্রমণাত্মক মনোভাব বৌদ্ধদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি করেছিল।

সিন্ধু অভিযানে মোহাম্মদ বিন কাসিম

সপ্তদশ বর্ষীয় তরুণ সেনাপতি মোহাম্মদ বিন কাসিম সিন্ধু অভিযানের দায়িত্ব গ্রহণ করে মাকরানের মধ্যে দিয়ে সিন্ধুর দিকে অগ্রসর হলেন। তাঁর সঙ্গে ছিল সুসজ্জিত দু'হাজার অশ্বারোহী ও সমপরিমাণ উটের বাহিনী। এই বিরাট বাহিনীর রসদ বহন করবার জন্য আরও তিন হাজার উটের ব্যবস্থা করা হল। অগ্রগমনের পথে মোহাম্মদ বিন কাসিম মাকরানের শাসকের সঙ্গে মিলিত হলেন এবং তাঁর নিকট হতে আরও একটি সৈন্যদল সাহায্য স্বরূপ লাভ করলেন। আরবীয় সৈন্যদল ছাড়া ও কাসিম হিন্দু শাসকদের অত্যাচারে বিক্ষুব্ধ জাঠ এবং মেডদের অনেককে সৈনিক হিসাবে তাঁর দলে পেলেন। এইভাবে তিনি তাঁর সৈন্যদলের শক্তি বৃদ্ধি করে সিন্ধুর দিকে এগিয়ে চললেন। ৭১২ খ্রীষ্টাব্দে মোহাম্মদ বিন কাসিম দাইবুল বা দেবলে এসে উপস্থিত হলেন। এদিকে জলপথে নানা প্রকার অস্ত্রশস্ত্র সহ হাজ্জাজ বিন ইউসুফ তাঁর সাহায্যার্থে অপর একটি সৈনাবাহিনী পাঠালেন। এই সমস্ত অস্ত্র শস্ত্রের মধ্যে মনজানিক বা 'বলিস্ত' (এক প্রকার প্রস্তর নিক্ষেপক কামান) ছিল।

একে শখ করে 'আলআরূস' বা কনে বলা হত। এই যন্ত্র চালাতে পাঁচশো লোক লাগত। দাইবুল দুর্গটি ব্রাহ্মণ ও রাজপুতদের দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। মোহাম্মদ বিন কাসিম দুর্গটি দখলের জন্য সর্বপ্রকার প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। তিনি চারদিকে পরিখা খনন করে সৈন্য মোতায়েন করলেন। দাইবুলে যে বড় মন্দির ছিল তার ওপরে লাল নিশান উড়ছিল। অবরুদ্ধ হিন্দু সৈন্যদের মনোবল নষ্ট করবার জন্য

তিনি প্রথমেই এই নিশান নামিয়ে ফেলতে আদেশ দিলেন। তাঁর আদেশে নিশান নামিয়ে ফেলা হল। এর পর হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হল। এই যুদ্ধে হিন্দুরা মুসলমানদের নিকট শোচনীয় ভাবে পরাজয় বরণ করল। দাইবুল মুসলমানদের হস্তগত হল। দাইবুল অধিকার করবার পর মোহাম্মদ বিন কাসিম হায়দ্রাবাদের নিকটে অবস্থিত নীরুনে এসে উপস্থিত হন। এই শহর একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর তত্ত্বাবধানে ছিল। নীরুনের অধিবাসীরা মুসলমানদের নিকট আত্মসমর্পণ করে মোহাম্মদ বিন কাসিমের আনুগত্য স্বীকার করল। অতঃপর তিনি সিওয়ান ও পরে সিসামের দিকে অগ্রসর হলেন। সামান্য বাধার পর এই সমস্ত দেশের অধিবাসীরাও তাঁর আনুগত্য স্বীকার করল। মুসলমান সেনাপতির এইরূপ অপ্রত্যাশিত বিজয়ে সিন্ধুরাজ দাহির বিচলিত হয়ে পড়লেন। তিনি মুসলমানদের অগ্রগতিকে বাধা দেওয়ার জন্য তাঁর সৈন্য বাহিনী নিয়ে রাওয়ারে গিয়ে তাদের পথরোধ করে দাঁড়ালেন। এদিকে মোহাম্মদ বিন কাসিম সিন্ধুনদ পার হবার জন্য নৌকার দ্বারা সেতু তৈরী করার আদেশ দিলেন। সেতু প্রস্তুত হবার পর মুসলমানগণ নদী পার হয়ে (জুন ৭১২ খ্রীঃ) রাজা দাহিরের সৈন্যদের মোকাবিলা করলেন। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস যে, হিন্দুরা বীর বিক্রমে যুদ্ধ করেও শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করল। দাহির যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হলেন (২০ শে জুন ৭১২ খ্রীঃ)। রাজার মৃত্যুতে হিন্দু সৈন্যদের মনোবল ভেঙ্গে পড়ল। তারা যুদ্ধ ক্ষেত্র হতে পলায়ন করল। দাহিরের মৃত্যুর পর তাঁর পত্নী রাণীবাঈ ও পুত্র রাওয়ার দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। দুর্গটি রক্ষা করবার জন্য রাণী তাঁর সৈন্যদেরকে উৎসাহ দিতে লাগলেন। কিন্তু দুর্গের পতন আসন্ন দেখে তিনি ও তাঁর সহচরীবৃন্দ অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়ে মুসলমানদের হস্তে বন্দিনী হওয়ার ভয় হতে রক্ষা পেলেন। অতঃপর রাওয়ার দুর্গ মুসলমানদের অধিকারে এল। বিজয়োল্লাসে উৎফুল্ল হয়ে মোহাম্মদ বিন কাসিম ব্রাহ্মণাবাদের দিকে অগ্রসর হলেন। সেখানকার অধিবাসীরা প্রায় বিনাযুদ্ধে কাসিমের অধীনতা গ্রহণ করল।

এইরূপে অল্পদিনের মধ্যে সিন্ধুর দক্ষিণাঞ্চলে মুসলমানদের আধিপত্য স্থাপিত হল। ব্রাহ্মাণাবাদ অধিকার করবার পর মোহাম্মদ বিন কাসিম সিন্ধুর এই এলাকাতে মুসলিম শাসন পত্তন করলেন এবং অধিকৃত ভূভাগে শাসক নিযুক্ত করে রাজধানী এলোরের দিকে অভিযান পরিচালনা করলেন। দাহিরের এক পুত্র এলোর দুর্গ রক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে এলোর দুর্গ অধিকৃত হল। এরপর মোহাম্মদ বিন কাসিম হিন্দুদের শক্তির শেষ উৎস মুলতানের দিকে অগ্রসর হলেন। মূলতান অভিযানের পথে তিনি রাভী নদীর তীরে অবস্থিত সিকা (উচ্) নামক দুর্গ অধিকার করলেন। মুলতানের হিন্দুরা প্রায় দু মাস বাধা দান করেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা পরাজিত ও বিধ্বস্ত হল। মুলতান বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে দাহিরের সমগ্র রাজ্য মুসলমানদের হস্তগত হল। এই ভাবে ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামের বিজয় পতাকা সগৌরবে উত্তোলিত হয়। মুলতান বিজয়ের পর মোহাম্মদ বিন্ কাসিম আবু হাকিম নামে তাঁর একজন সেনাপতিকে দশহাজার সৈন্যের নেতৃত্ব দিয়ে কনৌজে পাঠান। কিন্তু নূতন অভিযান আরম্ভ করবার পূর্বেই তিনি (বিন কাসিম) খলিফার নিকট হতে রাজধানীতে ফিরে আসবার জন্য এক পত্র পেলেন। রাজধানীতে ফিরে এলে তাঁকে কারারুদ্ধ করা হয় এবং পরে সেখানেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

সিন্ধু বিজয়ের ফলাফল

(১) সিন্ধুদেশে মুসলিম শাসনের প্রতিষ্ঠা ভারতের ইতিহাসে একটি গুরুত্ব পূর্ণ ঘটনা। ইসলাম বহির্বিশ্বে সর্ব প্রথম এখানে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তখন আরব সৈন্যদের মধ্যে অনেকেই চিরদিনের জন্য সিন্ধুতে বসতি স্থাপন করে এবং সিন্ধী রমনী বিবাহ করে। আরব বংশধরেরা এবং হিন্দুগণ শান্তি ও একতার মধ্যে দীর্ঘকাল পাশাপাশি বসবাস করে। আরবীয়গণ বিজিত অঞ্চলে বহু প্রাসাদ ও রাস্তা নির্মাণ করেছিলেন। তাঁদের অনেক কীর্তি আজও বিদ্যমান রয়েছে। কাজেই

রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ হতে বিচার করলে সিন্ধু বিজয়ের গুরুত্ব একেবারে অস্বীকার করা যায় না।

(২) ধর্মীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আরবদের সিন্ধু বিজয়ের অবদান মোটেই কম নয়। এই বিজয়ের ফলে সিন্ধুতে ইসলাম ধর্ম প্রচারিত হয় এবং পরে এখান হতে সমগ্র উপমহাদেশে ইসলামের বাণী ছড়িয়ে পড়ে। সিন্ধু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সহাবস্থানের ফলে এখানকার সমাজ ব্যবস্থাতেও বিরাট পরিবর্তন দেখা দেয়। তারা তাদের সামাজিক জীবনে একে অন্যের রীতিনীতিকে অনেকাংশে গ্রহণ করে। সিন্ধু বিজয়ের ফলে আরব ও সিন্ধুর মধ্যে বাণিজ্যিক যোগাযোগ প্রসার লাভ করে।

(৩) সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আরবদেশের সিন্ধু বিজয়ের ফল সুদূর প্রসারী। এই বিজয়ের পূর্বে আরবীয় মুসলমানগণ প্রাচীন গ্রীক, মিসরীয়, মেসোপটেমিয় ও পারসিক জাতির সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হন এবং তাঁরা এই সকল সংস্কৃতির সমন্বয় সাধন করে এর উন্নতি বিধান করেন। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত এই মহান সংস্কৃতি আরবীয় মুসলমানগণ হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে নিয়ে আসেন এবং তা বিজিত জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করেন। এইভাবে তাঁরা ভারত বাসীকে ইসলামী জগতের সান্নিধ্যে এনে তাদের নিকট বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতির ব্যাপক সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করে দেন।

(৪) ভারতবর্ষ বহু প্রাচীনকাল হতেই সভ্যতা ও সংস্কৃতির লীলাভূমি। এই লীলাভূমিতে দর্শন, চিকিৎসা শাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত, সঙ্গীত ও চিত্রশিল্পে হিন্দুরা বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেছিল। সিন্ধু বিজয়ের ফলে ভারতীয় শিক্ষা-দীক্ষা, বিজ্ঞান, শিল্পকলা ও সাহিত্যের সঙ্গে মুসলমানদের পরিচয় ঘটে। এই ব্যাপারে উমাইয়া ও আব্বাসীয় খলিফাদের উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতা মুসলিম জ্ঞান ভাণ্ডারকে বিশেষ ভাবে সমৃদ্ধ করেছিল। উমাইয়া যুগের খলিফারা গ্রীক ভাষায় রচিত বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তকাদি আরবীতে অনুবাদ করতে বিশেষ উৎসাহ দিয়েছিলেন। কিন্তু আব্বাসীয় যুগের খলিফারা ইরানী ও ভারতীয়

জ্ঞান বিজ্ঞানকে আরবী ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করে এক স্বর্ণযুগের সূচনা করেছিলেন। খলিফা হারুনের মন্ত্রী ইয়াহিয়া বার্মাকী এবং তাঁর দু পুত্র (মুসা ও আমরান) ভারতীয় জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রতি খুব অনুরক্ত ছিলেন। কথিত আছে, এই বার্মাকী পরিবারই বাগদাদকে হিন্দু শিক্ষা দীক্ষার সংস্পর্শে এনেছিলেন। তাঁরা একদিকে সংস্কৃত গ্রন্থাদি আরবী ভাষায় অনুবাদ করবার জন্য হিন্দু পণ্ডিতগণকে বাগদাদে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন এবং অন্যদিকে ভারতীয় জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষা করবার জন্য আরবীয় পণ্ডিতগণকে ভারতে পাঠিয়ে ছিলেন। খলিফা মনসুরের সময় কয়েকজন হিন্দু পণ্ডিত বাগদাদে আগমন করেছিলেন (৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে) তাঁরা জ্যোতির্বিদ্যার ওপর সিদ্ধান্ত নামে একটি সংস্কৃত গ্রন্থ সঙ্গে নিয়ে আসেন এবং গণিতবেত্তা আল-ফাজারীর নেতৃত্বাধীন আরব পণ্ডিতদের একটি দলের নিকট তা উপস্থাপিত করেন। ভারতীয় পণ্ডিতদের সহায়তায় আরবীয় পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্তকে আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন এবং এর নাম দেন 'সিন্দ হিন্দ'। সিদ্ধান্ত গ্রন্থখানির রচয়িতা ছিলেন ব্রহ্মগুপ্ত। সিদ্ধান্তের ন্যায় জ্যোতির্বিদ্যার ওপর আরও দুখানি সংস্কৃত বই আরবীতে অনুদিত হয়। হিন্দু সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিতি লাভের ফলে বহু মুসলমান জ্যোতির্বিদ্যার প্রতি আগ্রহী হন। বারাণসী ছিল হিন্দু সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল। আমীর খসরু বলেন যে, আবু মা'সার হিন্দুদের জ্ঞান পীঠ বারাণসীতে এসে প্রায় দশ বছর জ্যোতির্বিদ্যা শিক্ষা করেন। হিন্দু জ্যোতির্বিজ্ঞানের সঙ্গে মুসলিম মেধার সমন্বয় সাধন করে পরবর্তীকালে প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক আল-বেরুণী 'তাহফিম' ও কানুন আল মাসুদী রচনা করেন।

(৫) অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে বহু ভারতীয় গ্রন্থ আরবী ভাষায় অনূদিত হয়। আরবগণ ভারতীয়দের কাছ হতেই গাণিতিক সংখ্যা সম্পর্কিত জ্ঞান লাভ করেছিলেন। এইজন্য 'সংখ্যাকে' তাঁরা হিন্দুস্থানী সংখ্যা বলেন। পরবর্তীকালের আরবগণ এই শাস্ত্রে বিশেষ মৌলিকত্বের পরিচয় দেন এবং একে পাশ্চাত্যে প্রচার করেন। পাশ্চাত্যে প্রচলিত আরবী সংখ্যা মূলতঃ ভারতবর্ষ হতেই গ্রহণ করা হয়েছিল।

আব্বাসীয় খলিফাদের উৎসাহে বাগদাদে একটি চিকিৎসালয় (বিমারিস্তান) স্থাপিত হয়। সেখানে ভারতীয় পণ্ডিতগণ প্রণীত 'চরক' ও 'সুশ্রুত' আরবী ভাষায় অনূদিত হয়। ভারতীয় পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশের কাহিনীগুলি আরবীতে অনুবাদের মাধ্যমে প্রতীচ্য ভূখণ্ডে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। ভারতীয়, আরবীয় ও ইরানীয় চিন্তাধারার সংযোগেই নবম শতাব্দী হতে সুফী ধর্মমত ভারতে প্রসার লাভ করেছিল। সুতরাং এই কথা বলা যায় যে, সিন্ধু বিজয়ের ফলে আরবীয় মুসলমান ও হিন্দুদের মধ্যে ভাব বিনিময় ও সাংস্কৃতিক সংযোগ সম্ভবপর হয়েছিল। আরবীয় মুসলমানগণ এদেশে সর্বপ্রথম ন্যায় নীতি ও উদারতার ভিত্তিতে এক নূতন শ্রেণীহীন সমাজ গঠনে ভারতবাসীকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। মুসলমানদের আগমনের ফলে এদেশে বর্ণভেদের কঠোরতা ও অস্পৃশ্যতা হ্রাস পায় এবং নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরা দুঃশাসনের ভীতি হতে উত্তরণের প্রেরণা লাভ করে। ইসলামের সাম্য ও মৈত্রীর আদর্শ এদেশের অধিবাসীদের মধ্যে শান্তি ও স্বস্তি আণয়ন করেছিল। ইসলামের সহজ-সরল রীতি নীতি, উন্নত সমাজ ব্যবস্থা ও ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ভারতের অমুসলমান জাতিকে আকৃষ্ট করে। এই জন্য জাঠ ও মেড়গণ আরবদের স্বাগত জানিয়েছিল।

ভারতীয় সাংস্কৃতিক পিপ্লব সাধনে দিল্লীর সুলতানগণের ভূমিকা

সিন্ধুদেশ জয় করবার পর মোহম্মদ বিন্ কাসিম সেখানে এক উদার শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। এই শাসন ব্যবস্থা আরবদের— বিশেষ করে মোহাম্মদ বিন কাসিমের রাজনৈতিক জ্ঞানের পরিচয় বহন করে। মোহাম্মদ বিন কাসিম খলিফা ওমরের ন্যায় বিজিত দেশে আরবদেরকে ভূ-সম্পত্তি ভোগ নিষেধ করেন। আরবরা শুধু সামরিক বিভাগে কাজ করতেন এবং বেসামরিক বিভাগ সমূহ স্থানীয় লোকদের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। কারণ তারা স্থানীয় অবস্থা সম্বন্ধে বেশী ওয়াকিবহাল ছিল। আরব শাসকগণ দূরদর্শী রাষ্ট্র

পরিচালক ও রাজনীতিবিদ ছিলেন। সিন্ধুদেশের প্রচলিত রীতি নীতির কোন ব্যতিক্রম তাঁরা করেন নি। দাহিরের আমলে যে সমস্ত লোক বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত ছিলেন। মোহাম্মদ বিন্ কাসিম তাঁদের স্ব স্ব পদে বহাল রাখেন। তিনি স্থানীয় অধিবাসীদের ওপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ কার্য তাদের হস্তে ন্যস্ত করেছিলেন। ব্রাহ্মণদের ওপর রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। মোহাম্মদ বিন্ কাসিম অধিকৃত অঞ্চলের অধিবাসীগণকে 'আহলে কিতাব' বলে গণ্য করতেন এবং তাদেরকে জিম্মীর (ইহুদী ও খৃষ্টান) সকল সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তীকালে মুসলিম আইনবিদরা জিম্মীদেরকে যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা দানের পক্ষপাতী ছিলেন, তিনি সিন্ধুর অধিবাসীদেরকে তার চেয়েও বেশী সুযোগ সুবিধা দিয়েছিলেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ব্রাহ্মণ্যবাদের অধিবাসীরা বিজেতার আনুগত্য স্বীকার করলে যুদ্ধের সময় যে মন্দিরগুলি ধ্বংস হয়েছিল তা পুনঃনির্মাণ করবার জন্য তাদের অনুমতি দেওয়া হয়। এই সম্বন্ধে ব্রাহ্মণ্যবাদের লোকেরা মোহাম্মদ বিন্ কাসিমের নিকট আবেদন করলে তিনি হাজ্জাজ বিন্ ইউসুফের অনুমতি চেয়ে পাঠান। হাজ্জাজ বিন্ ইউসুফ তার জবাবে জানান, "তারা (সিন্ধুবাসীরা) যখন আত্মসমর্পণ করেছে এবং খলিফাকে কর দিতে সম্মত হয়েছে, তখন তাদের নিকট আর বেশী কিছু আশা করা অনুচিত। তাদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার আমাদের ওপর পড়েছে। তাদের জানমালের ওপর কোন রকম হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। দেবতার উপাসনা করার জন্য তাদের অনুমতি দেওয়া হল। কাউকেও ধর্ম কর্ম হতে বিরত করা চলবে না। তারা তাদের গৃহে ইচ্ছামত চলাফেরা বা বাস করতে পারবে।" মোহাম্মদ বিন্ কাসিম কারো ধর্মীয় স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেন নি। ঈশ্বরী প্রসাদ বলেন, তুর্কীদের মত আরবগণের মধ্যে ধর্মীয় গোঁড়ামী ছিল না। তাঁরা হিন্দুদের প্রতি ধর্মীয় সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করেছিলেন।" যুদ্ধের সময় কয়েকটি মন্দির বিনষ্ট হয়েছিল সত্য, কিন্তু উহা ছিল সাময়িক ব্যাপার মাত্র। এই মন্দির ধ্বংসের মূল কারণ ধর্মীয় গোঁড়ামী বা

উন্মাদনা নয়। ভারতের যুগ যুগ ব্যাপী সঞ্চিত ধন এই মন্দির গুলিতে সংরক্ষিত হত বলে এই ধ্বংসাত্মক কার্য সংঘটিত হয়েছিল। একবার কোন রাজ্য অধিকৃত হলে এবং সেখানে শান্তি ফিরে এলে অথবা অধিবাসীরা যদি শাসকের আনুগত্য স্বীকার করে নিত বা শান্তি কামনা করত তা হলে শাসকগণও তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করতেন এবং শান্তিপূর্ণ নীতি গ্রহণ করতেন। ব্রাহ্মণদের নিজস্ব ধর্ম কর্ম ও উৎসবাদি পালনের অধিকার দেওয়া হয়েছিল। বিজিত অঞ্চলকে 'ইকতা' নামে কয়েকটি জেলায় বিভক্ত করা হয় এবং প্রত্যেক জেলার দায়িত্বে একজন সামরিক কর্মচারী নিয়োগ করা হয়। শাসন কার্যের ব্যাপারে জেলার দায়িত্বে নিযুক্ত কর্মচারীদেরকে যথেষ্ট কর্ম স্বাধীনতা দেওয়া হয়। তবে তাঁদের প্রাদেশিক শাসনকর্তাকে সামরিক সাহায্য দিতে হত। সৈন্যদেরকে জায়গীর হিসাবে জমি দেওয়া হত। মুসলমান পীর-ফকীররাও সরকারী জমি ভোগ করতেন। এই সময়ে অনেকগুলি সামরিক উপনিবেশ গড়ে ওঠে। এদের মধ্যে মনসুরা, মাহফুজা ও মুলতানের নাম উল্লেখযোগ্য। সিন্ধুর লোকেরা তাদের স্থানীয় প্রশাসনিক কাজ কর্ম নিজেরাই সম্পন্ন করত। রাজস্বের প্রধান উৎস ছিল ভূমিকর ও জিযিয়া। উৎপাদিত গম ও বার্লির দু-পঞ্চমাংশ ভূমিকর হিসাবে ধার্য হত। অবশ্য জলসেচের ব্যবস্থা থাকলে এই কর ঠিক থাকত এবং জলসেচের ব্যবস্থা না থাকলে এই কর এক চতুর্থাংশে নেমে আসত। খেজুর, আঙ্গুর ও বাগানে উৎপাদিত অন্যান্য ফল মূলের এক তৃতীয়াংশ কর হিসাবে গ্রহণ করা হত। নগদ অর্থে বা দ্রব্যের বিনিময়ে রাজস্ব আদায় করা হত। এই সমস্ত ছাড়া অন্যান্য উৎস হতেও রাজস্ব আদায় করা হত। যারা সৈন্যের কাজ হতে মুক্ত ছিল এবং মুসলমানদের রক্ষাধীনে বাস করত তাদের নিকট হতে জিযিয়া কর আদায় করা হত। মুসলমানদেরকে জিযিয়া দিতে হত না। তবে তারা সদকা ও যাকাত দিত। জিযিয়া আদায়ের উদ্দেশ্যে মোহাম্মদ বিন্ কাসিম লোকদেরকে তিন ভাগে ভাগ করেন। প্রথম স্তরের লোকদেরকে বছরে ৪৮ দিরহাম ওজনের

রৌপ্য দিতে হত। দ্বিতীয় স্তরের লোকদের ২৪ দিরহাম এবং তৃতীয় স্তরের লোকদের ১২ দিরহাম দিতে হত। রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে মোহাম্মদ বিন্ কাসিম স্থানীয় অধিবাসীদের নিয়োগ করেন এবং তাদেরকে নির্ধারিত হারে খাজনা আদায়ের নির্দেশ দেন। খাজনা আদায়ের সময় যাতে কোন রকম জুলুম না করা হয় সে সম্পর্কে তিনি রাজস্ব আদায়কারীদের সতর্ক করে দেন। এই ব্যবস্থার ফলে প্রজারা শাসক গোষ্ঠীর অত্যাচার ও উৎপীড়নের হাত হতে রক্ষা পায় এবং তারা মোহাম্মদ বিন্ কাসিমের শাসনে সন্তোষ প্রকাশ করে। সিন্ধু দেশে প্রচলিত সামরিক বিধি অনুযায়ী প্রথমদিকে কেবল মুসলমানদেরকে সৈন্য বিভাগে নিযুক্ত করা হত। কিন্তু পরবর্তীকালে এই বিধি নিষেধ বহুল পরিমাণে শিথিল করা হয় এবং ভারতের মুসলিম শাসকবর্গ উদার ভাবে অমুসলমানদের সৈন্য বিভাগে নিযুক্ত করেছিলেন। বিচারকার্য নির্ভয়ে এবং নিরপেক্ষ ভাবে পরিচালিত হত। ইসলামী অনুশাসন ও আইন বিজ্ঞানে পারদর্শী কাজারাই বিচারাসন লাভ করতেন। সাধারণ এবং রাজনৈতিক অপরাধের ক্ষেত্রে মুসলমান ও অমুসলমানদের মধ্যে কোন পার্থক্য রক্ষা করা হত না। হিন্দুদের বিবাহ, উত্তরাধিকারে ও অন্যান্য সামাজিক ব্যাপার হিন্দু আইনানুসারে পঞ্চায়েতের দায়িত্বে সম্পন্ন করা হত।

সুলতান মাহ্মূদের ভারত আক্রমণের কারণসমূহ

(১) ধর্মীয় কারণ : সুলতান মাহ্মূদ নিজে একজন ধর্ম প্রাণ মুসলমান হলেও অন্যের ওপর কখনও জোর করে তাঁর ধর্মমতের বোঝা চাপিয়ে দেন নি। বিজেতা কর্তৃক হাঙ্গামা সৃষ্টি বা লুঠ তরাজ ইসলাম কখনও সমর্থন করে না। ডঃ নাজিম বলেন, কোন কোন রাজা ইসলাম কবুল করে ছিলেন বলে শোনা যায়। সম্ভবতঃ তাঁদের ধর্মান্তরিত হওয়ার মূলে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল। বিজেতার ক্রোধ হতে আত্মরক্ষার জন্য সাময়িক ভাবে ইসলাম গ্রহণ করলেও পরে তাঁরা আবার স্বধর্মে ফিরে গিয়েছিলেন। পরাজয়ের আশঙ্কায় বা ইসলামের অধীনে বিশেষ সুবিধা ভোগের জন্য

কোন হিন্দু রাজা যদি অনুচরবর্গ সহ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে থাকেন, তবে তা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যাপার। স্যার ডব্লিও হেইগ বলেন, "তাঁর ধর্মীয় নীতি সহিষ্ণুতার ওপরে গড়ে উঠেছিল এবং ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে উৎসাহী হলেও তিনি একটি বিরাট হিন্দু সৈন্যদল পোষণ করতেন। ধর্মান্তর গ্রহণ চাকরির শর্ত ছিল, এই কথা বিশ্বাস করবার কোন কারণ নেই। সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে হিন্দু সৈন্যরাও মুসলমান সৈন্যদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করত। যদি এটি ধর্মীয় যুদ্ধ হত তা হলে স্বধর্মীদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ হিন্দুদের পক্ষে সম্ভব হত না। সুলতান মাহ্‌মূদের ধর্মীয় নীতি সম্বন্ধে এম এল ফিলষ্টোন বলেন, "এই রকম ঘটনা কোথাও দেখা যায় নি যে, যুদ্ধ ব্যতীত কোথাও কোন হিন্দুকে তিনি প্রাণদণ্ড দান করেছেন।" মাহ্‌মূদ পারস্যে বহু মুসলমানকে হত্যা করেছিলেন এবং মধ্য এশিয়ায় প্রায় সমস্ত অভিযান তাঁর স্বধর্মীদের বিরুদ্ধেই পরিচালিত হয়েছিল। ডঃ নাজিম বলেন, 'যদি তিনি ভারতের হিন্দু রাজাদের নির্যাতন করে থাকেন তবে ইরাণ, ট্রান্স অক্সিয়ানার মুসলমান সুলতানদেরও তিনি রেহাই দেন নাই।' সুলতান মাহ্‌মূদের শাসনাধীনে হিন্দুরা পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করত। তিনি গজনীতে হিন্দুদের বসবাসের জন্য স্বতন্ত্র বাসস্থানের ব্যবস্থা করে ছিলেন। তারা সেখানে নিজেদের ইচ্ছানুসারে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করতে পারত। হিন্দুদেরকে রাষ্ট্রের বহু দায়িত্বশীল পদে নিয়োগ করেছিলেন। গজনীর সমর ইতিহাসে তিলক রায়, হাজারী রায় ও সোনাইয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। মাহ্‌মূদ গজনীতে হিন্দু সংস্কৃতি ও সংস্কৃত সাহিত্যের বিকাশ সাধনের জন্য একটি কলেজ এবং একটি বাজার স্থাপন করেছিলেন। ধর্মান্ধ হলে এই সমস্ত কাজ কি তাঁর দ্বারা সম্ভব হত? সুলতান মাহ্‌মূদ অবশ্য হিন্দুদের কয়েকটি মন্দির ধ্বংস করেছিলেন। ভারতের হিন্দুদের মন্দির ধ্বংস করা তাঁর সমর তালিকাভুক্ত ছিল। কারণ এই মন্দিরগুলি যুগ যুগ সঞ্চিত ধন রত্নের আগার ছিল। কিছু সংখ্যক লেখক মন্দির ধ্বংসের জন্য মাহ্‌মূদকে অভিযুক্ত করে থাকেন। কিন্তু তাঁরা ভুলে যান যে একমাত্র যুদ্ধের

সময়ই মন্দির ধ্বংস করা হয়েছিল। শান্তির সময় তিনি কখনও কোন মন্দির ধ্বংস করেন নি বা কোন মন্দির তাঁর হস্তে অপবিত্রও হয় নি। গুপ্তধনের সন্ধান না পেলে তিনি কোন মন্দিরের ওপর আক্রমণ চালাতেন না। পৌত্তলিকদের শাস্তি দেওয়া বা ইসলাম প্রচারের কোন বাসনা তাঁর ছিল না। বিখ্যাত ঐতিহাসিক ও প্রত্যক্ষদর্শী আল বেরুণী বলেন, "উৎপাদিত উদ্বৃত্ত সামগ্রী বিদেশী বণিকদের নিকট বিক্রয় করে যে সমস্ত ধর্মপ্রাণ হিন্দু ধনী হয়েছিল, তাদের দানকৃত ধনরত্ন মন্দিরে সঞ্চিত রাখা হত।" এই পবিত্র স্থানগুলিতে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য ছিল বলে অনেক সময় রাজারাও নিরাপত্তার জন্য এই মন্দিরগুলির মধ্যে ধনরত্ন সঞ্চয় করে রাখতেন। এই বিষয়ে ঈশ্বরী টোপা বলেন, "মাহ্‌মূদ ভারতের যে মন্দিরগুলি আক্রমণ করেছিলেন তাতে বিপুল ও বর্ণনাতীত ধনরত্ন সঞ্চিত ছিল এবং তাদের মধ্যে কয়েকটি ছিল রাজনৈতিক ক্রিয়া কলাপের কেন্দ্রস্থল। সুতরাং দেবমূর্তি ভেঙ্গে ইসলাম প্রচার ও মন্দির অপবিত্র করার জন্য সুলতান মাহ্‌মূদ বারবার ভারত অভিযান করেছিলেন বলে সমালোচকগণ যে সমস্ত মত প্রকাশ করেছেন, ইতিহাসের বিচারে তা ভ্রান্ত এবং মনস্তাত্বিক দিক দিয়ে অসত্য।

(২) রাজনৈতিক কারণ ঃ এর পশ্চাতে রাজনৈতিক প্রয়োজনের তাগিদ ও কিছুটা ছিল। সামরিক গুরুত্বের জন্য ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত দখল করা আফগানিস্তান ও কাবুল সাম্রাজ্যের জন্য অপরিহার্য হয়ে ওঠে। এখানে আরও উল্লেখযোগ্য যে, পাঞ্জাবের হিন্দুশাহী রাজ জয়পাল গজনীর শক্তি বৃদ্ধিতে বিশেষ উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠেন এবং সবুক্তি গীনের সময় তিনি সর্বপ্রথম গজনী আক্রমণ করে বসেন। কিন্তু সবুক্ত গীণের হাতে জয় পালের শোচনীয় পরাজয় ঘটে। তবে বিষয়টির তখনই নিষ্পত্তি হয়ে যায়নি। তাই সুলতান মাহ্‌মূদ সিংহাসনে আরোহণের পর নূতন করে এই দিকে মনোযোগ দেন। মধ্য এশিয়ায় একটি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য এবং এর জন্য তিনি পশ্চিমাঞ্চলে দেশ জয় এবং শক্তি সংগঠনের নীতি গ্রহণ করেন। কিন্তু পূর্বাঞ্চলে মাহ্‌মূদ পাঞ্জাব মুলতান প্রভৃতি কয়েকটি স্থান নিজের

রাজ্যভুক্ত করে সন্তুষ্ট ছিলেন। এশিয়ার পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব অঞ্চলের এলাকাগুলি সুলতান মাহ্‌মুদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম উৎস ছিল। ধর্মীয় উদ্দেশ্য অপেক্ষা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই তিনি ভারতে অভিযান করেন। স্বীয় সাম্রাজ্যের স্বার্থে তিনি ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত দখল করে নেন। তবে হিন্দু রাজন্যবর্গ কর্তৃক চুক্তির শর্ত লঙ্ঘন, সুলতানের আনুগত্য ত্যাগ, শত্রুকে সাহায্য দিয়ে রাজনৈতিক ভাবে বিশ্বাসঘাতকতা ভারতীয় মিত্রদের ওপর শত্রু প্রতিবেশীর হামলা এবং আশ্রিত ভারতীয় রাজাদের বিদ্রোহ ঘোষণার জন্যই সুলতান মাহ্‌মুদ বার বার ভারত অভিযানে বাধ্য হয়েছিলেন।

(৩) অর্থ নৈতিক কারণ: সুলতান মাহ্‌মুদের ভারত অভিযানের মূলে ছিল অর্থ নৈতিক কারণ, ধর্মীয় নয়। তাঁর বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন ছিল বলেই সম্ভবতঃ তিনি প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ ভারতের অগাধ ধন সম্পদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তিনি এক একবার অভিযান করে দেশে ফিরবার সময় প্রচুর অর্থ সঙ্গে নিয়ে গিয়েছেন। মধ্য-এশিয়ায় শত্রু দমন এবং গজনীকে কেন্দ্র করে একটি বিরাট সাম্রাজ্য গড়ে তোলার জন্য তাঁর এই অর্থের প্রয়োজন ছিল। সুতরাং এই পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক কারণেই সুলতান মাহ্‌মুদ ভারতে অভিযান করেছিলেন, ধর্মীয় কারণে নয়। মধ্য এশিয়ায় অন্যান্য শাসকদের ন্যায় সুলতান মাহ্‌মুদ স্থায়ীভাবে ভারতে বসবাস করতে চান নি। তাই দেশ জয় এবং শত্রুদের ক্ষমতা খর্ব করেই তিনি ভারতীয় ঐতিহাসিকদের নিকট বিজেতা অপেক্ষা আক্রমণকারী হিসাবেই পরিচিত হয়েছেন। মাহ্‌মুদের ভারত ও অন্যান্য রাজ্য বিজয়ী স্থায়ী কোন ফল দান করতে না পারলেও তিনি যে একজন বিজেতা ছিলেন এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের জন্য অর্থের প্রয়োজনীয়তা তিনি অনুভব করেছিলেন এবং ভারত সেই সুযোগ দান করলে তিনি তাহা গ্রহণ করেন। ভারত হতে সংগৃহীত অর্থ তিনি স্বীয় রাজধানী গজনীর উন্নতির জন্য ব্যয় করেছিলেন।

মাহ্‌মুদের ভারত আক্রমণের ফলাফল

সুলতান মাহ্‌মুদ প্রায় সতেরবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করে অনেকগুলি রাজ্য অধিকার করেছিলেন। প্রায় সমস্ত উত্তর-ভারত তাঁর সৈন্য বাহিনীর পরাক্রম অনুভব করেছিল। সীমিত অর্থে মাহ্‌মুদ ভারতের একজন সার্বভৌম সুলতান ছিলেন। কিন্তু সুলতান মাহ্‌মুদের বিজয়াভিযান ভারতের রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনে যে বিরাট প্রভাব বিস্তার করেছিল, তা অস্বীকার করা যায় না। রাজনৈতিক দিক হতে বিচার করলে দেখা যায় যে, তাঁর অভিযানের ফলে মুসলমানদের ভারতবর্ষ বিজয়ের পথ সুগম হয়েছিল। সুলতান মাহ্‌মুদের সাফল্য ভারতের রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তির দুর্বলতাকে প্রকাশ করে দিয়েছিল এবং যুদ্ধ কৌশল, শৃঙ্খলা ও কর্তব্যের প্রতি একনিষ্ঠতার দিক দিয়ে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়েছিল। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় যে, সুলতান মাহ্‌মুদের আক্রমণের ফলে বিজিত হিন্দু ও বিজেতা মুসলমানদের সভ্যতা পরস্পরের সান্নিধ্যে এসে পড়েছিল এবং বিজিত ও বিজেতার মধ্যে পারস্পরিক ভাব বিনিময় সম্ভব করে তুলেছিল। এম, এম, জাফর বলেন, "মুসলমান যোদ্ধা ও যুদ্ধ নেতাদের সঙ্গে মুসলমান ফকীর ও পণ্ডিত বর্গ এদেশে এসে ভারতীয় সমাজে অনুপ্রবেশ করে ইসলাম প্রচার করেছিলেন। এর ফলে অসংখ্য লোক ধর্মান্তর গ্রহণ করে। "সুলতান মাহ্‌মুদের বিজয়ের উদ্দেশ্য যদিও ধর্মপ্রচার ছিল না। তথাপি পরোক্ষভাবে তাঁর বিজয় ভারতে ইসলাম প্রচারের ভবিষ্যৎ পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছিল।

সুলতান মাহ্‌মুদ : সমীক্ষা—১

সুলতান মাহ্‌মুদ মুসলিম ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। একজন সুদক্ষ সেনানায়ক ও সৈনিক রূপে ভারতবর্ষ অভিযান কালে তিনি যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন তা তাঁর অনন্য সামরিক প্রতিভার পরিচায়ক। ঐতিহাসিক স্টেনলি লেনপুল বলেন, মাহ্‌মুদ ছিলেন

একজন উঁচুমানের সৈনিক। তাঁর দেহে ছিল শক্তি এবং মনে ছিল সাহস। তিনি ১৭ বার ভারত অভিযান করেন এবং প্রত্যেকটি অভিযানেই জয়লাভ করেন, একবারের জন্য ও তাঁকে কেউ পরাজিত করতে পারে নি। রাজন্যবর্গের মিলিত বাহিনীর বিরুদ্ধে একাকী লড়াই করে তিনি প্রত্যেকবারই তাঁদের হারিয়ে দেন। মাহ্‌মুদ অত্যন্ত সতর্ক ও দুঃসাহসী সমর নায়ক ছিলেন। উত্তম প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা না নিয়ে তিনি কখনও কোন অভিযানে বার হতেন না। তিনি তাঁর ৩২ বছরের রাজত্ব কালে বহু স্থান জয় করেন এবং বর্তমানে আফগানিস্তান বলে পরিচিত ভূখণ্ডে সাম্রাজ্য বিস্তার করেন। পারস্যের অধিকাংশ এলাকা, ট্রান্স অক্সিয়ানা এবং পাঞ্জাব তাঁর করতলগত হয়। শুধুমাত্র সামরিক শক্তির জোরেই গজনীর মত একটি অতি ক্ষুদ্র পার্বত্য রাজ্যকে তিনি বিশাল ও সমৃদ্ধশালী একটি সাম্রাজ্যে রূপান্তরিত করেন। এ তাঁর পক্ষে কম কৃতিত্বের কথা নয়। যুদ্ধ দেখে তিনি কখনও পিছিয়ে যান নি। বরং যুদ্ধ করা ছিল তাঁর নিকট আনন্দের ব্যাপার। প্রাচ্যে তাঁর সামরিক অভিযান গ্রীক বীর আলেকজাণ্ডারের বিজয় গৌরবকেও নিষ্প্রভ করে দেয়। আফগান, তুর্কী ও হিন্দু সৈন্য নিয়ে তাঁর সামরিক বাহিনী গঠিত হয়েছিল। কিন্তু এই বিভিন্ন জাতির মানুষকে একসূত্রে গেঁথে পরিচালনা করবার ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। দেশ বিজেতা হিসাবে গৌরব ও প্রতিপত্তি লাভ করাই ছিল তাঁর প্রধান লক্ষ্য এবং তিনি তা লাভ ও করেছিলেন।

(২) মাহ্‌মুদ শুধু সৈনিক ও সেনানায়কই ছিলেন না। তিনি সাম্রাজ্যের একজন প্রতিষ্ঠাতাও ছিলেন। শত্রু পক্ষের অধীনস্থ সকল রাজ্য জয় করে তাদের ক্ষমতার চূড়ান্ত বিলোপ সাধনই ছিল সুলতান মাহ্‌মুদের লক্ষ্য এবং তিনি এই লক্ষ্য সাধনে সক্ষম হয়েছিলেন। প্রতিবেশী বিদ্রোহী সর্দারদের দমন করে তিনি তাদের স্থলে বন্ধু ভাবাপন্ন ও তাঁর প্রতি অনুগত লোকদের নিয়োগ করেন। পাঞ্জাবে তাঁর শাসন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাই গজনী ত্যাগের পর

তাঁর পরিবারের লোকেরা লাহোরে এসে আশ্রয় গ্রহণ করে। ক্ষুদ্র গজনী রাজ্যকে তিনি বিশাল সাম্রাজ্যে রূপান্তরিত করেন। সুলতান মাহ্‌মুদের পূর্বে মধ্য এশিয়ার অন্য কোন আরব বা তুর্কী শাসক হিরাত, কাবুল ও গজনীর বেশী অগ্রসর হতে পারেন নি। মুসলিম শাসকদের মধ্যে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত পথে তিনিই প্রথম ভারতে অভিযান চালিয়েছিলেন।

(৩) শাসক হিসাবে সুলতান মাহ্‌মুদ ন্যায়পারায়ণ, সুবিবেচক ও কঠোর প্রকৃতির ছিলেন। তিনি কি ধরনের শাসন ব্যবস্থা করেছিলেন তা আমরা জানি না। তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, তাঁর সরকার সুসংগঠিত ও সুপরিচালিত ছিল। তিনি তাঁর সাম্রাজ্যকে কতিপয় প্রদেশে বিভক্ত করে প্রত্যেক প্রদেশে একজন করে শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। শাসনকর্তাগণ যাতে জনসাধারণের ওপর কো'ন রূপ অত্যাচার করতে না পারেন, সেইজন্য তিনি প্রদেশের শাসন ব্যবস্থার ওপর সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। ন্যায়দর্শী বিচারক বলে মাহ্‌মুদের বিশেষ খ্যাতি ছিল। জাতি, ধর্ম বর্ণ ও সামাজিক মর্যাদার প্রতি কোন পক্ষপাতিত্ব না করে তিনি সকলের প্রতি ন্যায় বিচার করতেন। শরীয়তের নির্দেশ মোতাবেক অপরাধীর শাস্তি বিধানকালে তিনি নিজের পুত্র ও আত্মীয়-স্বজনকেও রেহাই দেন নি। তাঁর দরবারের ঐতিহাসিক উতবী বলেন, "তিনি ছিলেন জনগণের বিধাতা। অসহায় বিধবাই হোক, আর সম্পদশালী ধনী ব্যক্তিই হোক, তিনি সকলকে সমানদৃষ্টিতে দেখতেন। এই সমদর্শিতার জন্য কারো অকারণ গৌরব বোধ করবার বা অন্যের ওপর অত্যাচার চালাবার সামর্থ ছিল না।

(৪) শিক্ষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য সুলতান মাহ্‌মুদ ইতিহাসে অমর হয়ে রয়েছেন। তিনি নিজে একজন কবি ও খ্যাতি সম্পন্ন পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। কথিত আছে, সুলতান মাহ্‌মুদ 'তাফরিদুল ফুরু' নামক গ্রন্থের লেখক। এই গ্রন্থখানি ফিকাহ শাস্ত্রের ওপর প্রামাণ্য রচনা বলে বিবেচিত হয়। তিনি শিল্পের ও

একজন সমঝদার ছিলেন এবং শিক্ষা ও শিক্ষিতদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। সুলতানের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য প্রাচ্যে যে সকল জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তি তাঁর রাজ সভাকে অলংকৃত করেছিলেন তাঁদের মধ্যে গণিত শাস্ত্রবিদ, দার্শনিক, জ্যোতিষ শাস্ত্রবিদ ও সংস্কৃতজ্ঞ আল-বেরুণী, ঐতিহাসিক উত্‌বী ও দার্শনিক ফারাবী এবং বাইহাকার নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এই যুগ ছিল কবিতার যুগ এবং সমগ্র এশিয়ায় সুপরিচিত কয়েকজন কবি মাহ্‌মুদের দরবারে নিয়মিত আসতেন। এই সমস্ত কবির মধ্যে ছিলেন ফররুখী ও আসজুদী। কিন্তু শাহ্‌নামার রচয়িতা ফেরদৌসী ছিলেন কবিদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। তাঁকে 'প্রাচ্যের হোমার' বলা হয়। 'শাহনামা' তাঁর নামকে অমর করে রেখেছে। কথিত আছে, শাহনামা লেখার জন্য মাহ্‌মুদ তাঁকে ৬০,০০০ স্বর্ণমুদ্রা দিতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ; কিন্তু শাহনামা লেখা শেষ হলে সুলতান তাঁকে ৬০,০০০ রৌপ মুদ্রা প্রদান করেন। মহাকবি ফেরদৌসী এতে ক্ষুব্ধ হয়ে সুলতান মাহ্‌মুদের ওপর একটি ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করেন এবং চিরদিনের জন্য গজনী ছেড়ে স্বদেশে চলে যান। সুলতান তাঁর ভুল বুঝতে পেরে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ৬০,০০০ স্বর্ণমুদ্রা তাঁকে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু এই স্বর্ণ মুদ্রা পৌঁছাবার পুর্বেই কবির মৃত্যু হয়। অর্থের প্রতি সুলতান মাহ্‌মুদের খুব মোহ ছিল। কিন্তু তিনি জনহিতকর কার্যের জন্য অকাতরে ব্যয় করতেন। তিনি শিক্ষার জন্য গজনীতে একটি বিশ্ববিদ্যালয়, একটি পাঠাগার ও একটি যাদুঘর স্থাপন করেন। সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা, অসংখ্য মাদ্রাসা মসজিদ দ্বারা তিনি গজনীকে সুসজ্জিত করেছিলেন এবং এটি এশিয়ার অন্যতম সুন্দর শহরে পরিণত হয়েছিল। তিনি 'স্বর্গীয় বধূ' নামে একটি বৃহৎ মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন এবং একে 'প্রাচ্যের আশ্চর্য' বলে বর্ণনা করা হয়। মাহ্‌মুদের আমলের শিল্প সংস্কৃতির বিকাশ সম্বন্ধে মার্শাল মন্তব্য করেন, "ইসলামী শিল্পকলা বিস্তারে গজনী কেবল মাধ্যমই ছিল না ; বরং এ সামানীয়দের নিকট হতে উপকরণ সংগ্রহ করে সমৃদ্ধশালী স্থাপত্য শিল্প গড়ে তুলেছিল।

(৫) সুলতান মাহ্‌মূদের চরিত্রে উচ্চাভিলাষ ও আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার প্রবণতা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যায়। ঐতিহাসিক আরল্ড উল্লেখ করেছেন, "সুলতান তাঁর ক্ষমতার গৌরব প্রদর্শনের জন্য তাঁর রাজপ্রাসাদ নিজের প্রতিমূর্তি, সৈন্যবাহিনী ও হস্তী বাহিনীর চিত্রে অলংকৃত করেন।" তিনি সাহসী, ধৈর্যশীল ও নীতিজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। শাসক হিসাবে তিনি প্রজাদের প্রতি দয়ালু ও সুবিচারক তিনি তাঁদের আনন্দে ও দুঃখে অংশ গ্রহণ করতেন। তিনি ছিলেন সহিষ্ণুতার প্রতীক। হিন্দুদেরকে তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীনতার সঙ্গে ধর্মকর্ম করবার অনুমতি দান করেছিলেন, জ্ঞানী ব্যক্তিদের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। মানব সমাজের এক মহান নেতা, সুদক্ষ সৈনিক, সুবিচারক এবং বিদ্যোৎসাহী হিসাবে মাহ্‌মূদ তাঁর সম সাময়িক রাজাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে পরিচিত হয়েছেন। মাহ্‌মূদ শিল্পী ও জ্ঞানের একজন মহান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। আল-বেরুণী, ফেরদৌসী উতবি প্রমুখ জ্ঞানী ও বিদ্বান ব্যক্তি তাঁর রাজদরবার অলংকৃত করেছিলেন। তিনি গজনীর বিখ্যাত জাম-ই-মসজিদ নির্মাণ করেন। তাঁর শাসনামলে গজনীতে একটি লাইব্রেরী, একটি যাদুঘর ও অনেক অট্টালিকা নির্মিত হয়েছিল।

মোহাম্মদ ঘুরী : সমীক্ষা—২

মোহাম্মদ ঘুরী একজন বিখ্যাত রাজনীতিবিদ্‌ এবং দূরদর্শী রাষ্ট্র পরিচালক ছিলেন। তিনি ভারতের শোচনীয় রাজনৈতিক অবস্থা অনুধাবন করেছিলেন। তাই এখানে তিনি স্থায়ী একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। সুলতান মাহ্‌মূদ ভারতীয় উপমহাদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে চান নি। তিনি এই দেশে এসে বিভিন্ন যুদ্ধে জয়লাভ করেছিলেন বটে, কিন্তু পরে স্বরাজ্যে ফিরে যান। পাঞ্জাব বিজয় ছাড়া তাঁর জন্য অন্য কোন অভিযান স্থায়ীফল দান করে নি। এই ব্যাপারে মোহাম্মদ ঘুরীর নীতি ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তিনি রাজ্য জয় করে তাঁর বিজয়কে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। তাঁর প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য

ছিল ভারতে স্থায়ীভাবে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত করা। তাই এদেশে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি তাঁর সকল শক্তি নিয়োগ করেছিলেন। নিজের তত্ত্বাবধানে তিনি একদল সুদক্ষ শাসক শ্রেণী গড়ে তুলেছিলেন। তাঁরা তাঁর বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। তরাইনের যুদ্ধের পর কুতুব উদ্দীন আইবকের হাতে ভারতের গুরু দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। তিনি প্রশংসার সঙ্গে তাঁর কর্তব্য সম্পন্ন করেছিলেন। যদিও মোহম্মদ ঘুরীর জীবন এক মর্মান্তিক পরিণতি লাভ করেছিল। তথাপি তিনি যে ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছিলেন, তাঁর উত্তরাধিকারিরা তার মর্যাদা রক্ষা করেছিলেন। ইতিহাসে তিনি কেবল বিজেতা হিসাবে নন, সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবেও বেঁচে রয়েছেন।

(২) মধ্যযুগীয় ভারতে মোহাম্মদ ঘুরী উল্লেখ যোগ্য ব্যক্তিদের অন্যতম ছিলেন। তিনি সাহসী, উৎসাহী ও শক্তিমান শাসক ছিলেন। হিন্দু রাজন্যবর্গের বিরুদ্ধে বহুবার এবং বহু বছর ধরে তাঁকে যুদ্ধ করতে হয়েছিল এবং এই ক্ষেত্রে তিনি অসাধারণ সংগঠনী শক্তি, দৃঢ় মনোবল ও অধ্যবসায়ের পরিচয় দিয়েছিলেন। এ, বি, এম, হাবীবুল্লাহ মন্তব্য করেছেন, "ইতিহাসে মুইজউদ্দীনের স্থান সম্পর্কে দ্বিমতের অবকাশ নেই।" তিনি গজনীর মাহ্‌মুদ অপেক্ষা অধিক বাস্তব রাজনৈতিক জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি ভারতের ঘুণেধরা বিপর্যস্ত রাজনৈতিক অবস্থার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন। সীমাবদ্ধ শক্তি নিয়ে তিনি আফগানিস্তান হতে বঙ্গদেশ পর্যন্ত একটি বৃহৎ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছেন, এ কম কৃতিত্বের কথা নয়।

(৩) মোহাম্মদ ঘুরী ছিলেন ধর্ম ভীরু। পরধর্মে তিনি ছিলেন সহিষ্ণু। হিন্দুদের প্রতি তিনি উদারতার দৃষ্টান্ত রেখে গিয়েছেন। তাঁর সেনাদলে অনেক হিন্দু ছিল। তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি যে সততা ও বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করেছেন, তা তাঁর চরিত্রকে উজ্জ্বল করে রেখেছে। তিনি বিজিতদের প্রতি কঠোর ছিলেন না, বিজিত এলাকায় লুণ্ঠনের দিকেও তাঁর আগ্রহ ছিল না। তিনি ছিলেন দয়ালু, দাতা এবং ন্যায় বিচারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল।

অনুচরদের প্রতি তাঁর স্নেহ ছিল পিতৃবৎ। চারিত্রিক গুণাবলীর জন্য তিনি অনুচরবর্গ ও জনগণের কাছে বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। মোহাম্মদ ঘুরী তাঁর প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী পৃথ্বীরাজের পুত্রকেই নিয়মিত কর প্রদানের শর্তে উক্ত রাজ্য প্রত্যার্পণ করেন। পরে পৃথ্বীরাজের এই পুত্র বিশ্বাসঘাতকতা করলে মোহাম্মদ ঘুরী তাঁকে অপসারিত করেছিলেন। কিন্তু কোন প্রতিশোধ গ্রহণ করেন নি। হিন্দু মুসলিম সকল ধর্মের প্রজাদের প্রতি তাঁর সহানুভূতি ও দয়া ছিল অপরিসীম। ভারতের অন্যান্য মুসলিম শাসকদের ন্যায় শিল্পকলা, শিক্ষা ও সাহিত্যের প্রতি মোহাম্মদ ঘুরীর অনুরাগ ছিল। ফখরুউদ্দীন রাজীর ন্যায় পণ্ডিতদের তিনি পৃষ্ঠপোষকতা করে ছিলেন। তাঁর শাসনামলে হিন্দু মুসলিম স্থাপত্য রীতির সংমিশ্রণে শিল্প কলার বিশেষ বিকাশ ঘটে।

কুতুবউদ্দীন ঃ সমীক্ষা—৩

(১) কুতুবউদ্দীন ছিলেন দিল্লীর প্রথম স্বাধীন সুলতান। তিনি ভারতে মুসলিম শাসনের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। একজন বড় যোদ্ধা হিসাবে কুতুবউদ্দীন বিখ্যাত ছিলেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও চেষ্টার দ্বারা তিনি ক্ষমতা ও গৌরবের উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তারিখ-ই মুবারক শাহী' এর রচয়িতা বলেন, "তিনি এমন তেজস্বিতা, সাহস ও উৎসাহের অধিকারী ছিলেন যে, রুস্তম যদি বেঁচে থাকতেন, তা হলে তিনিও তাঁর একজন শিষ্যের পদ লাভ করে গৌরব বোধ করতেন। কুড়ি বছরের মধ্যে তিনি সিন্ধু হতে গঙ্গা এবং হিমালয় হতে বিন্ধ্য পর্বত পর্যন্ত সমগ্র উত্তর ভারতের অধীশ্বর হয়েছিলেন। ভারতে তাঁর বিজয় পূর্ববর্তী শাসনামল অপেক্ষা অধিকতর বিস্তৃত ও স্থায়ী হয়েছিল। সিংহাসনে আরোহণ করবার পর সাম্রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে তাঁকে অনেক কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছিল। যে সকল শাসনকর্তা তাঁর ন্যায় পূর্বে ক্রীতদাস ছিলেন, তাঁদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে নিজের অধিকারকে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তিনি তাজউদ্দীন

ইয়ালদুজের ভগ্নীকে বিবাহ করেন এবং নিজের ভগ্নীকে কুবাচার সঙ্গে ও কন্যাকে ইলতুৎ মিশের সঙ্গে বিবাহ দেন।

(২) কুতুবউদ্দীন ছিলেন একজন সুশাসক। 'তাজুল মাসির' গ্রন্থের রচয়িতা হাসান উন-নিজামী বলেন, সুলতান নিরপেক্ষ ভাবে প্রজাদের শাসন করতেন, রাজ্যের শান্তি সমৃদ্ধির জন্য তিনি নিজের সমস্ত ক্ষমতা নিয়োগ করেছিলেন। তিনি আরও বলেন, তাঁর শান্তিময় রাজত্বকালে ধনাগারে কোন প্রহরী থাকত না। মেষপালের কোন পরিচালক প্রয়োজন হত না, একই পুষ্করিণীতে মেষ ও নেকড়ে পাশা পাশি পানি পান করত। চোর ও চৌর্যবৃত্তি সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন ওঠতে পারে না। কুতুবউদ্দীন বদান্যতায় ছিলেন দ্বিতীয় হাতেম। তাঁর বদান্যতা সম্বন্ধে প্রত্যেক ঐতিহাসিক উচ্চকণ্ঠে প্রশংসা করেন এবং তাঁকে 'লাখ বখ্‌শ' উপাধি দেন। কারণ লক্ষ লক্ষ টাকা তিনি দান করতেন। তিনি ইসলাম ধর্মের একজন একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। এবং এই ধর্ম প্রচারে তিনি প্রবল উৎসাহ অনুভব করতেন। কিন্তু হিন্দুদের প্রতি কোন উৎপীড়ণের দৃষ্টান্ত তিনি স্থাপন করেন নি। ডঃ ঈশ্বরী প্রসাদ বলেন, "যদিও ধর্মের পথে একজন মহান যোদ্ধা হিসাবে যুদ্ধের সময় হাজার হাজার লোককে দাস হিসাবে বন্দী করেছিলেন তথাপি হিন্দুদের প্রতি তিনি সদয় ব্যবহার করতেন। তিনি বহু হিন্দুকে সৈন্য বিভাগে ও রাজস্ব বিভাগে নিয়োগ করেছিলেন। উলেমা ও বিদ্বানদেরকে তিনি উচ্চ মর্যাদা দান করতেন।

(৩) সুলতান কুতুবউদ্দীন একজন বিদ্যোৎসাহী শাসক ছিলেন। তাঁর সভায় শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান ব্যক্তিগণ সমাদর পেতেন। তিনি দিল্লী ও আজমীরে দুটি বড় মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। এই মসজিদ দুটি এখনও ইসলাম ধর্মের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ এবং শিল্প ও স্থাপত্যের প্রতি উৎসাহের কথা প্রমাণ করে। দিল্লীর কুতুব মিনারটিও তিনি নির্মাণ করতে আরম্ভ করেছিলেন, কিন্তু শেষ করে যেতে পারেন নি। প্রখ্যাত সুফী কুতুবউদ্দীন বখতিয়ার কাকীর নামানুসারে এর

নাম রাখা হয় কুতুবমিনার। কুতুবউদ্দীন ছিলেন ভারতে মুসলিম বিজয়ের একজন অগ্রদূত।

ইলতুৎমিশ : সমীক্ষা -৪

(১) ভারতের ইতিহাসে সুলতান শামসউদ্দীন ইলতুৎমিশ একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রয়েছেন। তুর্কী জাতি যখন বিপদাপন্ন, দেশ তখন বিদ্রোহী সর্দার ও ক্ষমতাশালী অভিজাতগণ দ্বারা বিপর্যস্ত এবং বিজিত রাজ্য ও রাজাগণ দিল্লীর সুলতানের ক্ষমতার অস্তিত্ব বিলোপ সাধনে সচেষ্ট, সেই দুর্যোগের দিনে ইলতুৎমিশ সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সংকটময় মুহূর্তে তিনি তাঁর দূরদর্শিতা, সাহসিকতা ও সামরিক দক্ষতা নিয়ে পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে এগিয়ে আসেন। তিনি কঠোর হস্তে অভিজাতবর্গ ও সর্দারদের বিদ্রোহ দমন করলেন। ইয়ালদুজ ও কুবাচারএর ন্যায় তাঁর যে সমস্ত প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল তিনি তাঁদের পরাজিত করে হৃত প্রদেশগুলি পুনরুদ্ধার করলেন। কূটনৈতিক চাল চেলে এবং মোঙ্গলদের আক্রমণ প্রতিহত করে তিনি দিল্লীর সালতানাতকে রক্ষা করেন। প্রতিদ্বন্দ্বী সর্দার ও রাজপুত রাজারা তাঁদের ষড়যন্ত্র সাফল্যমণ্ডিত করতে পারলে হিন্দুস্থানে মুসলিম সাম্রাজ্য বিলুপ্ত হত এবং ভারতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব হত না। এই উপমহাদেশে মুসলিম সাম্রাজ্যের শিশুব্যবস্থায় উহাকে রক্ষা করার কৃতিত্ব তাঁরই প্রাপ্য। তিনি শুধু মুসলিম সাম্রাজ্যকে রক্ষা এবং একে বিপদ মুক্ত করেই ক্ষান্ত হননি, মালব ও সিন্ধু প্রদেশকে স্বীয় সাম্রাজ্য ভুক্ত করে সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি সাধনও করেছিলেন। এই কার্যে কুতুবউদ্দীনের ন্যায় তিনি কোন বৃহৎ সাম্রাজ্যের নৈতিক সমর্থন ও বাস্তব সহযোগিতা পাননি। নানা বিপদ ও অসুবিধার মধ্যে তিনি যা কিছু করেছিলেন তা তিনি একাই করেছিলেন। কুতুবউদ্দীনের পশ্চাতে ছিল মোহাম্মদ ঘুরীর সমর্থন ও সাহচর্য; আর ইলতুৎমিশের পশ্চাতে ছিল তাঁর স্বকীয় প্রতিভা ও সামর্থ। তিনি বিশৃংখল সাম্রাজ্যে সুষ্ঠু ও কল্যাণকর

শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। ভারতে মুসলিম সাম্রাজ্য রক্ষা ও বিস্তারের কথা বিচার করলে ইলতুৎমিশকে যথার্থই দিল্লীর সুলতানী যুগের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা যায়। ডঃ এ, বি, এম, হাবীবুল্লাহ বলেন, আইবক দিল্লীর সাম্রাজ্য ও তার সার্বভৌম মর্যাদার কেবল গোড়া পত্তন করেন, আর ইলতুৎমিশ ছিলেন নিঃসন্দেহে এর প্রকৃত প্রথম সুলতান।

(২) সুলতান ইলতুৎমিশ প্রকাশ্য ময়দানে শত্রুর মোকাবিলা করতে কখনও ইতস্ততঃ করেননি। গখ্খারদের দমন করতে গিয়ে তিনি অদম্য তেজস্বিতা ও সাহসের পরিচয় দেন। তাঁর চরিত্রে যুদ্ধপ্রিয় মনোভাব, সামরিক তেজস্বিতা, শারীরিক শক্তি এবং দুর্দমনীয় সাহসের সঙ্গে রাজনৈতিক প্রজ্ঞার সমাবেশ ঘটেছিল। তাঁর কূটনৈতিক বুদ্ধি তাঁকে গৌরব ও সুনামের শীর্ষে আরোহণ করতে সাহায্য করেছিল। তিনি স্পষ্ট ভাবে বুঝতে পেরেছিলেন যে, সাম্রাজ্য বিস্তারের পরিবর্তে এর সংহতি বিধান করাই অধিকতর প্রয়োজন। তাই তিনি অতি সতর্ক পদক্ষেপে অগ্রসর হয়ে একটি সুসংবদ্ধ তুর্কী সাম্রাজ্য গঠন করবার জন্য সম্ভাব্য সমস্ত উপায়ই অবলম্বন করেন। তিনি মোহাম্মদ ঘুরীর বিজিত তুর্কী সাম্রাজ্যের সংহতি বিধান করে ভারতে সদ্যজাত তুর্কী সাম্রাজ্যে এক নব অধ্যায় সংযোজন করেন। তিনি অস্বাভাবিক নিপুণতার সঙ্গে সাম্রাজ্য পুনর্গঠিত করে ন্যায় বিচার প্রদানও সামরিক ও বেসামরিক দপ্তরগুলির শৃংখলা বিধান করেন। তাঁর রাজকীয় সম্মান তাঁকে ভারতের ইতিহাসে এক উচ্চ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে।

(৩) ইলতুৎমিশ স্বীয় সদগুণের দ্বারা মানুষ ও শাসক হিসাবে অধিকাংশ সুলতান ও রাজন্যবর্গকে অতিক্রম করে গিয়েছিলেন। সমসাময়িক ঐতিহাসিক মিনহাযউস সিরাজ বলেন, "এই রকম ধার্মিক, দয়ালু, আল্লাহ্ ভক্ত ও বিদ্বানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল সুলতান দিল্লীর সিংহাসনে আর কখনও আরোহণ করেননি।" বুদ্ধিমান, চরিত্রবান এবং অসাধারণ গুণের অধিকারী ইলতুৎমিশ সুবিচারক, উদার ও জ্ঞানী শাসক হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন। তিনি একজন ধার্মিক

মুসলমান ছিলেন। দান ও দাক্ষিণ্যে তিনি বহু টাকা ব্যয় করতেন। ইলতুৎমিশ সাম্রাজ্যে অনেক স্কুল কলেজ স্থাপন করেছিলেন। তিনি শিক্ষিতদের শ্রেষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বিভিন্ন দেশের কবি, জ্ঞানী ও ফকীর-দরবেশের সমাবেশে তাঁর রাজসভা অলংকৃত ছিল। তিনি তাঁর রাজধানীকে শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থলে পরিণত করেছিলেন। সাহিত্য, শিল্প ও বিজ্ঞান তাঁর রাজত্বকালে যথেষ্ট প্রসার লাভ করে। দিল্লীর কুতুবমিনার তাঁর মহত্বের অবিনাশী রূপ নিয়ে আজও বিদ্যমান। আজমীরের অপূর্ব সুন্দর মসজিদ স্থাপত্য বিদ্যার প্রতি তার অকৃত্রিম প্রীতির পরিচয় বহন করে। আরবী মুদ্রার প্রচলন তাঁর শাসনামলের উল্লেখযোগ্য কীর্তি। ভারতবর্ষে মুসলমান শাসক হিসাবে তিনিই সর্বপ্রথম মুদ্রা ব্যবহার পুনর্বিন্যাস করে আরবী মুদ্রার প্রচলন করেন। ইলতুৎমিশের রাজত্বকাল ভারতে তুর্কী শাসনের শ্রেষ্ঠ কাল বলে বিবেচিত হয় এবং ইলতুৎমিশকে দিল্লীর প্রাথমিক তুর্কী সাম্রাজ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ হিসাবে গণ্য করা যায়।

গিয়াসউদ্দীন বলবান ঃ সমীক্ষা

(১) মধ্যযুগের ইতিহাসে বলবন একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছেন। তিনি সিংহাসনে আরোহণ করবার সময় সাম্রাজ্যের মর্যাদা বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল এবং সভাসদের ঔদ্ধত্য, হিন্দু সর্দারদের অনানুগত্য ও মোঙ্গলদের উপর্যপুরি আক্রমণের ফলে সাম্রাজ্য বিপদাপন্ন হয়ে পড়েছিল। সেই যুগে গিয়াসউদ্দীন বলবনের মত একজন রাষ্ট্রনায়কের অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। সাহসের সঙ্গে তিনি পরিস্থিতির মোকাবিলা করেছিলেন। বিদ্রোহী প্রজা নীতি বর্জিত ক্ষুদ্রজাতিগুলির ক্ষমতা তিনি বিনষ্ট করেছিলেন এবং মোঙ্গলদের হাত হতে উত্তর পশ্চিম প্রদেশ রক্ষা করেছিলেন। শক্তি প্রয়োগের নীতি গ্রহণ করে তিনি বিচ্ছিন্ন সাম্রাজ্যের সর্বত্র শান্তি ও শৃংখলা ফিরিয়ে এনেছিলেন। ডাঃ অজিজ আহমদ বলেন, "গোলযোগ এবং আসন্ন বিপদের মধ্য হতে বলবন সাম্রাজ্যে শৃংখলা ও সমৃদ্ধি আনয়ণ করেছিলেন। প্রজাবর্গ

তাঁর এই নূতন শাসনকে সানন্দে অভিনন্দন জানিয়েছিল।" শান্তি-ভঙ্গকারীদের তিনি এমন শাস্তি দিয়েছিলেন যে, কেউ আর রাষ্ট্রের আইন ও শৃংখলা ভাঙতে সাহস করেনি। এই ভাবে অতীতে উপেক্ষা ও নীতি ভঙ্গ করবার যে প্রবণতা দেখা দিয়েছিল তা সমূলে বিনষ্ট হল। সুলতান রাজদরবারের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছিলেন এবং এমন এক অপূর্ব বিচার সভা গঠন করেছিলেন যেখানে হাসি-ঠাট্টা চিরতরে বর্জিত হয়েছিল। জিয়াউদ্দীন বারানী বলেন, 'গিয়াসউদ্দীন' বলবল পারস্যের রাজাদের নীতি অনুযায়ী বিচারালয় ও প্রাসাদ সাজিয়েছিলেন। তিনি অশ্বারোহীদের শোভাযাত্রা এবং রাজসভার গৌরব ও চাকচিক্যকে অধিকতর মূল্যদান করেছিলেন।" দায়িত্বপূর্ণ সরকারী পদে তিনি উচ্চ বংশজাত ও সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর লোকদের নিযুক্ত করতেন এবং নীচ বংশজাত লোকদের সরকারী পদের জন্য অনুপযুক্ত মনে করতেন। সুলতানের রাজকীয় মর্যাদা জ্ঞান এত প্রখর ছিল যে, তিনি তাঁর নিজস্ব সেবকদের নিকট পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ পোশাক পরিধান করে বার হতেন এবং পদস্থ কর্মচারী ও ভৃত্যদের সহচর্য গ্রহণ করতেন না।

(২) আভ্যন্তরীন দুর্যোগে এবং বাহ্যিক বিপদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতেই বলবনের রাজত্বকাল অতিবাহিত হয়। তাঁর বাইশ বছরের রাজত্বকালে মোঙ্গলদের আক্রমণের চাপে এবং নূতন বিজিত রাজ্যগুলির সংহতি বিধান ও বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে তিনি সাম্রাজ্য বিস্তারের মনোযোগ দিতে পারেন নি। সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির অপেক্ষা সাংগঠনিক কার্যেই তিনি অধিকতর আত্মনিয়োগ করেছিলেন। সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা দৃঢ়ীকরণের ওপর বলবনের নীতি প্রতিষ্ঠিত ছিল। যে ব্যক্তি ভারতের শিশু মুসলিম রাষ্ট্রকে রক্ষা করে ছিলেন এবং সামাজিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করে তিনি সামরিক ও শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সামগ্রিক উন্নয়ন সাধন করেছিলেন, তিনি নিঃসন্দেহে একজন সুদক্ষ রাজনীতিবিদ ও সংগঠক। বলবন পারস্য সম্রাটের অনুকরণে রাজদরবারের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছিলেন।

কোন আমীর ওমরাহ দরবারে হাস্যকৌতুক করুক, তা তিনি সহ্য করতেন না। ঐতিহাসিক বারাণী বলেন, গিয়াসউদ্দীন বলবন পারস্যের রাজাদের রীতি অনুযায়ী রাজদরবার ও রাজপ্রসাদ সজ্জিত করেছিলেন। তিনি অশ্বারোহীদের শোভাযাত্রা এবং রাজসভার গৌরব ও চাকচিক্যকে অধিকতর গুরুত্ব দান করেছিলেন। সাম্রাজ্যের মর্যাদা বৃদ্ধি সুলতান বলবনের এক বিরাট কৃতিত্ব হিসাবে গণ্য করা হয়। দায়িত্বপূর্ণ সরকারী পদে বলবন উচ্চ বংশজাত সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর লোকদের নিযুক্ত করতেন এবং নীচ বংশজাত লোকদের সরকারী পদের জন্য অনুপযুক্ত মনে করতেন। তাঁর মর্যাদা জ্ঞান এত প্রখর ছিল যে, তিনি তাঁর নিজস্ব সেবকদের সম্মুখে পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ পোশাক পরিধান করে উপস্থিত হতেন এবং পদস্থ কর্মচারী ও ভৃত্যদের সহচর্য পরিহার করে চলতেন। ইলতুৎমিশের ন্যায় বিখ্যাত ইলবারী তুর্কী হলেও বলবন নিজেকে শাহনামা বর্ণিত তুরানী সমর নায়ক আফরাসিয়ারের বংশধর বলে পরিচয় দিতেন। সুলতান বলবন পৃথিবীতে রাজাকে 'আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি' বলে মনে করতেন এবং চারটি কর্তব্য সম্পাদন করবার মূলে রাজার পারলৌকিক মুক্তি নির্ভর করে বলে তাঁর বিশ্বাস ছিল। এই চারটি কর্তব্য হল: (ক) ধর্ম রক্ষা করা এবং শরীয়তের শাসনকে কার্যকর করা (খ) দুর্নীতি ও পাপাচার নিবারণ করা (গ) ধার্মিক ও সম্ভ্রান্ত লোকদের রাজকার্যে নিযুক্ত করা (ঘ) নিরপেক্ষতা ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা। একবার সুলতান বলবন বলেছিলেন, 'আমি যা করি, নির্দয়ের নির্দয়তার বিলোপ সাধনের জন্যই তা করি এবং আমি দেখতে চাই যে, আইনের সম্মুখে সকল মানুষই সমান। রাষ্ট্রের গৌরব এমন এক শাসনের ওপর নির্ভর করে যা প্রজাদের রাজভক্ত ও একতাবদ্ধ হতে শিক্ষা দেয়। কিন্তু ধর্মীয় উন্নতি অথবা দরিদ্র ব্যক্তির সুখ বা বিরুদ্ধ চিন্তাকে তা প্রশ্রয় দেয় না।

(৩) সুলতান বলবন শাসকের গুণ ও প্রতিভা নিয়ে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি স্বেচ্ছাচারী হলেও নীতি পরায়ণ ও কর্তব্য কর্মে

কঠোর নিয়মানুবর্তিতা পালন করতেন। অপরাধীদের প্রতি তিনি ছিলেন অত্যন্ত নির্মম। ফলে কেউ তাঁর আদেশ অমান্য করতে ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে সাহস পেত না। তাঁর শাস্তিদানের রীতি যদিও কঠিন ও নির্মম ছিল তথাপি তদানীন্তন শাসকদের মধ্যে তাঁকে সর্বাপেক্ষা দয়ালু, শিক্ষিত ও উদার বলা যেতে পারে। সাম্রাজ্যের সর্বত্র তিনি নিরপেক্ষ বিচারক ও সুদক্ষ শাসক হিসাবে পরিচিত ছিলেন। বলবন রাষ্ট্রের সকল খবরাখবর অবগত হবার জন্য একটি সুদক্ষ গুপ্তচর বাহিনী গঠন করেছিলেন। সঠিক খবর প্রেরণে ব্যর্থ হলে গুপ্তচরদেরকে ও রেহাই দেওয়া হত না। ঈশ্বরী প্রসাদ বলেন, "বিচারকার্য পরিচালনার জন্য তিনি তাঁর আত্মীয় স্বজনদের প্রতিও পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করেন নি। তাঁর কোন আত্মীয় বা সহচর অন্যায় কাজ করলে তিনি উহার প্রতিকার করতে দ্বিধা করতেন না।" ডঃ আর, পি, ত্রিপাঠীর মতে, তাঁর শাসন নীতি শক্তি, সম্মান ও সুবিচারের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। শাসক হিসাবে বলবন কঠোর ছিলেন সন্দেহ নেই, তবে এই কঠোরতা ছিল রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যাপারে সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব বিধানের জন্যই। তিনি তাঁর এই উদ্দেশ্য সাধনে সফলতা লাভ করেছিলেন। তাঁর সুপ্রতিষ্ঠিত রাজতন্ত্রকে ভিত্তি করেই পরবর্তী কালে আলাউদ্দীন খলজী অধিকতর শক্তিশালী সাম্রাজ্য গঠন করেছিলেন।

(৪) সুলতান বলবন যে কেবল সুশাসক ও বীর ছিলেন তা নয়, তিনি বিদ্যোৎসাহী ও গুণীর পৃষ্ঠপোষকও ছিলেন। তাঁর সময়ে দিল্লী নগরী মুসলিম কৃষ্টির অন্যতম শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। ভারতের তোতা পাখী নামে পরিচিত আমীর খসরু বলবনের দরবারকে অলংকৃত করেন ও তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। মোঙ্গলদের আক্রমণে মধ্য এশিয়া হতে বহু বিদ্বান ব্যক্তি ও রাজ্য হারা তাঁর দরবারে আশ্রয় লাভ করেছিলেন। এই জন্য বলবন বহির্ভারতে মুসলিম কৃষ্টি সভ্যতার রক্ষক হিসাবে পরিচিতি লাভ করে ছিলেন।

(৫) সুলতান বলবন ছিলেন অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী।

ধর্মানুগত্য তাঁর চরিত্রের একটি বিশেষ গুণ ছিল। তিনি নিয়মিত আল্লাহ্‌র উপাসনা করতেন, রমজানের রোযা রাখতেন ও তাহাজ্জোদ নামায আদায় করতেন। বাদাউনী বলেন, তিনি ঐকান্তিকতার সঙ্গে জামাতের নামাযে যোগদান করতেন এবং কখনও বিনা অযুতে থাকতেন না। প্রতি শুক্রবার তিনি পীরের দরগাহ ও কামেল ব্যক্তিদের কবর জিয়ারত করতেন। প্রথম জীবনে তিনি মদ্যপায়ী ছিলেন। কিন্তু সুলতান পদে অধিষ্ঠিত হবার পর তিনি মদ্যপান বর্জন করেন। ন্যায় নীতিও কর্তব্য পরায়ণতার জন্য তাঁর বিশেষ সুখ্যাতি ছিল।

আলাউদ্দীন খলজী ও তাঁর প্রশাসনিক ব্যবস্থা

আলাউদ্দীন খলজী কেবল বিখ্যাত যোদ্ধা ও বিজেতাই ছিলেন না, শাসন ব্যবস্থায় ও তিনি ছিলেন আসাধারণ প্রতিভার অধিকারী। কে, এম, লালের মতে, অপর যে কোন গুণ অপেক্ষা শাসনকার্যে যোগ্যতাই আলাউদ্দীনকে পূর্ববর্তী শাসকদের অপেক্ষা অধিকতর উচ্চ মর্যাদার অধিকার দান করেছিল। সংগঠক হিসাবে তাঁর মর্যাদাকে আচ্ছন্ন করেছিল। মুঘলদের পূর্বে আর কোন শাসক রাষ্ট্রীয় কার্য কলাপের সংগঠন ব্যবস্থায় তাঁর ন্যায় এত বেশী মনোযোগ দেন নি। শাসন ব্যবস্থার বিভিন্ন ক্ষেত্রে তিনি কতিপয় কল্যাণ কর সংস্কার ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিলেন। যথাক্রমে তা নিম্নে বর্ণিত হল—

(১) সার্বভৌমত্বের ধারণায় আলাউদ্দীন খলজী তাঁর পূর্ববর্তী শাসকদের অনুসৃত পন্থা হতে ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে ছিলেন। দিল্লী সাম্রাজ্যের ইতিহাসে তিনিই সর্ব প্রথম ঘোষণা করেন যে, তিনি উলামাদেরকে রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপে হস্তক্ষেপ করতে দেবেন না। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, ধর্ম রাষ্ট্রীয় ব্যাপার হতে স্বতন্ত্র থাকবে। তিনি সুলতানের ক্ষমতা সুনিয়ন্ত্রিত ও নিরঙ্কুশ রাখার পক্ষপাতী ছিলেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে দুটি প্রভাবশালী দল—উলামা ও উমরাহ দিল্লীর সুলতানের ওপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। আলাউদ্দীনের লক্ষ্য ছিল সুলতানের আধিপত্য বলিষ্ঠতর করা এবং

এই উদ্দেশ্যে তিনি সাম্রাজ্যের ক্ষমতা ও আধিপত্যের ওপর উলামা, উমরাহ বা হিন্দুদের হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করতে রাজী ছিলেন না। কাজী মুঘীসউদ্দীনের নিকট তাঁর উক্তি হতে এই মনোভাবের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

(২) সিংহাসনে আরোহণের পর সুলতানকে অনেকগুলি বিদ্রোহের মোকাবিলা করতে হয়েছিল এবং তিনি উহা কার্যকর ভাবে দমন করে-ছিলেন। হাজী মাওলার বিদ্রোহ, নও—মুসলমানদের বিদ্রোহ, আকাত খানের দেশদ্রোহিতা ও তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র উমর খান ও মাংগু খানের বিদ্রোহের ফলে তাঁর বিশ্বাস জন্মেছিল যে, উহার পশ্চাতে চারটি কারণ বিদ্যমান, যথা—(ক) রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে সুলতানের অমনোযোগিতা, (খ) মদ্যপান, (গ) উমরাহদের পারস্পরিক ঘনিষ্ঠতা, মৈত্রী ও বার বার বৈঠক এবং উহার মাধ্যমে সরকারের বিরুদ্ধে চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র এবং (ঘ) সম্পদের প্রাচুর্য যাতে চক্রান্ত ও বিদ্রোহের উসকানি দেওয়া হয়। আলাউদ্দীন কেবল বিদ্রোহের কারণ বিশ্লেষণ করেই ক্ষান্ত হন নি, বিদ্রোহ প্রতিরোধের দিকেও মনোযোগ দিয়েছিলেন।

(৩) সম্পদশালী শ্রেণীর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা ছিল বিদ্রোহ দমনের জন্য সুলতানের গৃহীত পরিকল্পনার প্রথম ব্যবস্থা। তিনি তাদের ব্যক্তিগত মালিকানার উচ্ছেদ সাধন করেন। ব্যক্তিগত ভূমি বা দানের জমি অথবা ধর্মীয় উদ্দেশ্যে প্রদত্ত সম্পত্তি হিসাবে যে সকল গ্রাম ও জায়গীর তারা ভোগ করছিল, তা বাজেয়াপ্ত করা হয়। অনুরূপ ভাবে সর্বপ্রকারের ভাতা বন্ধ করে দেওয়া হয়। এই ব্যবস্থার ফল সম্পর্কে বারাণী বলেন, "জনগণকে অর্থহীন অবস্থায় আণয়ন করা হয় এবং অবস্থা এমন চরম পর্যায়ে উপনীত হয় যে, মালিক, আমীর, কর্মচারী, সুলতানী ও মহাজন ব্যতীত কারো হাতে নগদ কোন অর্থ থাকত না। কেবল ন্যূনতম জীবিকা সংগ্রহে তাদেরকে এমন ব্যতিব্যস্ত থাকতে হত যে বিদ্রোহের চিন্তাও তাঁদের মনে আসতে পার না।"

(৪) সুলতান একদল সুযোগ্য গোয়েন্দা নিযুক্ত করেন। উমরাহদের গৃহে অথবা শহরে-বাজারে যা কিছু ঘটত তার সব কিছুই সুলতানের

গোচরীভূত করাই ছিল গোয়েন্দার কাজ। এতে ফল হয়েছিল এই যে, শেষে 'দেওয়ালে শুনতে পায়' এই ভয়ে জনসাধারণ নিজেদের গৃহেও ঘরোয়া বৈঠকে অবাধে কথাবার্তা বলা হতে বিরত থাকত।

(৬) শরাব ও অন্যবিধ মাদক দ্রব্য ব্যবহার ও বিক্রয় কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। সুলতান নিজে মদ্যপানের অভ্যাস বর্জন করে ও তাঁর মদ্য পাত্র সমূহ ভেঙ্গে ফেলার আদেশ দিয়ে প্রজাদের নিকট মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। পরিশেষে সুলতানের নিকট হতে পূর্বাহ্ণে অনুমতি গ্রহণ ব্যতীত উমরাহ শ্রেণীর সর্ববিধ সামাজিক বৈঠক ও পারিবারিক সংযোগ নিষিদ্ধ করা হল। মদের অভাবে ভোগবিলাস ও বিবাহ উৎসব, এক কথায় উমরাহদের জীবন এক ঘেয়ে ও নিরানন্দময় হয়ে উঠল। আলাউদ্দীন খলজীর অবলম্বিত ব্যবস্থা সমূহ এমন কঠোর ছিল যে, এই সব আদেশ বলবৎ করার পর কোনরূপ গোলযোগের উদ্ভব হয়নি। কিন্তু এর অধিকাংশ ব্যবস্থাই মুসলিমদের বিরুদ্ধে গৃহীত হয়েছিল।

(৩) রাজস্ব সংস্কার ঃ

সাম্রাজ্যে প্রচলিত দুর্নীতি দূর করে রাষ্ট্রের আর্থিক সচ্ছলতা বৃদ্ধি করাই ছিল সুলতান আলাউদ্দীন খলজীর রাজস্ব নীতির লক্ষ্য। কৃষকদের নিকট হতে অর্থ আদায় করা হত বলে হিন্দুদের ওপর অর্থনৈতিক চাপ অধিক পরিমাণে পড়েছিল। অধিকাংশ ভূম্যাধিকারী ও রাজস্ব সংগ্রহকারী ছিল হিন্দু এবং তারা খুত, চৌধুরী ও মুকাদ্দাম নামে পরিচিত ছিল। তারা প্রভূত অর্থ সম্পদ জমা করেছিল এবং উহা তাদেরকে বিদ্রোহে প্ররোচিত করত। জমির উৎপাদনের অর্ধাংশ রাষ্ট্রের তহবিলে জমা দেওয়ার জন্য সুলতান আদেশ জারি করেছিলেন। তিনি তাদের ওপর চারণ কর, গৃহ কর প্রভৃতি কর ধার্য করেন। তাঁর গৃহীত নীতির ফলে গ্রামের খুত, চৌধুরী ও মুকাদ্দামরা দুঃস্থ ও দরিদ্রে পরিণত হয়েছিল। বারাণী তাদের অবস্থার এক করুণ চিত্র অঙ্কন করেছেন। বারাণীর বর্ণনানুসারে তাদের মধ্যে কেউই শির উঁচু করে চলতে পারত না এবং তাদের গৃহে স্বর্ণ, রৌপ্য,

পিতলের টঙ্কা অথবা কোন প্রকারের বাহুল্যসূচক বস্ত্র দেখা যেত না। খুত ও মুকাদ্দামদের দারিদ্র পীড়িত স্ত্রীগণ মুসলমানদের গৃহে সন্ধান করে বেড়াত। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সুলতান ইতিপূর্বেই তাঁর মুসলিম প্রজাদের জায়গীর, ধর্মীয় উদ্দেশ্যে নিয়োজিত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত এবং ভাতা সমূহ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। এইভাবে তিনি সাম্রাজ্যের রাজস্ব বৃদ্ধি করেন। ভারতের শাসকদের মধ্যে আলাউদ্দীন খলজী সর্বপ্রথম ভূমি জরিপ ও বন্দোবস্তের পদ্ধতি প্রবর্তন করেন। চাষকৃত ভূমির পরিমাপ হিসাবে রাজস্ব ধার্য করা হত এবং ভূমির মোট উৎপাদনের অর্ধাংশ রাজস্ব হিসাবে নির্ধারিত হত। পরবর্তীকালে শেরশাহ ও আকবর ভূমির এই পরিমাপ পদ্ধতি গ্রহণ করে এর উন্নতি বিধান করেছিলেন।

(৪) সামরিক সংস্কার :

মোঙ্গল হামলার ক্রমাগত হুমকি সুলতানকে বিশাল সামরিক বাহিনীর প্রয়োজন সম্পর্কে সচেতন করে তুলেছিল। জায়গীরদারগণ সামরিক প্রয়োজনে যে ভাবে সৈন্য সরবরাহ করত, তাতে তিনি সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। সুলতান নিজে প্রত্যক্ষভাবে সৈন্য ভর্তি করে এক বিরাট স্থায়ী সেনাবাহিনী গঠন করেন এবং রাষ্ট্রের তহবিল হতে সৈন্যদের বেতন দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। যে কোন প্রকার প্রতারণা নিরোধের জন্য সুলতান অশ্ব সমূহকে চিহ্নিত করার রীতি প্রবর্তন করেন। এর ফলে অযোগ্য অশ্বকে যুদ্ধক্ষেত্রে আনা যেত না। তিনি হুলিয়া পদ্ধতি বা সৈন্যদের বিস্তারিত বিবরণ সম্বলিত তালিকা প্রণয়ন করেন। এতে প্রকৃত সৈনিক ব্যতীত অন্য কেউ সামরিক কুচকাওয়াজে অংশ গ্রহণ করতে পারত না। এই সব ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে চতুর আমীরগণ অশ্ব ও সৈনিকদের পরিচিত সম্পর্কে সুলতানকে প্রতারিত করতে পারতেন না।

(৫) অর্থনৈতিক সংস্কার :

আলাউদ্দীন খলজীর অর্থনৈতিক সংস্কার তাঁর শাসন ব্যবস্থার অত্যন্ত গুরুত্ব পূর্ণ বৈশিষ্ট্য। সমগ্র ভারতীয় ইতিহাসে সম্ভবতঃ তিনিই

একমাত্র শাসক, যিনি অর্থ নৈতিক সংস্কার ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিলেন এবং এর জন্য ঐতিহাসিক লেনপুল তাঁকে 'একজন মহান, রাজনৈতিক অর্থনীতি বিদ বলে আখ্যায়িত করেন। আলাউদ্দীন খলজী কেবল মোঙ্গল বাহিনীর হামলা মোকাবিলা করার জন্যই নয়; বরং তাঁর বিজয়াভিযান অব্যাহত ভাবে চালিয়ে যাওয়ার জন্য ও এক বিশাল সেনা বাহিনী সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা পূর্ণভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। সেনাবাহিনীর ব্যয় নির্বাহ ব্যতীত শাসন ব্যবস্থা সংক্রান্ত ব্যয়ভার বহণের জন্যও সুলতানের অর্থের প্রয়োজন ছিল। অবশ্য তিনি দাক্ষিণাত্য হতে বিপুল সম্পদ এনেছিলেন এবং বিভিন্ন অধীনস্থ রাজার নিকট হতে ও কর সংগ্রহ করেছিলেন। কিন্তু এ সত্ত্বেও চাহিদা পূরণের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ সুলতানের ছিল না। সুতরাং তিনি সৈন্যদের নির্ধারিত পণ্য সরবরাহ করতে চাইলেন। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরিমিত বেতনভোগী সৈনিকদের ব্যয় সংকুলান দূরূহ হয়ে পড়ে। সেনাবাহিনীর সন্তোষ বিধানের জন্য সুলতান তাঁর বিখ্যাত মূল্য নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি প্রবর্তন করেন। এর দ্বারা জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় পণ্যের মূল্য বেঁধে দেওয়া হল। মূল্য নিয়ন্ত্রণ মূলতঃ যুদ্ধকালীন ব্যবস্থা। আধুনিক যুদ্ধকালীন সংকটের সমাধানের জন্য ও মূল্য নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন হয়েছে। অনুরূপ ভাবে বার বার মোঙ্গলদের হামলা ও রাজপুতনায় তাঁর যুদ্ধ বিগ্রহের অবস্থা সুলতানকে মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে বাধ্য করে। মূল্য নিয়ন্ত্রনের প্রয়োজন সম্পর্কে সুলতানের নিম্ন বর্ণিত উক্তি বারাণীর বিবরণে লিপিবদ্ধ হয়েছে; "আমি যদি বিপুল পরিমাণ অর্থ সামরিক বাহিনীর বেতন বাবদ বরাদ্দ করি এবং একই হারে সর্বত্র এই বেতন দেওয়ার রেওয়াজ বজায় রাখতে চাই, তা হলে বর্তমানে সরকারী মালখানা পূর্ণ থাকলেও পাঁচ ছ বছরে তা নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।' মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তনের আরও একটি কারণ ছিল তা হল আলাউদ্দীনের দাক্ষিণাত্য বিজয়ের ফলে প্রচুর ধনরত্ন আমদানী হয়েছিল এবং সেই কারণে পূর্বাপেক্ষা বহুগুণবেশী

অর্থ চালু হয়েছিল। দাক্ষিণাত্য হতে সম্পদ আমদানীর ফলে মুদ্রার মূল্যমান হ্রাস এবং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়। সুলতান আলাউদ্দীন খলজী পণ্যের মূল্য হ্রাস করে দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সহজ লভ্য করবার জন্য এই ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। সুলতান বিভিন্ন দ্রব্যের ও প্রাত্যহিক জীবনের প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করে কতকগুলি আদেশ জারি করেন। খাদ্যশস্য সুলভমূল্যে ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়। গম বিক্রয় হত প্রতিমণ ৭½ জিতল হারে, বার্লি প্রতিমণ ½ জিতল, ছোলা প্রতিমণ ৫ জিতল, ধান প্রতিমণ ৫ জিতল, মাষ প্রতিমণ ৫ জিতল, তৈল প্রতি সের ৩ জিতল, চিনি প্রতি সের ১½ জিতল, গুড় প্রতি সের ⅓ জিতল, মাখন প্রতি সের ১ জিতল এবং লবণ ২½ মনের মূল্য ছিল ৫ জিতল। দোকানদারগণকে এই নির্ধারিত মূল্যে পণ্য বিক্রয় করতে হত এবং এ অপেক্ষা অধিক মূল্য দাবী করা অপরাধ হিসাবে গণ্য করা হত। অনুরূপ ভাবে শাক সব্জী, ফল, টুপি, জুতো, কাপড়, অস্ত্র, সুঁচ প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যও নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছিল। এমন কি অশ্ব, গো-মহিষ, ছাগলও গোলামের মূল্য পর্যন্ত বেঁধে দেওয়া হত। একটি প্রথম শ্রেণীর ঘোড়ার বিক্রয় মূল্য ছিল ১২০ টঙ্কা, একটি দুগ্ধবতী গাভী ৪ টঙ্কা, একটি দুগ্ধবতী মহিষ ৬ টঙ্কা ইত্যাদি। আলাউদ্দীন খলজী উপলব্ধি করে ছিলেন যে, সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করা না হলে মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ফলপ্রসূ হবে না। তিনি আরও উপলব্ধি করেন যে তাঁর পরিকল্পনা সফল করতে হলে যথাসময়ে পণ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করা নিতান্তই অপরিহার্য। চাহিদা অনুযায়ী বাজারে খাদ্য শস্যের যথাযোগ্য সরবরাহ ব্যবস্থার জন্য বিভিন্ন স্থানে রাজকীয় শস্যাগার স্থাপন করা হয় এবং সেখানে প্রয়োজনীয় শস্য জমা করা হয়। সুলতান আদেশ জারি করেন যে, দিল্লীর আশেপাশের গ্রাম সমূহে খালসা বা সরকারী ভূমির রাজস্ব নগদ অর্থে আদায় না করে পণ্য ও শস্যের আকারে আদায় করতে হবে এবং তা দিল্লীর রাজকীয় শস্যাগারে জমা দিতে হবে। তিনি আরও আদেশ দেন যে, কেউ দশ মণের অধিক শস্য জমা রাখতে পারবে না; কারো

নিকট নির্ধারিত পরিমাণের অধিক শস্য মজুত থাকলে তা নির্ধারিত মূল্যে বিক্রয় করতে হবে। তিনি উৎপাদনকারী বা চাষীদের নিকট হতে নিয়মিত শস্য সরবরাহের ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য স্থানীয় কর্মচারীগণকে আদেশ দেন। ব্যবসায়ী চাষী বা বিক্রেতা গণকে শস্য মজুদ করতে অথবা উচ্চমূল্যে বিক্রয় করতে অনুমতি দেওয়া হত না। সকল ব্যবসায়ী ও বণিককে রাষ্ট্রের একটি বিশেষ দফ্‌তরে তাদের নাম তালিকা ভুক্ত করতে হত এবং তারা বাদাউন তোরণের অভ্যন্তরে অবস্থিত 'ফরাই আদল' নামে অভিহিত বাজারে সকল প্রকার পণ্য বিক্রয়ের জন্য আণয়ন করত। সরকারী অনুমতি ব্যতীত কোন বণিক বা ব্যবসায়ী কোন জিনিস বিক্রয় করতে পারত না। দ্রব্য পরিমাণে কম দিলে বিক্রেতার শরীর হতে সমপরিমাণ মাংস ছেদন করা হত। সুলতান কেবল বিভিন্ন দ্রব্যের মূল্য ও সরবরাহই নিয়ন্ত্রণ করেন নি। পণ্যের পরিবহন ও নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন। যে সকল ব্যবসায়ী এক স্থান হতে অন্য স্থানে পণ্য পরিবহন করত তাদের নাম তালিকা ভুক্ত করা হত এবং পণ্য পরিবহনের সর্ববিধ ব্যবস্থা তাদেরকে দেওয়া হত। অনাবৃষ্টি অথবা দুর্ভিক্ষের সময় সুলতান পণ্যের সুনির্দিষ্ট বরাদ্দ নির্ধারণ করতেন। এইরূপ জরুরী অবস্থায় জনসাধারণের নিকট কেবল একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ শস্য বিক্রয় করা যেত। পক্ষান্তরে, তালিকাভুক্ত ব্যবসায়ীগণকে সরকারী শস্যাগার হতে শস্য সরবরাহ করা হত এবং তাদেরকে ব্যক্তি বিশেষের নিকট অর্ধমণের বেশী শস্য বিক্রয় করার অনুমতি দেওয়া হত না। শস্যের বরাদ্দ নির্ধারণ পদ্ধতি আলাউদ্দীন খলজীর একটি অভিনব ধারণা। সফল শাসক হিসাবে এটি তাঁর প্রতিভার সাক্ষর বহন করে। আলাউদ্দীন খলজী অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে মূল্য নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি সংগঠনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। বাজারের জন্য শাহানা-ই-মণ্ডি ও দিওয়ান-ই-রিয়াসত নামক দুজন কর্মচারী নিযুক্ত করা হয়। শাহানা-ই-মণ্ডি ছিলেন শস্যের বাজারের তত্ত্বাবধায়ক এবং দিওয়ান-ই-রিয়াসত বস্ত্র ও সাধারণ বাজারের দেখাশুনো করতেন। মালিক কাফুর শাহানা-ই-মণ্ডি হিসাবে কাজ করতেন এবং তাঁর কর্তব্য

সম্পাদনে সহায়তার জন্য বহু অধস্তন কর্মচারী ছিল। দোকানীরা যাতে নিয়মিত শস্য বাজারে আনয়ন করে। নির্দিষ্ট দরে বিক্রয় করে এবং কোনরূপ চোরাকারবার না হয়, তার প্রতি নজর রাখা ছিল তার কর্তব্য। ইয়াকুব 'দিওয়ান-ই-রিয়াসত' হিসাবে কার্য করতেন ও একটি দফ্‌তর চালাতেন। তিনি ব্যবসায়ীদের নাম সম্বলিত একটি তালিকাও রাখতেন। পণ্য হিসাবে যে পরিমাণ শস্য বাজারে আনা হত, তাও তালিকায় লেখা হত। এই সকল কর্মচারী ব্যতীত বাজারের অবস্থা জানাবার জন্য সুলতান গোয়েন্দাও নিযুক্ত করেছিলেন।

আলাউদ্দীন খলজী : সমীক্ষা—৬

(১) তুর্কী—আফগান সুলতানের মধ্যে বিখ্যাত বিজেতা, সুদক্ষ সেনাপতি, সুযোগ্য শাসক ও ভারতবর্ষে মুসলিম প্রভুত্বের স্বপ্ন দ্রষ্টা হিসাবে আলাউদ্দীনের নাম সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। কৃতিত্ব ও খ্যাতির দিক হতে বিচার করলে দেখা যায়, তিনি তাঁর পূর্ববর্তী এবং অনেক ক্ষেত্রে পরবর্তী সুলতানগণকেও অতিক্রম করে গিয়েছেন। তিনিই সর্বপ্রথম দাক্ষিণাত্যের হিন্দু রাজ্য বিজয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন এবং একমাত্র তিনিই মোঙ্গলদের উপর্যপুরি আক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করে তাদের ক্ষমতাকে দমন ও বিধ্বস্ত করেছিলেন। অনেক ক্ষেত্রে তিনি শেরশাহ ও আকবরের অগ্রদূত হিসাবে কাজ করেছিলেন। তাঁদের ন্যায় তিনিও একজন বিজয়ী ও রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। সাম্রাজ্যবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সুশৃংখল শাসন নীতির ওপর তিনি ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। নিজে খাঁটি মুসলমান হলেও তিনি তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীকে ধর্মীয় গোঁড়ামীর দ্বারা আচ্ছন্ন হতে দিতেন না। ভারতের মধ্যযুগের ইতিহাসে তাঁর রাজত্বকাল বিশেষ গৌরবান্বিত হয়ে রয়েছে। সর্বদিকে মুসলিম প্রভুত্ব বিস্তার সুদৃঢ় নীতি পরিকল্পনার ভিত্তিতে সামরিক ও বেসামরিক শাসন প্রতিষ্ঠা মোঙ্গলদের ধ্বংস সাধন, কেন্দ্রীয় সরকার পুনর্গঠন ও ধর্মীয় গোঁড়ামীর শৃংখল হতে মুক্তি তাঁর রাজত্বকালকে স্মরণীয় করে রেখেছে।

আলাউদ্দীন খলজীর রাজত্বকাল দিল্লীর সাম্রাজ্যের ইতিহাসে অনেকগুলি গৌরবময় অসমসাহসিক বিজয়ের দ্বারা সমৃদ্ধ হয়ে রয়েছে। মোঙ্গল আক্রমণ কারীদের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত থেকেও তিনি কেবল রণথম্ভোর ও চিতরের শাসনকর্তার ন্যায় হিন্দু রাজাদের আয়ত্তে আনেননি— গুজরাট, দেবগিরি, দ্বারসমুদ্র, মাদুরা ও করমণ্ডল উপকূলও তিনি স্বীয় অধিকারে এনেছিলেন। তাঁর বীরত্ব পূর্ণ কার্যের মধ্যে দাক্ষিণাত্য বিজয় সর্বাপেক্ষা গৌরবময় বলে অভিহিত হয়। স্বীয় শক্তি ও দক্ষতার দ্বারা তিনি সিন্ধু তীর হতে করমণ্ডল উপকূল পর্যন্ত প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষ মুসলিম শাসনের অধীনে নিয়ে এসেছিলেন। এই সমস্ত অসমসাহসিক কার্যের জন্য মধ্য যুগের একজন সুলতানই সম্মান লাভের যোগ্য এবং আলাউদ্দীন খলজী একজন শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা ও বিজেতা হিসাবে সেই সম্মানের অধিকারী।

(২) আলাউদ্দীন শুধু একজন যোদ্ধাই ছিলেন না। তুর্কী মালিকদের ঔদ্ধত্য চূর্ণ করে তিনি রাজ কর্তৃত্ব দৃঢ়ীকরণের দিকেও মনোনিবেশ করেছিলেন। তুর্কী মালিকগণ দিল্লীর সুলতানের নিকট ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি রাজস্ব আদায়কারী খুত, মুকাদ্দাম ও চৌধুরীদের অত্যাচার হতে প্রজাদের রক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। তারা সুলতান এবং প্রজাদের মধ্যে দালালের কাজ এবং শেষোক্ত শ্রেণীকে সম্ভাব্য সকল প্রকারে শোষণ করত। ধনিক শ্রেণীর নির্মমতা হতে প্রজা সাধারণকে রক্ষা করবার নিমিত্ত তিনি তাঁর প্রসিদ্ধ অনুশাসন নীতি ঘোষণা করে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ও অন্যায় ভাবে অর্থ লাভের পথ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। সুষ্ঠু উপায়ে সেনাবাহিনী সংগঠন করবার জন্য তিনি নগদ বেতন দানের রীতি প্রবর্তন করেন এবং সৈন্যদের জায়গীর দান প্রথার বিলোপ সাধন করেন। মুসলমান শাসক হিসাবে তিনিই প্রথম ভূমি জরিপ ব্যবস্থায় প্রবর্তন করেন। রাষ্ট্রীয় কার্যের জন্য অশ্বকে চিহ্নিত করবার প্রথা প্রবর্তন করে তিনি সেনাবাহিনীর দুর্নীতি দমন করেছিলেন। শাসনক্ষেত্রে এই সমস্ত কৃতিত্বের জন্য আলাউদ্দীন খলজী যথেষ্ট প্রশংসার দাবী করতে পারেন

যে ব্যক্তি বিদেশী আক্রমণের তীব্রতার মধ্যে থেকেও দূর দাক্ষিণাত্যে নিজের সাম্রাজ্য বিস্তারের কথা চিন্তা করতে পারেন এবং শাসন পদ্ধতি ঢেলে সাজাতে পারেন, তিনি যে একজন শ্রেষ্ঠ শাসক, তা অস্বীকার করা যায় না।

(৩) নিজে অশিক্ষিত হলেও সুলতান শিক্ষা ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বিখ্যাত সাহিত্য কীর্তির জন্য তাঁর রাজত্বকাল প্রসিদ্ধ ছিল। তিনি অনেকগুলি মনোরম প্রাসাদ ও মসজিদ নির্মাণ করেন। 'আলাই দরওয়াজা' ও নিজামউদ্দীন আওলিয়ার দরগাহের মসজিদ স্থাপত্য শিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। তিনি দিল্লীর উপকণ্ঠে সিরী নামক নগর এবং সেখানে মসজিদ, মাদ্রাসা ও সরাইখানা নির্মাণ করেন। প্রসিদ্ধ কবি আমীর খসরু ও আমীর হাসান তাঁর দরবার অলংকৃত করেছিলেন। শেখ নিজামউদ্দীন আওলিয়া ও শেখ রুকুনউদ্দীন তাঁর সময়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন। সুলতান তাঁদের অত্যন্ত ভক্তি করতেন। সাহসী ও সমর্থ, কুশলী ও সুচতুর, অর্থনীতিবিদ ও চিন্তাবিদ হিসাবে আলাউদ্দীন তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ সুলতান ছিলেন। তিনি যে নিজেকে 'দ্বিতীয় আলেকজেণ্ডার' বলতেন, তাঁর বিজয় কার্য স্মরণ করলে তা অস্বীকার করা যায় না।

(৪) শাসক হিসাবে আলাউদ্দীন নিষ্ঠুর ও অনমনীয় ছিলেন। এতদ্ সত্ত্বেও রাজ্যের মঙ্গল সাধনই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ছিল। এই জন্য কোন ধর্মীয় বিবেচনা, ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের প্রতি শ্রদ্ধা অথবা পিতৃসুলভ মমতা তাঁকে বিচলিত করতে পারেনি। অনেক দুঃখজনক অবস্থার সঙ্গে সুলতানের পরিচয় ছিল বলে তিনি উহার পুনরাবৃত্তি দেখতে চাননি। রাজ্যের কল্যাণের প্রয়োজনে তাঁকে কঠোর ও নির্মম হতে হয়েছিল। তাঁর সুদৃঢ় শাসনের ফলে প্রজাগণ পূর্ণ সুখ ও শান্তিতে বসবাস করত। তাঁর রাজত্বকাল পর্যালোচনা করলে এই কথা সহজে বলা যায় যে, নানা গুণের অধিকারী আলাউদ্দীন খলজী দিল্লীর সাম্রাজ্যকে সুদৃঢ় করিয়াছিলেন ও ভারতের ইতিহাসে তিনি অন্যতম শ্রেষ্ঠ নরপতি ছিলেন।

গিয়াসউদ্দীন তুঘলক : সমীক্ষা—৭

একজন আদর্শনিষ্ঠ ও উদার শাসক হিসাবে সুলতান গিয়াসউদ্দীন তুঘলক প্রসিদ্ধ ছিলেন। ন্যায় বিচার ও নিয়মতান্ত্রিকতার ওপর তাঁর শাসন ব্যবস্থা গড়ে ওঠেছিল। শাসন দণ্ড গ্রহণ করবার পর তিনি ধনাগার শূন্য দেখতে পেলেন। তিনি একটি অনুসন্ধান বিভাগ সৃষ্টি করলেন। খসরু খান তাঁর প্রিয়জন ও সমর্থকদের মধ্যে যে সমস্ত অর্থ অন্যায়ভাবে বিতরণ করেছিলেন, সুলতান সেই অর্থ উদ্ধার করেছিলেন। দুর্নীতি অর্থ আত্মসাৎ বন্ধ করবার জন্য তিনি তাঁর কর্মচারীদের ভাল বেতন দিতেন এবং যাঁরা রাজানুগত্য ও রাজানুরক্তির পরিচয় দিতেন, তাঁদের উচ্চপদে উন্নীত করা হত। তিনি একজন খেয়ালী ও স্বেচ্ছাচারী শাসক ছিলেন না বরং একজন জ্ঞানী ও চিন্তাশীল শাসক হিসাবে রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে তিনি সভাসদদের সঙ্গে সর্বদা পরামর্শ করতেন।

(২) গিয়াসউদ্দীন তুঘলক পতিত জমিতে শস্য উৎপাদনের জন্য প্রজাদেরকে উৎসাহিত করতেন। ফলে বহু ধ্বংসপ্রাপ্ত গ্রাম পুনরায় ধনে জনে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। কৃষির উন্নতির প্রতি তাঁর লক্ষ্য ছিল অত্যন্ত বেশী। জমিতে জলসেচের জন্য অনেকগুলি খাল খনন করা হয়েছিল। তাঁর সময়ে অনেক বাগান তৈরী হয় এবং দস্যুদের হাত হতে কৃষকদের রক্ষা করবার জন্য দিল্লীর সঙ্গে সংযুক্ত করে কয়েকটি রাজপথ ও সেতু নির্মাণ করা হয়। তিনি উৎপন্ন দ্রব্যের এক-দশমাংশ রাজস্ব নির্ধারণ করে কর ভার অনেক পরিমাণে লাঘব করেছিলেন। যে সমস্ত কর্মচারী প্রজাদের নিকট হতে রাজস্ব আদায় করবার সময় ঘুষ গ্রহণ করত, তিনি তাদের কঠোর শাস্তিদানের ব্যবস্থা করেছিলেন। দুর্ভিক্ষের সময় তিনি রাজস্ব বহুল পরিমাণে মকুব করে দিতেন এবং খাজনা পরিশোধ অক্ষম ব্যক্তিদের প্রতি উদারতা প্রদর্শন করতেন। প্রজাদের প্রতি উদারতা এবং শাসনকার্যে বিচক্ষণতা রাজনৈতিক সচেনতার জন্য ভারতীয় উপমহাদেশে গিয়াসউদ্দীন তুঘলক একজন শ্রেষ্ঠ শাসক হিসাবে স্বীকৃতি পেতে পারেন।

(৩) রাষ্ট্রের সকল বিভাগের প্রতি সুলতানের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। তিনি সংবাদ আদান প্রদানের ব্যবস্থা করেন এবং নির্দিষ্ট স্থানে দূরত্ব নির্দেশক স্মারক চিহ্ন স্থাপন করেন। গিয়াসউদ্দীন ঘোড়ার ডাক-এর ব্যবস্থা করেন। প্রতি চার ক্রোশ অন্তর এক একটি অশ্ব ডাক বহনের জন্য প্রস্তুত থাকত। এই সকল অশ্বারোহী ডাকবাহকদেরকে 'উলাক' বলা হত। জনগণের জন্য তিনি সুশৃংখল একটি দরিদ্র ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তিনি বিচার বিভাগের সংস্কার সাধন করেন। উত্তর পশ্চিম সীমান্তে মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য তিনি দিল্লীর নিকটে তুঘলকাবাদ নামে একটি শক্তিশালী দুর্গ নির্মাণ করেন।

(৪) গিয়াসউদ্দীন সুদক্ষ সেনাপতি ও মহানুভব শাসক ছিলেন। প্রজাদের মঙ্গলের জন্য তিনি সর্বদা চিন্তিত থাকতেন। সাহিত্য সেবীরা এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিল। অল্প কয়েক বছরের মধ্যে সুবিচারক, উচ্চমনা ও তেজস্বী শাসক হিসাবে তিনি সুনাম অর্জন করেন। শাসননীতির দিক দিয়ে বিচার করলে তাঁকে পরবর্তীকালের শেরশাহ শূরের দ্বিতীয় সংস্করণ বলা যায়।

মোহাম্মদ বিন তুঘলকের শাসন পদ্ধতি

মোহাম্মদ বিন তুঘলক অভিজ্ঞ ও অসাধারণ প্রতিভাবান ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর পিতার শাসন কালে বরঙ্গল অভিযানে নিযুক্ত থাকবার সময় তিনি দাক্ষিণাত্য সমস্যার গুরুত্ব সম্পূর্ণ রূপে উপলব্ধি করেছিলেন। সাম্রাজ্যের সকল অঞ্চলের মধ্যে দাক্ষিণাত্য ছিল সর্বাপেক্ষা দুর্বল ও বিপজ্জনক। সুতরাং সিংহাসনে আরোহন করবার পর দাক্ষিণাত্যের সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি এক নূতন উপায় উদ্ভাবন করলেন। এই স্থানটি সমস্যা সঙ্কুল বলে তিনি নিজের তত্ত্বাবধানে 'দৌলতাবাদ' (কুওত -উল-ইসলাম ও বলা হয়) নাম দিয়ে দেবগিরিতে একটি দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন করতে চাইলেন। কারণ দেবগিরি দিল্লী অপেক্ষা সাম্রাজ্যের অধিকতর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত এবং দাক্ষিণাত্যের কার্যাবলী লক্ষ্য করবার পক্ষে অধিকতর নিকটবর্তী ছিল। দ্বিতীয়ত,

এই সময় সাম্রাজের সীমা প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষে বিস্তৃত হয়। সুদূর দিল্লীতে তার স্থান করে এত বড় সাম্রাজ্য শাসন করা একরূপ অসম্ভব ছিল। এইজন্য তিনি রাজ্যের মধ্যস্থলে একটি নূতন শাসনকেন্দ্র স্থাপন করতে ইচ্ছা করলেন। ইবনে বতুতা বলেন যে, দিল্লীর লোকদেরকে শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যেই সুলতান দাক্ষিণাত্যে তাঁর রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। কারণ তারা সুলতানের কার্য প্রণালীর সমালোচনা করে তিরস্কারপূর্ণ ও নিন্দনীয় পত্র লিখেছিলেন। কিন্তু এই কাহিনী মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। তৃতীয়তঃ, ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত বহুদিন যাবৎ মোঙ্গল আক্রমণে বিধ্বস্ত হয়েছিল এবং মোঙ্গল আক্রমণকারীদের লক্ষ্য ছিল রাজধানী দিল্লী। সুতরাং দিল্লী হতে ৭০০ মাইল দূরবর্তী দেবগিরি বা দৌলতাবাদে রাজধানী স্থাপন তিনি নিরাপদ মনে করলেন। চতুর্থতঃ দাক্ষিণাত্য ছিল হিন্দু অধ্যুষিত এলাকা। তিনি দাক্ষিণাত্যে ইসলামী সংস্কৃতির প্রবর্তন করে হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে সম্পর্কের উন্নতি বিধান করতে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। এই সম্পর্কে ডঃ আগা মাহদী হোসেন বলেন যে, মোহাম্মদ বিন তুঘলক দেবগিরিকে ইসলামী সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি উলেমা ও সুফী সাধকদের সেখানে যাবার জন্য বলেছিলেন। রাজধানী স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সুলতান দেবগিরিতে নূতন নগর ও প্রাসাদ নির্মাণ করালেন। দিল্লী হতে দেবগিরি বা দৌলতাবাদ পর্যন্ত ৭০০ মাইল দীর্ঘ সড়ক নির্মিত হল। তিনি পথিকদের সুবিধার জন্য রাজপথের পার্শ্বে বৃক্ষরোপণ ও কূপ খনন করালেন এবং বিনামূল্যে খাদ্য ও পানীয় সরবরাহের জন্য সরাইখানা স্থাপিত হল। এই সকল ব্যবস্থা করে ১৩২৭-২৮ খ্রীষ্টাব্দে সুলতান মোহাম্মদ বিন তুঘলক তাঁর নূতন পরিকল্পনাকে কার্যকর করবার জন্য সুফী সাধক সহ উচ্চশ্রেণীর ব্যক্তি বর্গ, প্রভাবশালী অভিজাত ও সভাসদদের নূতন রাজধানীতে যাবার আদেশ দিলেন। তিনি নিজেও দৌলতাবাদে গমন করলেন। দিল্লী হতে দৌলতাবাদ গমণের সুব্যবস্থা থাকলেও ৭০০ মাইল পথ অতিক্রম করতে যাত্রীদের বেশ কষ্ট হয়েছিল। পুরাতন স্মৃতি বিজড়িত

পিতৃ ভূমি পরিত্যাগ করতে গিয়ে সুলতানের প্রতি তাঁদের কিছুটা বিরাগ ভাব প্রকাশ পেয়েছিল। এতে বিরুদ্ধবাদীরা অভিযোগ করে থাকেন যে, সুলতান দিল্লীকে জনমানবহীন করে ফেলেছিলেন।

মোহাম্মদ বিন তুঘলক: সমীক্ষা—৮

(১) মোহাম্মদ বিন তুঘলক ছিলেন অসামান্য পণ্ডিত ব্যক্তি, অত্যন্ত মহৎ প্রাণ, ধর্মীয় ব্যাপারে সহিষ্ণু, সাহসী যোদ্ধা, কঠোর অথচ নিরপেক্ষ বিচারক, উদ্ভাবনী শক্তি সম্পন্ন ও বিচক্ষণ রাজনীতিক। এতদ্ সত্ত্বেও শাসক হিসাবে অকৃতকার্য হয়েছিলেন। ডক্টর ঈশ্বরী-প্রসাদের মতে, 'মুসলিম বিজয়ের সময় হতে যে সকল সুলতান দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেছেন, তাঁদের মধ্যে তিনি সর্বাধিক বিদ্বান ও গুণসম্পন্ন ব্যক্তি। সুলতান ছিলেন তদানীন্তন প্রাচ্য জগতে পরিচিত প্রায় সর্বপ্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ। তিনি তর্ক শাস্ত্র, জ্যোতির্বিজ্ঞান, দর্শন, গণিত ও শারীর বিজ্ঞানে সুপণ্ডিত ছিলেন। লিপি বিদ্যায় তাঁর পারদর্শিতা অসাধারণ যোগ্যতা সম্পন্ন লিপিকার গণকেও অতিক্রম করে গিয়েছিল। তাঁর লিপির শ্রেষ্ঠত্ব, রচনার সাবলীলতা, অনন্যসাধারণ রচনা রীতি ও পরিমার্জিত কল্পনা শক্তি তাঁকে সেকালের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণের সমমর্যাদায় উন্নীত করেছিল। আগা মাহদী হোসেন বলেন, "কোন রচনাবিদ তাঁর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে সাহস করতেন না।" তিনি কোরআন শরীফ ও ফারসী গ্রন্থ মুখস্থ করেছিলেন। তিনি চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন এবং প্রায়ই তিনি রোগীদের জন্য ব্যবস্থা পত্র লিখতেন। তিনি গ্রীক দর্শনের একজন মনোযোগী শিক্ষার্থী ছিলেন এবং তাঁর দরবারে বহু বিশিষ্ট দার্শনিককে সাদরে গ্রহণ করতেন। সর্বোপরি, তিনি ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ বক্তা। কোন লোক তাঁর বক্তৃতা শ্রবণে কখনও ক্লান্তিবোধ করত না। বারাণীর উক্তি অনুযায়ী সুলতান ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ কবি, অতিশয় বাক পটু এবং বিপুল জ্ঞানের অধিকারী পণ্ডিত ব্যক্তি। তিনি ছিলেন সৃষ্টির এক অবিসংবাদিত বিস্ময়। তাঁর কর্মদক্ষতা ও বিজ্ঞতা এ্যারিস্টটল ও আসফের ন্যায় বিজ্ঞ জনকেও বিস্ময়াভিভূত করতে পারত।

(২) মোহাম্মদ বিন তুঘলক ছিলেন অত্যন্ত উদার ও বিনয়ী। মহত্বের বিচারে তিনি তাঁর সমসাময়িক শাসকবর্গকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। প্রত্যেকদিন রাজপ্রাসাদের দ্বারে বহু লোক তাঁর দান গ্রহণের আশায় ভীড় করত এবং তিনি মুক্ত হস্তে তাদেরকে অর্থ দান করতেন। সুলতানের ব্যক্তিগত জীবন উচ্চমানের নীতিবোধে সমৃদ্ধ ছিল। তিনি তাঁর আমলের প্রচলিত দুর্নীতি হতে মুক্ত ছিলেন। ইবনে বতুতা তাঁকে 'সর্বাধিক বিনয়ী সত্য ন্যায়ের অনুসারী বলে আখ্যায়িত করেছেন। আলাউদ্দীন খলজীর ন্যায় তিনি শাসনকার্যের ব্যাপারে উলেমাদের নির্দেশে পরিচালিত হতে চাইতেন না এবং তিনি নিজস্ব স্বাধীন বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ করতেন। এই কারণে কোন কোন ঐতিহাসিক তাঁকে ধর্ম বিমুখ বলে দোষারোপ করেছেন। কিন্তু তিনি ছিলেন প্রকৃত মুসলমান। ইবনে বতুতার মতে, "তিনি আন্তরিকতা সহকারে ধর্মীয় নীতি অনুসরণ করেন। তিনি নিজে উপাসনা সম্পন্ন করতেন এবং উহাতে অবহেলাকারীদেরকে শাস্তি দিতেন।" সমসাময়িক ঐতিহাসিক শিহাবউদ্দীন আহমদ ও বদর-ই-চাচ তাঁর উক্তির সমর্থক ছিলেন। ইসলামের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ থাকা সত্ত্বেও তিনি অন্যান্য ধর্মমত সম্পর্কে অসহিষ্ণু ছিলেন না। ইবনে বতুতার উক্তি অনুসারে তাঁর আমলে রাষ্ট্রের বহু হিন্দু উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি যেমন ছিলেন বিনয়ী, তেমনি ছিলেন অত্যন্ত উদ্ধত প্রকৃতি বিশিষ্ট। তিনি ছিলেন অত্যন্ত উদার এবং কখনও তিনি ছিলেন অতি নিষ্ঠুর ও দুর্দমনীয়। অনেক সময় সুলতান ফরিয়াদী হিসাবে সাধারণ নাগরিকের মত বিচার আদালতে হাজির হতেন। সাধারণতঃ তিনি কঠোর শাস্তির বিধান দিতেন। তিনি ছিলেন সুচতুর, বুদ্ধিমান ও বিদ্বান। কিন্তু তাঁর সাধারণ বাস্তব জ্ঞানের অভাব ছিল। তিনি অত্যন্ত ধর্ম প্রাণ ছিলেন এবং ইসলামের বিধানানুযায়ী কাজ করতেন। কিন্তু একই সময়ে কিছু সংখ্যক রক্ষণশীল শরীয়তপন্থী উলেমাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদানের দরুণ তাঁকে ধর্ম বিমুখ বলে গণ্য করা হত।

(৩) মোহাম্মদ বিন তুঘলক অত্যন্ত উচ্চাকাঙ্খী সুলতান ছিলেন। তিনি গোটা দুনিয়া জয় করতে চাইতেন। তাঁর শাসনামলের গোড়ার দিকে তিনি কয়েকটি বিজয়ের গৌরব অর্জন করেন। তিনি সেবার বরঙ্গল ও দ্বার সমুদ্র তাঁর অধিকারে আণয়ন করেন এবং তাঁর সাম্রাজ্য এতদূর প্রসার লাভ করে যে, এ ২৩টি প্রদেশ নিয়ে গঠিত ছিল। কিন্তু তাঁর শাসনামলের শেষ ভাগে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে বিদ্রোহ দেখা দেয়। ফলে দক্ষিণ পূর্ব ও পশ্চিমের বহু দূরবর্তী প্রদেশে স্বাধীনতা লাভ করেও দিল্লী সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ে। মোহাম্মদ বিন তুঘলক একজন শ্রেষ্ঠ শাসনকার্য পরিচালক ছিলেন ; কিন্তু তিনি সফল শাসক ছিলেন না। আকবরের ন্যায় তিনি হিন্দুদের প্রতি সহিষ্ণুতার নীতি অনুসরণ করতেন। তাঁর অধীনে রাষ্ট্রে বহু সংখ্যক হিন্দু উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হয়েছিল। তিনি হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত সতীদাহ প্রথা দূর করতে চেষ্টা করেছিলেন।

(৪) মোহাম্মদ বিন তুঘলক চাষীদের কল্যাণার্থে অনেক কিছু করেছিলেন। তিনি দিওয়ান-ই-কোহী নামে স্বতন্ত্র কৃষি বিভাগের প্রতিষ্ঠা করেন এবং আমীরে কোহী নামক বিশেষ কর্মচারীর ওপর এর ভার অর্পণ করেন। এই বিভাগের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল অনাবাদী জমি চাষের অধীনে আণয়ন, চাষীদেরকে ডাকাতি ঋণদান ও দুর্ভিক্ষের সময়ে দরিদ্রের জন্য সাহায্যের ব্যবস্থা করা। তিনি রাজস্ব ব্যবস্থার সংস্কার সাধনেরও চেষ্টা করেন। তিনি রাজস্ব সংগ্রহও ব্যয়ের নিয়মিত হিসাব রাখার আদেশ জারি করেছিলেন।

(৫) মোহাম্মদ বিন তুঘলক ছিলেন নিরপেক্ষ বিচারক। ইবনে বতুতার উক্তি অনুসারে সকল মানুষের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বাধিক বিচার প্রিয়। বিচারের ক্ষেত্রে তিনি কাজীগণকেও অব্যাহতি দিতেন না। কাজী ও আমীরদের বিচারের জন্য তিনি বিশেষ আদালত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এমন কি, জনগণকে সুলতানের বিরুদ্ধে মামলা আণয়নের সুবিধা দেওয়া হত এবং সুলতান নিজে কাজীর রায় মেনে নিতেন।

॥ তৃতীয় অধ্যায় ॥

ফিরোজ শাহের প্রশাসনিক দক্ষতা

(১) ফিরোজ শাহ দিল্লীর শ্রেষ্ঠ শাসনকর্তাদের অন্যতম ছিলেন। তিনি সুদক্ষ যোদ্ধা ছিলেন না এবং তাঁর অধিকাংশ সামরিক অভিযান ব্যর্থ হয়েছিল। কিন্তু তিনি একজন সুবিচারক উদার শাসক ছিলেন। তাঁর দীর্ঘ ৩৭ বৎসরের রাজত্বকালে শান্তি এবং সমৃদ্ধি বিরাজ করত। সিংহাসনে আরোহণ করবার পর পূর্বতন সুলতানের আমলের যুদ্ধের সময় যে ঋণ দেওয়া হয়েছিল তিনি তা মকুব করেছেন। তিনি আলাউদ্দীন খলজীর আমলের বিলুপ্ত জায়গীর প্রথার পুনঃ প্রবর্তন করেন। পূর্ববর্তী আমলে যে সকল অবৈধ কর ধার্য করা হয়েছিল তিনি তা উঠিয়ে দেন। 'ফতুহাত-ই-ফিরোজ শাহ'র মতানুসারে সুলতান তেইশ প্রকার কর বিলোপ করেন। কোরআনের নির্দেশানুযায়ী তিনি চার প্রকার কর ধার্য করেন, যথা—খারাজ, যাকাত, জিযিয়া ও খুমস। বণিকদের অনেক পীড়াদায়ক কর হতে অব্যাহতি দেওয়া হয়। তিনি নির্ধারিত পাওনার অতিরিক্ত গ্রহণ না করবার জন্য কর্মচারীদের সাবধান করে দিয়েছিলেন। এর অন্যথা করলে তাদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হত। তাঁর নূতন কর ব্যবস্থা ব্যবসা এবং কৃষির পক্ষে হিতকর হয়েছিল। সমসাময়িক ঐতিহাসিক শামস-ই-সিরাজ আফিফ বলেন, ঐ নীতি প্রবর্তনের ফলে রায়তরা ধনী এবং সন্তুষ্ট হয়। ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতির জন্য তিনি নানা প্রকার প্রান্তীয় কর রহিত করেন এবং আন্তঃপ্রাদেশিক বাণিজ্য সুগম করে দেন। তিনি নৌ চলাচলের জন্য খাল খনন করেন। যান বাহন চলাচলের জন্য নূতন পথ ও সেতু নির্মাণ করেন।

(২) সুলতান কৃষিকার্যে উৎসাহ দান করতেন এবং ১৫টি কূপ ও চারটি খাল খনন করে তিনি অধিক পরিমাণ জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করেছিলেন। পতিত জমি আবাদ করবার ব্যবস্থা করে তিনি প্রজাদের যথেষ্ট উপকার সাধন করেন। এই জমির ফসল হতে উপার্জিত রাজস্ব ধর্মীয় কার্যে এবং শিক্ষা খাতে ব্যয় করা হত। সুলতান ফিরোজ তুঘলকের গৃহীত ব্যবস্থার ফলে কৃষির প্রসার, বাণিজ্যের উন্নতি, রাজকোষের অর্থাগম এবং প্রজাসাধারণের আর্থিক উন্নতি সাধিত হয়। সমসাময়িক ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় উল্লেখ আছে যে, সেই সময়ে প্রায় কোন গ্রামেই কোন পতিত জমি ছিল না। নিত্য ব্যবহার্য জিনিস পত্রের মূল্য হ্রাস পাওয়ায় জনসাধারণের সুখ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছিল। সামশু-ই-সিরাজ আফিফ বলেন, "খাদ্যশস্য, অশ্ব ও শয্যা দ্রব্যে প্রতিটি গৃহ পরিপূর্ণ ছিল। প্রতি গৃহেই স্বর্ণ-রৌপ্যের প্রাচুর্য ছিল এবং স্ত্রী লোকদের প্রচুর অলংকার ছিল। সাধারণ লোকও সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে বাস করত।

(৩) ফিরোজ শাহ মুদ্রানীতিরও সংস্কার সাধন করেন। তিনি রৌপ্য ও তাম্র মিশ্রিত মুদ্রার প্রচলন করেন। ফিরোজ শাহই ভারতে প্রথম সিকি, আধুলি প্রভৃতি খুচরো মুদ্রার প্রচলন করেছিলেন। অত্যন্ত সুদৃঢ় নীতির ওপর ভিত্তি করে সাম্রাজ্যে বিচার কার্য পরিচালিত হত। মুফতি এবং কাজীগণ বিচার করতেন। মুফতি আইন ব্যাখ্যা করতেন এবং কাজী বিচারের রায় প্রদান করতেন। সুলতান উৎপীড়ন এবং অমানুষিক শাস্তি দান প্রথার বিলোপ সাধন করেন।

(৪) প্রজাসাধারণের মঙ্গলার্থে ফিরোজ শাহ কয়েকটি নূতন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। এদেরকে 'পিতামহী' সুলভ ব্যবস্থা বলা হয়। এদের একটির নাম 'বিবাহ দপ্তর' এবং অপরটির নাম ছিল 'চাকরি দপ্তর'। বিবাহযোগ্য কোন মুসলিম বালিকার যৌতুকের অভাবে যাতে বিবাহে অসুবিধা না ঘটে, তিনি তার ব্যবস্থা করেছিলেন। বিধবা এবং অনাথাদের আর্থিক সাহায্য দেওয়া হত। যারা কেরানী এবং শাসন-বিভাগীয় চাকরী পেতে ইচ্ছা করত কেবল তাদের জন্যই চাকরী দপ্তর

খোলা রাখা হয়। নানা জনহিতকর নির্মাণকার্য এবং কৃষিকার্যের ব্যাপক প্রসারের ফলে অনেক মজুর এবং কারিগরের কর্মসংস্থান হয়েছিল। বেকার ব্যক্তিদের খুঁজে বার করার দায়িত্ব ছিল দিল্লীর কোতোয়ালের ওপর। সুলতান নিজে তাদের অবস্থা এবং গুণাবলী পরীক্ষা করতেন এবং উপযুক্ত চাকরীতে বহাল করতেন। দরিদ্র প্রজাদের অর্থ সাহায্য দানের উদ্দেশ্যে তিনি একটি দান বিভাগ 'দেওয়ান-ই-খয়রাত' স্থাপন করেন। তিনি দিল্লীতে একটি বিরাট হাসপাতাল (দার-উস-সাফা) নির্মাণ করেছিলেন। সেখানে সুদক্ষ ডাক্তারগণ রোগীদের চিকিৎসা করতেন। গরীব রোগীদের মধ্যে রাষ্ট্রীয় খরচে ঔষধ বিতরণ করা হত।

(৫) ফিরোজ সামন্ততন্ত্র অনুযায়ী সৈন্যবাহিনী গঠন করেন। নিয়মিত সৈন্যদের জমি ও জায়গীর দেওয়া হত এবং অনিয়মিতদের রাজকোষ হতে বেতন দেওয়া হত। যাদের জায়গীর কিংবা বেতন দেওয়া হত না তাদের দেয় রাজস্ব বেতন হিসাবে ধরা হত। তিনি দয়া পরবশ হয়ে আইন প্রণয়ন করেন যে, কোন সৈন্য বৃদ্ধ অথবা অক্ষম হয়ে পড়লে তার পুত্র তার সেই কাজে নিযুক্ত হতে পারবে। তার কোন পুত্র না থাকলে, তৎস্থলে তার জামাতা না থাকলে তার ক্রীতদাস ঐ কাজে নিযুক্ত হত। তাঁর আমলে দিল্লীর সুলতানের অধীনে এক লক্ষ আশী হাজার ক্রীতদাস ছিল। রাষ্ট্রের কাজে ক্রীতদাসদের যাতে উপযুক্ত রূপে ব্যবহার করা হয়, সেই দিকে সুলতানের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল এবং একটি সুষ্ঠু নীতির ওপর তিনি ক্রীতদাসদের একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন।

(৬) ফিরোজ শাহ্ অনেকগুলি শহর এবং মসজিদ নির্মাণ করেন। দিল্লীতে নূতন রাজধানী স্থাপন করে তিনি উহার নাম রাখেন ফিরোজাবাদ। তা ছাড়া, তিনি হিসার ফিরোজ, ফাতেহাবাদ এবং জৌনপুর শহরের প্রতিষ্ঠা করেন ও অসংখ্য প্রাসাদ, মসজিদ, সরাই খানা, পুষ্করিণী, সমাধি স্তম্ভ, স্নানাগার, স্মৃতি স্তম্ভ এবং সেতু নির্মাণ করেন। নূতন শহর হিসার ফিরোজে পাণি সরবরাহ করবার

জন্য সুলতান যমুনা এবং শতদ্রু হতে দু প্রকারের খাল খনন করেন। পুরাতন স্মৃতি স্তম্ভ গুলি সংরক্ষনেও তাঁর যথেষ্ট উৎসাহ ছিল। অশোকের দুটি প্রস্তর স্তম্ভকে তিনি দিল্লীতে স্থানান্তরিত করেন। দিল্লীর উপকণ্ঠে তিনি নূতন ১,২০০টি বাগান নির্মাণ করেন এবং আলাউদ্দীন খলজীর আমলের ৩০টি পুরাতন বাগান পুনঃ সংস্কার করেন।

ফিরোজ শাহ: সমীক্ষা—৯

(১) ফিরোজ শাহ দিল্লীর শ্রেষ্ঠ সুলতানদের অন্যতম ছিলেন। তিনি আল্লাহ্ ভক্ত, ন্যায়বান এবং উদার শাসক ছিলেন। তাঁর চরিত্র সম্বন্ধে তারিখ-ই মোবারক শাহী ও তারিখ-ই ফিরোজ শাহী গ্রন্থে ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে। তিনি ছিলেন সরল ও অনাড়ম্বরপ্রিয়। তাঁর শাসনকার্য উন্নত পর্যায়ের ছিল। প্রশংসনীয় নানা জনহিতকর কার্যের দ্বারা তিনি সাম্রাজ্যে শান্তি ও সমৃদ্ধি আনয়ন করেছিলেন। অন্যায় কর এবং অমানুষিক শাস্তিদান প্রথার বিলোপ সাধন, কৃষির উন্নতি, ব্যবসায় বাণিজ্যের পৃষ্ঠপোষকতা, পিতামহী সুলভ ব্যবস্থার প্রবর্তন, প্রাসাদ নির্মাণ প্রভৃতি জনহিতকর কার্যদ্বারা একজন প্রতিভাবান এবং মহানুভব শাসক হিসাবে তিনি ভারতের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হয়ে রয়েছেন। অভাব গ্রস্থদের নিকট তিনি বন্ধুভাবাপন্ন ছিলেন। তাঁর সদয় শাসনের ফলে প্রজাগণ সুখ এবং সমৃদ্ধিতে জীবন যাপন করত। (২) ফিরোজ শাহের সামরিক প্রতিভা উল্লেখ যোগ্য ছিল না। তিনি হৃত প্রদেশগুলি পুনরুদ্ধারের কোন ব্যবস্থা করতে পারেন নি। বঙ্গদেশে তাঁর সামরিক অভিযান বিশেষ কোন কৃতিত্বের দাবী করতে পারে না। তাঁর চরিত্রে একজন নিপুণ রাজনীতিবিদের প্রয়োজনীয় গুণাবলীরও অভাব ছিল। জায়গীর প্রথার পুনঃ প্রবর্তন সৈন্যদের প্রতি অবিজ্ঞ জনোচিত উদারতা এবং ক্রীতদাস প্রথার অস্বাভাবিক উন্নতি সাম্রাজ্যের পক্ষে ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। (৩) সুদক্ষ সেনাপতি এবং রাজনীতিবিদ না হলেও ফিরোজ শাহ একজন বিদ্যোৎসাহী এবং ধার্মিক সুলতান ছিলেন। জ্ঞানী, ফকীর এবং পণ্ডিত ব্যক্তিগণ তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ

করেছেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতার ফলে জিয়াউদ্দীন বারাণী ও শামস-ই সিরাজ আফিক তাঁদের প্রসিদ্ধ পুস্তকগুলি প্রণয়ন করেন। নগর কোট বিজয়ের পর কতিপয় সংস্কৃত গ্রন্থ তাঁদের হাতে এসে পড়ে এবং তিনি ঐগুলি ফারসী ভাষায় অনুবাদ করাবার ব্যবস্থা করেন। তাঁর রাজত্ব কালে তিনি প্রজাদের শিক্ষার জন্য অনেকগুলি স্কুল ও কলেজ স্থাপন করেন। কথিত আছে যে, তিনি ৩৭ বছরের রাজত্বকালে ৫০টি শিক্ষায়তন স্থাপন করেছিলেন।

বখতিয়ার খিলজী ঃ সমীক্ষা—১০

বঙ্গে মুসলিম শাসনের ইতিহাসে বখতিয়ার খিলজীই প্রথম ব্যক্তি। তিনি শুধু রাজ্য জয় করেই ক্ষান্ত হন নি। বিজিত অঞ্চলে তাঁর শাসন সুপ্রতিষ্ঠার জন্যও যথাসাধ্য ববস্থা গ্রহণ করেন। তাঁর প্রবর্তিত শাসন ব্যবস্থায় ইসলামী রীতি নীতির প্রতিফলন ছিল। তাঁর শাসনামলে কোথাও কখনও কোন বিদ্রোহ বা অরাজকতা দেখা দেয় নি। শাসক হিসাবে তিনি ছিলেন উদার। জনসাধারণের সুখ দুঃখের প্রতি তাঁর যথেষ্ট লক্ষ্য ছিল। ইসলাম ধর্ম প্রচারে বখতিয়ার খিলজীর দান অস্বীকার করা যায় না। তাঁর শাসনামলে বহু মাদ্রাসা, মক্তব ও মসজিদ নির্মিত হয়। ইসলাম প্রচারে তিনি যে বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন সেই সম্বন্ধে ডঃ যদুনাথ সরকার বলেন, "বঙ্গে যতদিন ইসলাম থাকবে, তিনি ততদিন স্বমহিমায় উজ্জ্বল হয়ে রইবেন।" বিজিত এলাকার সংস্কার ও উন্নতি সাধনের দিকেও বখতিয়ার খিলজীর দৃষ্টি ছিল। দমদমাতে তিনি একটি সেনানিবাস নির্মাণ করেছিলেন। অতঃপর (১২১৩—১২২৭ খ্রীঃ) সুলতান গিয়াসউদ্দীন ইয়াজ লাখ নৌতিতে প্রায় চৌদ্দ বছর রাজত্ব করেন। জাজনগর, বঙ্গ, কামরূপ ও ত্রিহুতের শাসকগণ তাঁকে কর দিতেন। ১২১৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দেব কোট হতে রাজধানী গৌড় বা লাখনৌতিতে স্থানান্তরিত করেন। তাঁর শাসনকালে এই শহরে বহু মসজিদ, বিদ্যালয় ও অট্টালিকা নির্মিত হয়েছিল। গৌড়ের বাসনকোট প্রাসাদ দুর্গ সুলতান নিজেই তৈরী

করেন। বন্যা হতে শহর রক্ষা করার জন্য তিনি অনেক বাঁধ নির্মাণ করেছিলেন। তিনি প্রশস্ত রাস্তার দ্বারা দেবকোট ও লাখনৌতি (বীরভূম জেলার নগর) শহর দুটিকে গৌড়ের সঙ্গে সংযুক্ত করেছিলেন। তিনি আলেম ব্যক্তি ও সুফী দরবেশদেরকে জায়গীর ও বৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁর আমলে প্রজারা সুখে শান্তিতে বাস করত। ১২২৫ খ্রীষ্টাব্দে ইলতুৎমিশ নিজেই বঙ্গদেশে আসেন। ইয়াজ বেগতিক দেখে তার সঙ্গে সন্ধি করতঃ দিল্লীর সুলতানের আনুগত্য স্বীকার করে নিলেন। পরে ইয়াজ অবাধ্যতা প্রদর্শন করলে ইলতুৎমিশ নাসির উদ্দীন মাহমুদকে তাঁর বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। ইয়াজ ধৃত ও নিহত হন। (১২২৭ খ্রীষ্টাব্দ)।

বলবনী বংশের শাসনামলে বাংলা

বলবনী বংশ ৪৬ বছর বঙ্গদেশ রাজত্ব করে। এই সময়ে দিল্লীর ইতিহাস অতিশয় দুর্যোগ পূর্ণ ছিল। এই দুযোগ পূর্ণ সময়ে দিল্লীর সুলতান গণের পক্ষে বঙ্গদেশের প্রতি নজর দেওয়ার সুযোগ বা অবসর হয়নি। দিল্লীর সঙ্গে সংঘর্ষের ভয়ে বলবনী সুলতানগণও বঙ্গদেশে রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা করেন নি। এই সময়ে বহু মুসলিম সুফী, পীর ও ফকীর বঙ্গদেশে আগমন করেন এবং এদেশে ইসলাম ধর্ম প্রচার ও মসজিদ সংস্কৃতি বিস্তারের চেষ্টা করেন। এই সমস্ত আলেম ও সুফীদের মধ্যে কাজী রকুনউদ্দীন সমরকন্দী, শেখ জালালউদ্দীন তবরেজী ও মাওলানা শেখ শরফউদ্দীন আবু তাওয়ামার নাম সবিশেষ উল্লেখ যোগ্য। বিভিন্ন স্থানে বহু মসজিদ ও খানকা নির্মিত হয়। বাঙ্গালী হিন্দুগণ পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে মুসলিম পীর ও আউলিয়াগণকে গ্রহণ করে। ফলে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সৌহার্য পূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। মোহাম্মদ বিন তুঘলক সিংহাসনে আরোহণ করে শাসনকার্যের সুবিধার্থে বঙ্গদেশকে তিনটি অঞ্চলে (প্রদেশ) বিভক্ত করেন এবং প্রত্যেকটি অঞ্চলের জন্য একজন করে শাসনকর্তা (গভর্ণর) নিযুক্ত করেন। কাদের খানকে

বরেন্দ্র ভূমিতে (রাজধানী লাখনৌতি বা গৌড়), মোহাম্মদ তুঘলকের ভ্রাতা বাহরাম খান বা তাতার খান বা তাতার খানকে পূর্ববঙ্গে (রাজধানী) যাত গাঁও বা সপ্তগ্রাম) শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়।

ইলিয়াস শাহী বংশের শাসনকালে বাংলা

ইলিয়াস শাহী বংশের অভ্যুদয় বঙ্গদেশের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়। সিংহাসনে আরোহণ করে ইলিয়াস শাহ রাজ্য বিস্তারে মনোনিবেশ করলেন। উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী পাণ্ডুয়াতে নিজের শক্তি সুদৃঢ় করে তিনি প্রথমে ত্রিহুত এবং পরে বিহার জয় করেন। ইলিয়াস শাহ চম্পারণ ও গোরক্ষপুরও জয় করেন এবং বারাণসী পর্যন্ত রাজ্যসীমা বিস্তৃত করেন। মোহাম্মদ বিন তুঘলকের ব্যস্ততার সুযোগে তিনি বঙ্গদেশে শক্তি বৃদ্ধি করে স্বীয় নামে মুদ্রাঙ্কন করেন। ১৩৫২ খ্রীষ্টাব্দে ফখরউদ্দীনের পুত্রকে পরাজিত করে তিনি সোনার গাঁওকে স্বীয় সাম্রাজ্যভুক্ত করে নেন। এই ভাবে তিনি সমগ্র বঙ্গদেশের একজন অধিপতি হলেন। এই সময়ে মোহাম্মদ বিন তুঘলকের মৃত্যু হলে ফিরোজ তুগলক দিল্লীর সুলতান হলেন। তিনি ইলিয়াস শাহের কার্যাবলীতে ভীত হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করলেন। ফিরোজ তুঘলকের অভিযানের কথা জানতে পেরে ইলিয়াস শাহ তাঁর দুর্ভেদ্য একডালা দুর্গে আশ্রয় নিলেন। রাজধানী পাণ্ডুয়ার ভার তাঁর পুত্রের উপর ন্যস্ত হল। সুলতান ফিরোজ তুঘলক পাণ্ডুয়া অধিকার করে ইলিয়াস শাহের পুত্রকে বন্দী করলেন। অতঃপর তিনি একডালা দুর্গ অবরোধ করলেন। একডালা দুর্গটি পাণ্ডুয়ার বার ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। এর চতুর্দিকে জল দ্বারা বেষ্টিত। সুতরাং এখানে প্রবেশ করা খুবই কঠিন ও দুষ্কর। বাইশ দিন দিল্লীর সৈন্য বাহিনী এটি অবরোধ করে রইল। শত চেষ্টা করেও সুলতানের সৈন্য বাহিনী এ অধিকার করতে পারল না। কথিত আছে, একডালা দুর্গের অভ্যন্তরে মুসলিম নারীদের আর্তনাদে বিচলিত এবং মুসলিম রক্তপাতে অনিচ্ছুক ফিরোজ তুঘলক অবরোধ পরিত্যাগ করে দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করলেন।

কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে, তিনি ইলিয়াস শাহের সঙ্গে সন্ধি করেছিলেন। ইলিয়াস শাহ ও দিল্লী সম্বন্ধে খুব নিশ্চিত ছিলেন না। ১৩৫৫ ও ১৩৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ইলিয়াস শাহ প্রচুর উপঢৌকন সহ দিল্লীতে দূত প্রেরণ করলেন। সুলতান ফিরোজও বঙ্গের সুলতানকে উপহার পাঠালেন। উভয় রাজ্যের মধ্যে দূত বিনিময় হল। এই মিত্রতার ফলে ইলিয়াস শাহ স্বাধীন সুলতান হিসাবে বঙ্গদেশে রাজত্ব করতে লাগলেন। ইলিয়াস শাহের শেষ কীর্তি কামরূপ বিজয়। ১৩৫৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কামরূপের বিরুদ্ধে অভিযান করেন এবং এই বছরেই তিনি এটি অধিকার করেন। কামরূপ বিজয়ের পরেই ইলিয়াস শাহের মৃত্যু হয়। বঙ্গদেশের স্বাধীন সুলতানদের মধ্যে ইলিয়াস শাহ একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রয়েছেন। তাঁর রাজত্বকালে বঙ্গদেশে শান্তি ও সমৃদ্ধি বিরাজ করত। তিনি একজন দুঃসাহসী যোদ্ধা ও বিজেতা ছিলেন। সামসউদ্দীন ইলিয়াস শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সিকান্দার শাহ বঙ্গের মসনদ লাভ করেন (১৩৫৮ খ্রীঃ)। তিনি ও পিতার ন্যায় একজন শক্তিশালী সুলতান ছিলেন। সুলতান ফিরোজ তুঘলক পাঞ্জাব অধিকার করেছিলেন বটে, কিন্তু ইলিয়াস শাহ তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেন নি। ইলিয়াসের স্বাধীনতা লাভে দিল্লীর সুলতানের সম্মান ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। কাজেই ফিরোজ তুঘলক এই সম্মান পুনরুদ্ধারের সুযোগ খুঁজছিলেন। ইলিয়াস শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সিকান্দার শাহ সুলতান হলে সেই সুযোগ উপস্থিত হল। তিনি সিকান্দার শাহকে দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করাবার জন্য বঙ্গে অভিযান করলেন। সিকান্দার শাহ পিতার কৌশল অনুসরণ করে একডালা দুর্গে আশ্রয় নিলেন। একডালা দুর্গ অবরুদ্ধ হল। দিল্লীর সুলতান দুর্গ অধিকার করতে ব্যর্থ হলেন। অবশেষে ফিরোজ তুঘলক ও সিকান্দার শাহের মধ্যে সন্ধি হল। এই সময় হতে প্রায় দুশো বছর পর্যন্ত বঙ্গদেশ সম্পূর্ণরূপে দিল্লীর কতৃত্ব হতে মুক্ত ছিল। সিকান্দার শাহ একজন সুদক্ষ শাসনকর্তা ছিালন। তাঁর আমলে দেশে শান্তি ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পেয়েছিল। তিনি একজন শিল্পানুরাগী সুলতান ছিলেন। পাণ্ডুয়ার

আদিনা মসজিদ, পীর সিরাজউদ্দীনের মসজিদ ও সমাধি, গৌড়ের কোতোয়ালী দরজা ও গঙ্গারামপুরের মোল্লা আতার মসজিদ তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মিত হয়েছিল। এই সমস্ত নির্মাণ কার্য সিকান্দার শাহের স্থাপত্যশিল্পের প্রতি অনুরাগের পরিচয় বহন করে। তাঁর আমলের বিভিন্ন ধরনের বহু সংখ্যক মুদ্রা পাওয়া গেছে। এই সকল মুদ্রা তাঁর শাসনকালের সাম্য, বিদ্যানুরাগ ছিল। তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য তিনি একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন। রাজা গণেশ বঙ্গদেশ হতে ইসলামকে বিলুপ্ত করবার জন্য মুসলমানদের ওপর অত্যাচার আরম্ভ করেন। এতে বিচলিত হয়ে নূর কুতুব-উল-আলম জৌনপুরের শারকা সুলতান ইব্রাহীম শাহকে বঙ্গ আক্রমণের জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। ইব্রাহীম শাহ গৌড় আক্রমণ করলে রাজা গণেশ সিংহাসন ত্যাগ করেন এবং পুত্র যদুকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করে বঙ্গের সিংহাসনে স্থাপন করেন (১৪১৪ খ্রীঃ)। যদু ইসলাম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করে জালালউদ্দীন মোহাম্মদ শাহ নাম গ্রহণ করেন। জালালউদ্দীন মোহাম্মদ শাহ একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান ছিলেন। তিনি দেশে ইসলাম প্রচারের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন। তিনি পাণ্ডুয়া হতে গৌড়ে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। তাঁর শাসনকালে দেশে শান্তি ও সমৃদ্ধি বিরাজ করত। সংস্কৃত কবি বৃহস্পতি রায় ও বাংলা ভাষায় রামায়ণ রচয়িতা কৃত্তিবাস ওঝা সুলতান জালালউদ্দিন শাহের পৃষ্ঠ-পোষকতা লাভ করেন। ১৪৩১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইহলীলা সংবরণ করেন।

নাসির উদ্দীন মাহমূদের সময়ে বর্তমান ২৪ পরগণা জেলা সাতগাঁওয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়। তিনি একটি সুবিস্তৃত রাজ্যের শাসনকর্তা ছিলেন। তাঁর রাজ্যসীমা ছিল পশ্চিমে ভাগলপুর, পূর্বে ফরিদপুর, উত্তরে গৌড় পাণ্ডুয়া ও দক্ষিণে ত্রিবেণী, তিনি স্থাপত্য শিল্পের একজন বড় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর আমলে বহু মসজিদ, খানিকা তোরণ, সেতু, সমাধি ও প্রাসাদ নির্মিত হয়। এই সকল স্থাপত্য শিল্প নিদর্শনগুলি তাঁর রাজত্বকালের শান্তি ও শৃংখলার পরিচায়ক। গৌড়ের দুর্গ ও প্রাসাদ. গৌড়ের সেলামী দরজা ও কোতায়ালী দরজা,

মুর্শিদাবাদের মসজিদ, বাগেরহাটের খান জাহান আলীর সমাধি (মাজার) ও দরগা শিল্পের প্রতি তাঁর অনুরাগের পরিচয় বহন করে। নাসিরউদ্দীন মাহমুদের পর তাঁর পুত্র রুকুনউদ্দীন বরবক শাহ ১৪ জন্য—৭৪ খ্রীঃ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি পিতার মত ন্যায়পরায়ণ ও বিচক্ষণ সুলতান ছিলেন। তাঁর শাসনকালে রাজ্যে শান্তি ও শৃংখলা বিরাজ করত, জনসাধারণ সুখে স্বাচ্ছন্দে জীবন যাপন করত। এই সময়ে দিল্লীর সঙ্গে কোন সংঘর্ষ হয় নি। তিনি উড়িষ্যা ও কামরূপের বিরুদ্ধে অভিযান করেছিলেন। এই অভিযানের নায়ক ছিলেন কোরাইশ বংশীয় একজন সেনাপতি, সমসাময়িক গ্রন্থে তিনি মোহম্মদ ইসমাইল নামে পরিচিত। গাজী ইসমাইল ভাগ্যান্বেষণে বঙ্গদেশে আগমন করেন। তিনি উড়িষ্যার রাজা গজপতি ও কামরূপের রাজা কামেশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। উড়িষ্যাও কামরূপ বিজিত হল। তিনি গৌড় নগরীর উত্তরে ছুটে পুটিয়ার বিস্তীর্ণ জলা ভূমিতে বাঁধ নির্মাণ করে জলস্রোত বন্ধ করার ব্যবস্থা করেন এবং এই জন্য অলৌকিক ক্ষমতাশালী পীর বলে আখ্যায়িত হন। রংপুর জেলার কাঁটা দুয়ারে ও হুগলী জেলার মান্দারণে আজ ও তাঁর দরগাহ দেখা যায়। কথিত আছে, রকুনউদ্দীন বরবক শাহের রাজত্বকালে সর্ব প্রথম বাখরগঞ্জ জেলা মুসলিম শাসনাধীনে আসে, বরবক শাহ একজন শিল্পানুরাগী সুলতান ছিলেন। তাঁর আমলে বহু মসজিদ ও তোরণ নির্মিত হয়। আমীর জয়নউদ্দীন হারবী তাঁর সভাকবি ছিলেন। তিনি বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতার ক্ষেত্রে প্রাথমিক যুগের প্রথম মুসলিম শাসক। তাঁর রাজত্বকালে বাংলা সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় মালাধর বসু শ্রীকৃষ্ণ বিজয় লিখতে শুরু করেন। সুলতান বরবক শাহ তাঁকে 'গুণরাজ খান' উপাধিতে ভূষিত করেন। মালাধর বসুর পুত্র সত্যরাজও খান উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। বরবক শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র দ্বিতীয় শামসউদ্দীন ইউসুফ শাহ (১৪৭৪-৮১খ্রীঃ) সিংহাসন আরোহণ করেন। তাঁর রাজত্ব কালের বিশেষ কোন তথ্য পাওয়া না গেলেও স্থাপত্য শিল্পের পৃষ্ঠপোষক হিসাবে তিনি ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য

স্থান অধিকার করে রয়েছেন। ইউসুফ শাহ রাজ্যে বিভিন্ন স্থানে মসজিদ নির্মাণ করেন। এদের মধ্যে গৌড়ের কদমরসুল মসজিদ দরকবাড়ী মসজিদ ও তাঁতি পাড়া মসজিদ উল্লেখ যোগ্য। ইউসুফ শাহের রাজত্ব কালের অনেক শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়েছে। তা থেকে অনুমান করা যায় যে, তিনি ১৪৮১ খ্রীষ্টাব্দে (৮৮৫ হিজরী) পর্যন্ত রাজত্ব করেন। ঐতিহাসিক ফেরেশ্‌তার বর্ণানুযায়ী শামসউদ্দীন ইউসুফ শাহ সুপণ্ডিত, ধার্মিক ও বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। ফিরাজ-উস-সালাতীনের রচয়িতার মতে, তিনি নরম স্বভাবের সুলতান ছিলেন। প্রজাদের মঙ্গলের জন্য তিনি সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। শাসনকার্য পরিচালনার ব্যাপারে তাঁর সজাগ দৃষ্টি ছিল। ক্ষমতাশীল হওয়ার পর তিনি মদ্যপান নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। তিনি বিদ্বানও জ্ঞানীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণ বিজয় লেখা সমাপ্ত হয় এবং বিজয় পণ্ডিত 'মহাভারতের বঙ্গানুবাদ করেন।

ইলিয়াস শাহী বংশ ঃ সমীক্ষা—১১

ইলিয়াস শাহী বংশ দু পর্যায়ে (১৩৪২-১৪১৪ খ্রীঃ, ১৪৪২-১৪৮৭ খ্রীঃ) মোট ১১৭ বছর রাজত্ব করেন।' তাঁদের রাজত্বকালে বঙ্গের ইতিহাসে একটি নূতন অধ্যায় যোজনা করেছে। ইলিয়াস শাহী সুলতানগণ উদার, সুদক্ষ ও বিচক্ষণ শাসক ছিলেন। প্রজাবর্গের অধিকাংশ ছিল হিন্দু কিন্তু তাদের মধ্যে কোন অসন্তোষ ছিল না। এই সময়ে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সুন্দর সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ও সমন্বয়ের সূচনা হয়। তাদের আমলে বঙ্গদেশে সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ভাষা এক নূতন রূপ পরিগ্রহ করে। রাজনৈতিক প্রয়োজনে বঙ্গের মুসলিম সুলতানগণ হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের ওপর নির্ভরশীল হয়ে ওঠেন। বঙ্গের গ্রামাঞ্চলে মোল্লা ও পীরগণ প্রবেশ করে ধর্মপ্রচার করেন। মসজিদ নির্মাণ করেন এবং আরবী ও ফারসী ভাষা শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে

মক্তব ও মাদ্রাসা স্থাপন করেন। ফলে এই দেশে মুসলিম সংস্কৃতি বিস্তার লাভ করে।

হোসেনশাহী বংশের শাসনামলে বাংলা

আলাউদ্দীন হোসেনের সিংহাসনারোহণ (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রীঃ) শান্তি ও সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে এক নবযুগের সূচনা করে। তিনি জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল প্রজার শুভেচ্ছা নিয়ে রাজত্ব করেন। আলাউদ্দীন হোসেনের বংশ পরিচয় সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। তবে অধিকাংশের ধারণা যে, তিনি আরবদের সৈয়দ বংশের লোক ছিলেন। তাঁর পিতা সৈয়দ আশ্‌রাফ-উল-হোসেন ছিলেন মক্কার শরীফ (সম্ভ্রান্ত)। তিনি ইউসুফ ও হোসেন নামে দু পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে বঙ্গে আগমন করেন এবং মুর্শিদাবাদ জেলার চাঁদ পাড়ায় এক কাজীর আশ্রয়ে বাস করেন। আশ্‌রাফ-উল-হোসেনের বংশ পরিচয় পেয়ে তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র হোসেনের সঙ্গে কাজী স্বীয় কন্যার বিবাহ দেন। হোসেন শাহ গৌড়াধিপতি মুজাফফর শাহের অধীনে চাকরী গ্রহণ করেন এবং যোগ্যতা ও কর্ম-দক্ষতার গুণে উজীর পদে উন্নীত হন। পরে তিনি তাঁর অত্যাচারী প্রভুর বিরুদ্ধে জনপ্রিয় বিদ্রোহ পরিচালনা করে বিশৃংখলা ও অরাজকতার অবসান ঘটান। আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে শান্তি ও শৃংখলা ফিরিয়ে এনে হোসেন শাহ পূর্ববর্তী শাসনামলে বঙ্গদেশের যে সমস্ত স্থান লুপ্ত হয়েছিল সেইগুলি পুনরুদ্ধারের জন্য মনোযোগী হলেন। তিনি কুচবিহারের কামরূপ বা কামতাহারে অভিযান পাঠিয়ে এটি অধিকার করলেন। কামতাপুরের রাজা বন্দী হয়ে গৌড়ে প্রেরিত হলেন। হোসেন শাহের পুত্র কামতাপুরের শাসনকর্তা নিযুক্ত হলেন। কামতাপুর বা কামরূপ বিজয়ের পর হোসেন শাহ ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় অভিযান করলেন। অহোম নরপতি পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। সমভূমি অঞ্চল মুসলিম বাহিনী কর্তৃক অধিকৃত হল। বর্ষা এলে পার্বত্য অঞ্চল হতে অহোম নরপতি বার হয়ে এলেন এবং মুসলিম সৈন্যদলকে আক্রমণ করে বিপর্যস্ত করলেন। বঙ্গের সুলতানের অযোগ্যতার সুযোগে উড়িষ্যাধিপতি

বঙ্গের অভ্যন্তরে রাজ্য সীমা বিস্তার করেন। ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গের সৈন্য বাহিনী ইসমাইল গাজীর নেতৃত্বে উড়িষ্যা আক্রমণ করে। উড়িষ্যাধিপতি প্রতাপ রুদ্র তখন উপস্থিত ছিলেন না। পরে তিনি ইসমাইল গাজীর বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান করেন এবং গড় মান্দারণে তাঁকে অবরোধ করেন। কিন্তু কর্মচারী বিদ্যাধরের বিশ্বাসঘাতকতায় প্রতাপ রুদ্র অবরোধ তুলে নিলেন। উড়িষ্যা অভিযানের ফলাফল সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। কামতাপুর ও উড়িষ্যা বিজয়ের পর হোসেন শাহ ত্রিপুরারাজ্য জয়ের চেষ্টা করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি পরপর চারটি অভিযান প্রেরণ করেন। কিন্তু মহারাজ ধন্য-মাণিক্য ও সেনাপতি চরচাগের জন্য হোসেন শাহের চেষ্টা সম্পূর্ণ সফল না হলেও ত্রিপুরা রাজ্যের কিছু অংশ তাঁর রাজ্যভুক্ত হয়। এরপর হোসেন শাহের সৈন্যবাহিনী গোমতী নদী পর্যন্ত অগ্রসর হয় এবং চট্টগ্রাম অধিকার করে। আরাকান রাজ্যও এই সময়ে বঙ্গের সীমান্ত স্পর্শ করে। আরাকান বিজয়ের জন্য সুলতানের পুত্র নসরৎখানের অধীনে সৈন্য প্রেরণ করা হয়। আরাকান বিজিত হল এবং হোসেন শাহের সেনাপতি পরাগল খান এর শাসনকর্তা নিযুক্ত হলেন। হোসেন শাহ নিঃসন্দেহে তাঁর বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং বঙ্গদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুলতান ছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে মুসলিম বঙ্গের সীমা চতুর্দিকে বিস্তার লাভ করে। পশ্চিমে সরণ ও বিহার, দক্ষিণ পশ্চিমে মান্দারণ ও ২৪পরগণা, উত্তর পশ্চিমে আসামের হাজো ও দক্ষিণ পূবে শ্রীহট্ট ও চট্টগ্রাম পর্যন্ত তাঁব রাজ্যসীমা বিস্তৃত ছিল। তিনি হাবশীদের (আবিসিনীয় ক্রীতদাস) অত্যাচার প্রতিরোধ করেন এবং সম্ভ্রান্ত বংশ হিন্দু ও মুসলমানদের সহযোগিতায় দেশে শান্তি ও শৃংখলা প্রতিষ্ঠা করেন। কোনরকম বিদ্রোহ তাঁর রাজত্বের শান্তি ও নিরাপত্তা নষ্ট করে নি। তাঁর শান্তি ও সমৃদ্ধিপূর্ণ রাজত্বকালে প্রজারা সুখে শান্তিতে বাস করত। তিনি প্রজাদের মঙ্গল সম্বন্ধে বিশেষ সজাগ ছিলেন এবং তাদের অবস্থার উন্নতির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। হোসেন শাহ তাঁর প্রজাদের নিকট এতদূর জনপ্রিয় ছিলেন যে, তারা তাকে 'নৃপতি তিলক' ও 'জগত ভূষণ' উপাধি দান করেছিল। হোসেন শাহ হিন্দুদের প্রতি

সহনশীল ও উদার ছিলেন। তিনি বহু যোগ্য হিন্দুকে রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত করেন। এই সমস্ত কর্মচারীদের মধ্যে রাগ, সনাস, পুরন্দর খান ও অনূপের নাম এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর রাজত্বকাল বৈষ্ণব ধর্মগুরু শ্রীচৈতন্য ভক্তি মতবাদ প্রচার করেন। গৌড় ভ্রমণকালে শ্রীচৈতন্যকে শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য তিনি তাঁর রাজকর্মচারীদের নির্দেশ দিয়েছিলেন। বাংলা সাহিত্যের উন্নতি বিধানের জন্য তাঁর রাজত্বকাল স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। বাংলা সাহিত্যের খ্যাতনামা কবি মালাধর বসু, বিজয় গুপ্ত, বিপ্রদাস ও যশোরাজ খান হোসেন শাহের উদার পৃষ্ঠ-পোষকতা লাভ করেন। তাঁর শাসনকালে বরিশালের কবি বিজয় গুপ্ত বাংলায় 'পদ্মাপুরাণ' অনুবাদ করেন। হোসেন শাহের সেনাপতি পরাগল খানের পৃষ্ঠপোষকতায় চট্টগ্রামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি পরমেশ্বর বাংলায় সর্বপ্রথম মহাভারত অনুবাদ করেন। হোসেনশাহ নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন। তিনি তাঁর রাজ্যের বিভিন্ন অংশে বহু সংখ্যক মসজিদ ও মাদ্রাসা নির্মাণ করেন। গৌড়ে তাঁর নির্মিত ছোট সোনা মসজিদ তাঁর আমলের স্থাপত্য শিল্পের সাম্য বহন করে। ১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দে হোসেন শাহ দীর্ঘকাল সগৌরবে রাজত্ব করবার পর গৌড়ে প্রাণত্যাগ করেন। আলাউদ্দীন হোসেন শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র নসরৎ শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন (১৫১৯ খ্রীঃ)। তিনি সিংহাসনে আরোহণ করে ভ্রাতাদের ভাতা ও মর্যাদা বাড়িয়ে দিলেন। নসরৎ শাহ পিতার গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন এবং রাজনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে তাঁর পুরোপুরি ধারণা ছিল। পিতার আমলে তিনি শাসন ব্যাপারে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন, তা রাজ্য শাসনে ও রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানে তাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। নসরৎ শাহের সিংহাসনা-রোহণের প্রায় দু'বছরের মধ্যে দিল্লীর লোদী সাম্রাজ্যের পতন শুরু হলে বিহারের সুলতান দরিয়াখান লোহাণী বিহারে 'লোহাণী রাষ্ট্র' স্থাপন করেন (১৫২২ খ্রীঃ) এবং জৌনপুর হতে পাটনা পর্যন্ত এক বিরাট অঞ্চলে স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করতে থাকেন। নসরৎ শাহ এই বিদ্রোহী সুলতানের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করে নিজের শক্তি বৃদ্ধি করলেন।

অতঃপর তিনি ত্রিহুত জয় করে উত্তর বিহারে স্বীয় অধিকারে আনলেন এবং তাঁর শ্যালক মকতুম-ই-আলমকে ঐ অঞ্চলের শাসনকর্তা নিযুক্ত করলেন। গণ্ডক ও গঙ্গা নদীর সঙ্গমস্থলে হাজীপুরে তিনি একটি সামরিক দুর্গ স্থাপন করে স্বীয় রাজ্যের নিরাপত্তা বিধান করেন। নসরৎ শাহ অত্যন্ত সৎ প্রকৃতির লোক ছিলেন। মুঘল সম্রাট বাবর তাঁর আত্মজীবনীতে নসরৎ শাহকে ভারতীয় শাসকদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় বলে উল্লেখ করেছেন। নসরৎ শাহ সাহিত্য, শিল্প ও স্থাপত্য বিদ্যার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সাত গাঁও, সোনার গাঁও ও মুঘল কোটে মসজিদ ছাড়াও তিনি গৌড়ের বিখ্যাত বড় সোনা ও কদম রসূল নামে দুটি মসজিদ নির্মাণ করেন। তাঁর আমলে বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা অব্যাহত ছিল। কথিত আছে, তিনি মহাভারতের বাংলা অনুবাদের আদেশ দেন। কবীন্দ্র নামে তাঁর একজন কর্মচারী বিখ্যাত কবি ছিলেন এবং তিনি তাঁর কাব্যগ্রন্থে নসরৎ শাহের কথা উল্লেখ করেছেন।

সুলতানী শাসন: সমীক্ষা—১২

(১) বঙ্গদেশে সুলতানী শাসন প্রায় সাড়ে তিনশো বছর স্থায়ী হয়েছিল। এই দীর্ঘকাল শাসনের ফলে এই দেশে ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে পরিবর্তন দেখা দেয়। যোদ্ধা ও শাসকদের পর পরই বঙ্গদেশে ধর্ম প্রচারক ও বণিকগণ আগমন করেন। এই সমস্ত আগমনকারীদের জীবনাদর্শের প্রভাব জনসাধারণের ওপর পড়ায় বহু লোক ধর্মান্তরিত হয়েছিল। সুফীগণ দরগাহ ও খানকা শরীফ স্থাপন করে ধর্ম প্রচারের কার্য চালিয়ে যেতেন। তাঁদের সরলতা ও ধর্মের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি বহু নিপীড়িত নরনারীকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। এই সকল সুফী সাধকদের মধ্যে খতুম-উল-মূলক, শেখ সরফউদ্দীন ইয়াহিয়া মনিরী, সিলেটের শাহ জালাল, শেখ আখি সিরাজউদ্দীন, শেখ আলাউল হক ও শেখ নূর কুতুব উল-আলমের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁদের প্রচেষ্টায় বঙ্গদেশে বিভিন্ন স্থানে ইসলাম ধর্ম প্রসার লাভ করে। সিলেটে শাহ্ জালালের মাজার

দর্শনের জন্য আজও বহুলোক ভিড় জমায়। সিকান্দার শাহের রাজত্বকালে শেখ আলাউল হক ও শেখ নূর কুতুব উল-আলমের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁদের প্রচেষ্টায় বঙ্গদেশে বিভিন্ন স্থানে ইসলাম ধর্ম প্রসার লাভ করে। সিকান্দার শাহের রাজত্বকালে শেখ আলাউল হক পাণ্ডুয়াতে বসবাস করতেন। কিন্তু তাঁর অত্যাধিক জনপ্রিয়তা সুলতানের ঈর্ষার উদ্রেক করে। তাই তিনি তাঁকে সোনার গাঁওয়ে নির্বাসিত করেন। সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহ হযরত নূর কুতুবের একজন বড় ভক্ত ছিলেন। তিনি প্রত্যেক বছর তাঁর মাজার পরিদর্শন করতেন। মাওলানা আতা সুলতান সিকান্দার শাহের সমসাময়িক ছিলেন। দরবেশ ও যোদ্ধা শাহ ইসমাইল গাজী সুলতান রকুনউদীন বরবক শাহের আমলে লাখনৌতিতে বসবাস করতেন। সুলতান রকুনউদ্দীন এই দরবেশকে অবাধ্যতার অভিযোগে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন। এই সমস্ত এবং আরও অসংখ্য ধর্মপ্রচারক খানকাশরীফ স্থাপন করেছিলেন এবং এই সকল খানকা শরীফে গ্রাম্য লোকেরা শান্তনা খুঁজে পাবার জন্য মাঝে মাঝে এসে জমায়েত হতেন। অধিকন্তু, বর্ণ হিন্দুদের দুর্ব্যবহার এবং মুসলমানদের সহনশীলতা ও উত্তম ব্যবহারের জন্য বহু হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।

(২) কোন কোন সময়ে সরল গ্রাম্য লোকেরা বোধশক্তির অভাবে স্থানীয় প্রভাবেই ধর্মীয় বিশ্বাসের কথা ব্যক্ত করত। এর দৃষ্টান্ত স্বরূপ সত্যপীর ও পঞ্চপীরের কথা উল্লেখ করা যায়। হিন্দু ও মুসলমান একত্রে বসবাসের ফলে তাদের মধ্যে বহু পীর ও দেবদেবীর আবির্ভাব হয়। যথা সত্যপীর, ত্রিলোকীপীর, মুসকিল আসান, ওলাবিবি ইত্যাদি। বঙ্গের হিন্দুদের জীবনধারার ওপরও ইসলাম বিস্ময়কর প্রভাব বিস্তার করেছিল। তারা তাদের ইতিহাসে এই সর্ব প্রথম একটি নূতন বিধিবদ্ধ সমাজ, ধর্ম ও সভ্যতার সম্মুখীন হল। অভিজাত শ্রেণীর হিন্দুগণ মুসলমানদের পোশাক, আচার-আচরণ ও আদব কায়দা গ্রহণ করলেন। বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ববোধের দাবিদার ইসলাম হিন্দু সমাজের ওপর একটি সংস্কার মুক্ত প্রভাব স্থাপন করল। এর ফলে হিন্দুদের মধ্যে বিভিন্ন ধর্মীয় ও সমাজ

সংস্কারের উদ্ভব হয়। এই দিক দিয়ে চৈতন্যদেবের বৈষ্ণববাদ নিঃসন্দেহে ইসলামের নিকট ঋণী। বঙ্গের মুসলিম সুলতানেরা প্রতিভা বিকাশের জন্য হিন্দুদেরকে বহু সুযোগ সুবিধা দান করেছিলেন। হোসেন শাহী বংশের সুলতানদের আমলে এই নীতি এর সর্বোচ্চ সীমায় উপনীত হয়েছিল।

(৩) কৃষি ও ব্যবসায় বাণিজ্যই ছিল লোকের প্রধান উপজীবিকা। খাদ্য দ্রব্যের তখন প্রাচুর্য ছিল। সাধারণ লোক সুখে স্বাচ্ছন্দে বাস করত। ইবনে বতুতা বঙ্গদেশের কৃষিজাত দ্রব্যের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তাঁর মতে কৃষিজাত দ্রব্য খুব সস্তায় বিক্রয় হত। বঙ্গদেশের মাটির উর্বরতা, এর কৃষিজাত ও শিল্পজাত দ্রব্যের প্রাচুর্য এবং বিপুল পরিমাণে বৈদেশিক বাণিজ্য বিদেশী বণিক ও ভ্রমণকারীদের এইরূপ বিস্ময় ও প্রশংসার উদ্রেক করেছিল যে, তাঁরা এই দেশকে উদ্যান, এমন কি ভুস্বর্গ বলেও অভিহিত করেছেন। চীনদেশের পর্যটকদের মতে, সপ্ত-স্বর্গ পৃথিবীর সমস্ত স্বর্ণ ভাণ্ডার এই রাজ্যে ছড়িয়ে দিয়েছে। ঐশ্বর্য ও জনসাধারণের সততা সম্ভবতঃ পালেমবাং এর জনসাধারণের চেয়েও অধিক এবং চাও-অ (জাভা) দ্বীপের জনসাধারণের সমতুল্য। বঙ্গদেশের বস্ত্রশিল্প অত্যন্ত উৎকর্ষতা লাভ করেছিল। চৈনিক ভ্রমণকারী ছ প্রকার বস্ত্রের উল্লেখ করেছেন। এ ছাড়া লবণ, চিনি, কাগজ ও বিভিন্ন ধরনের অলংকার বঙ্গদেশে প্রস্তুত করা হত। নদী পথে দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যবসায় বাণিজ্য চলত এবং চট্টগ্রাম, সাতগাঁও ও অন্যান্য বন্দরের মাধ্যমে বঙ্গদেশের সঙ্গে দূর প্রাচ্য, মধ্য প্রাচ্য, এমন কি ইউরোপীয় দেশ সমূহের সঙ্গে সংযোগ স্থাপিত হয়েছিল।

(৪) সুলতানী যুগের বাংলা ও ভাষা ও সাহিত্যের অপূর্ব বিকাশ সাধিত হয়েছিল। হোসেন শাহী যুগ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে এক গৌরবময় অধ্যায়। এই গৌরবময় যুগের সূচনা হয়েছিল ইলিয়াস শাহী বংশের রাজত্বে এবং পরিপূর্ণতা লাভ করেছিল হোসেন শাহী বংশের যুগে। বাংলা সাহিত্যে মুসলিম পৃষ্ঠপোষকতার ফলে বঙ্গদেশের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এক নবজাগরণ এসেছিল। এই নবজাগরণে

বঙ্গের মুসলিম হিন্দু উভয় পণ্ডিতদেরই অবদান ছিল। সাহিত্য গগনে এই সময়ে যে সকল মনীষী আবির্ভূত হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে সোনার গাঁওয়ের মাওলানা শরফউদ্দীন আবু তাওয়ামার নাম উল্লেখ করা যায়। তাঁর লেখা 'তাসাওয়াফের মকামাত, সমগ্র উপমহাদেশে খ্যাতি অর্জন করেছিল। তাঁর অন্যতম শিষ্য মাকদুম শরফউদ্দীন ইয়াহিয়া মনিরাও সুফীবাদের ওপর সাহিত্য রচনা করেন। 'অমৃতকুণ্ড' নামে যোগ-শাস্ত্রের ওপর সাহিত্য রচনায় তিনি খ্যাতি অর্জন করেন।

ঐ ব্যক্তি আলী মর্দান খলজীর রাজত্বকালে (১২১০—১৩খ্রীঃ) লাখ নৌতিতে কাজীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। আইন বিজ্ঞানের ওপর রচিত 'নামা-ই-হক' নামে ফারসী বই একজন নাম বিহীন গ্রন্থকার কর্তৃক ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বাংলা ভাষায় রচিত হয়েছিল বলে মনে করা হয়। এই যুগে বাঙালী মুসলমান ইসলাম ও মুসলিম ঐতিহ্যের ওপর বাংলা ভাষায় বই লিখতে আরম্ভ করেন। গিয়াসউদ্দীন আযম শাহের রাজত্বকালে প্রথম বাঙালী মুসলিম কবি শাহ মোহাম্মদ সগীর 'ইউসুফ জলেখা' কাব্য রচনা করেন। সুলতান নসরৎ শাহের শাসনামলে কবি আফজাল আলী বাংলা ভাষায় তাঁর 'নসিয়তনামা' রচনা করেন। এইভাবে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মুজাম্মেল নামে একজন বাঙালী কবি আরবী ফারসী উপাদানের ওপর তাঁর 'নীতিশাস্ত্র ও সাইতনামা' রচনা করেন। গাজী বিজয়ের গ্রন্থকার ফরীদউল্লাহ ও রসূল বিজয়ের গ্রন্থকার জায়নউদ্দীন পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্ধে আবির্ভূত হয়েছিলেন। বাংলা ভাষায় লাইলী মজনুর খ্যাতনামা লেখক দৌলত উজীর বাহরাম খানও ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে আবির্ভূত হয়েছিলেন। মুসলিম গ্রন্থকারগণ বাংলা লেখার জন্য প্রধানতঃ আরবী হরফ ব্যবহার করতেন এবং এর মধ্যে বহুল পরিমাণে আরবী ও ফারসী শব্দ প্রয়োগ করতেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির জন্য হিন্দু লেখকদের অবদান সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তাঁরাও রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। তাঁরা প্রথমবারের মত তাঁদের ধর্মীয় গ্রন্থাদি বাংলাতে অনুবাদ করলেন। এই ভাবে হিন্দু ও মুসলমান

ধর্মীয় ভাব প্রকাশের জন্য চিন্তার মাধ্যম হল বাংলা ভাষা। কবি কীর্তিবাস ওঝা রাজা গণেশের সভাকবি ছিলেন। তিনি বাংলা ভাষায় রামায়ণ অনুবাদ করেন। সুলতান রকুনউদ্দীন বরবক শাহের সভাকবি মালাধর বসু 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' রচনা করেছিলেন। সুলতান তাঁকে 'গুণরাজ খান' উপাধিতে ভূষিত করেন। হোসেন শাহের শাসনকালকে মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে এক নূতন স্বর্ণযুগ বলা হয়। হোসেন শাহের পৃষ্ঠ-পোষকতা বাংলা সাহিত্যে এক নূতন যুগের সূচনা করে। তাঁর সভাকবি ও সরকারী কর্মচারা যশোরাজ খান অন্য একটি 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' রচনা করেছিলেন। হোসেন শাহের রাজত্বকালে কবি বিজয়গুপ্ত ও বিপ্রদাস পিনলাই যথাক্রমে 'মনসামঙ্গল' ও 'মনসা বিজয়' নামে দুটি মহাকাব্য রচনা করেছিলেন। সুলতানের সেনাপতি ও চট্টগ্রামের শাসনকর্তা পরাগল খান কবি পরমেশ্বরের দ্বারা 'মহাভারত' অনুবাদ করেছিলেন। পরাগল খানের পুত্র ছুটি খানও শিক্ষানুরাগী ছিলেন এবং তাঁরই অনুপ্রেরণায় শ্রীকর নন্দা কর্তৃক মহাভারত বাংলায় অনূদিত হয়েছিল। আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহের আদেশে কবি দ্বিজ শ্রীকর বিদ্যাসুন্দর কাব্য রচনা করেন। এতদ্ব্যতীত, বহু সংস্কৃত গ্রন্থ এই সময়ে বাংলা ও ফারসী ভাষায় অনূদিত হয়।

(৫) বাংলার মুসলিম সুলতানগণ স্থাপত্য শিল্পের শ্রেষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ইলিয়াস শাহী যুগে আদিনা মসজিদ নির্মিত হয়েছিল এবং এটি পৃথিবীর বৃহত্তম মসজিদগুলির মধ্যে অন্যতম। হোসেনশাহী আমলে গৌড় ও পাণ্ডুয়াতে বহু মসজিদ, মাদ্রাসা, দরগাহ ও সমাধি-সৌধ নির্মিত হয়। হোসেন শাহ 'ছোট সোনা মসজিদ' এবং তাঁর পুত্র নসরত শাহ 'বড় সোনা মসজিদ' ও কদম রসূল মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। পাণ্ডুয়াতে এক লক্ষ টাকা ব্যয়ে নসরত শাহ 'এক লাখী' নামে চিতোর সমাধি সৌধ নির্মাণ করেছিলেন। এই সকল মসজিদ, দরগাহ ও সমাধি সৌধ ব্যতীত বহু মক্তব, মাদ্রাসা, খানকা ও হামাম নির্মিত হয়েছিল।

সুলতানী আমলে শাসন ব্যবস্থার রূপরেখা

(ক) কেন্দ্রীয় শাসন এই বিভাগের সর্বোচ্চ পদে ছিলেন উজীর বা প্রধানমন্ত্রী। তাঁর বিভাগকে বলা হত দিওয়ান-ই—ওয়াজিরাত। দিল্লীর সুলতানের অধীনে দিওয়ান-ই—ওয়াজিরাত ছিল সর্বাপেক্ষা সুগঠিত একটি প্রতিষ্ঠান। কেন্দ্রীয় অর্থ বিভাগ ছিল ওয়াজীরের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কার্য বিভাগ। কিন্তু অন্যান্য বিভাগের ওপর ও তাঁকে সমান দৃষ্টি রাখতে হত। ওয়াজীরের সহকারীর নাম ছিল নায়েব ওয়াজীর। নায়েব ওয়াজীর ছাড়াও তাঁর অধীনে মুশরিফ-ই-মমালিক (প্রধান হিসাব রক্ষক) এবং মুস্তাস্ফি-ই-মমালিক (প্রধান হিসাব পরিদর্শক) নামে দুজন কর্মচারী ছিলেন। এইগুলি ব্যতীত অন্যান্য বিভাগও ছিল। প্রত্যেক বিভাগের নিজস্ব সম্পাদক এবং তাঁদের সাহায্য করবার জন্য অসংখ্য কেরানী ও অধীনস্থ কর্মচারী থাকতেন। ন্যায় বিচার পরিচালনা করাকে সুলতানগণ তাঁদের প্রাথমিক কর্তব্য বলে মনে করতেন। বিচার কার্যের ভার ছিল প্রধান কাজীর ওপর এবং তাঁকে সাহায্য করবার জন্য মুফতিগণ নিযুক্ত ছিলেন। প্রত্যেক প্রধান শহরে বিচার কার্যের জন্য একজন কাজী থাকতেন। যে সমস্ত ব্যাপারে হিন্দুগণ জড়িত ছিল কেবল সেইগুলির দায়িত্ব ছিল পঞ্চায়েতের ওপর। মুহতাসিম প্রজাদের আচার ব্যবহারের প্রতি দৃষ্টি রাখতেন এবং রাজার ওজন ও রীতিনীতির পর্যবেক্ষণ করতেন। সুলতান গুপ্তচরদের মারফৎ প্রজাদের কার্যাবলীর খবরাখবর রাখতেন এবং কোতোয়াল শান্তি রক্ষা করতেন। পাপকার্যের শাস্তি ছিল অতি কঠোর। সুলতানী আমলে খারাজ, যাকাত, জিযিয়া, যুদ্ধক্ষেত্রে লুণ্ঠিত দ্রব্য, খনি, গুপ্তধন, দ্রব্য শুল্ক, উত্তরাধিকার বিহীন সম্পত্তি রাজস্বের উৎস ছিল। তবে ভূমি রাজস্বই (খারাজ) ছিল আয়ের প্রধান উৎস। এ ছাড়া গৃহকর, গোচারণ কর, জলকর প্রভৃতি কর ছিল। অর্থ অথবা দ্রব্যের মাধ্যমে কর আদায় করা হত।

(খ) প্রাদেশিক শাসন :—সমগ্র সাম্রাজ্য কতকগুলি প্রদেশে বিভক্ত ছিল এবং প্রত্যেক প্রদেশে একজন ওয়ালী বা শাসন কর্তা

থাকতেন। জিয়াউদ্দীন বারাণীর মতানুসারে মোহাম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বের প্রথম ভাগে সাম্রাজ্য ১২টি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। কিন্তু পরে সুশাসনের জন্য সুলতান প্রদেশের সংখ্যা আরও বাড়িয়ে ছিলেন। সুতরাং প্রদেশের সংখ্যা কুড়ি হতে পঁচিশের মধ্যে ছিল বলে অনুমান করা যায়। প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ বে সরকারী ও সামরিক শাসনের জন্য দায়ী থাকতেন। তাঁরা স্থায়ী একটি সামরিক দল রক্ষণা বেক্ষণ করতেন এবং প্রয়োজনানুযায়ী সুলতানকে সাহায্য করতেন। কিন্তু তাঁদের পদ বংশগত ছিল না। তাঁদের নিযুক্তি, পদচ্যুতি অথবা বদলি সুলতানের মর্জির ওপর নির্ভর করত। প্রদেশের রাজস্ব হতে তাঁদের কে বেতন দেওয়া হত। শাসনকার্যের ব্যয় নির্বাহের পর যে অর্থ উদ্বৃত্ত থাকত, তা সাম্রাজ্যের সাধারণ ধনাগারে জমা দিতে হত। সুলতানকে তিনপ্রকারের বিরাট সৈন্য বাহিনী প্রতিপালন করতে হত; যথা পদাতিক, অশ্বারোহী ও গজারোহী। প্রাদেশিক শাসন কর্তাগণ ছিলেন উচ্চাকাংখী এবং তারা প্রায়ই বিদ্রোহী হতেন। দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থাও ছিল খুব খারাপ। রাষ্ট্রের এরূপ অবস্থায় প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের দমন এবং তাঁদের বিদ্রোহাত্মক মনোভাবকে দাবিয়ে রাখবার জন্য সুলতানকে সুশৃংখল ও সুগঠিত সৈন্য বাহিনী প্রতিপালন করতে হত। তদানীন্তন যুগে সুলতানকে প্রয়োজনানুযায়ী সৈন্য সাহায্য পাবার জন্য প্রাদেশিক শাসনকর্তা ও জায়গীরদারের ওপর নির্ভর করতে হত। কিন্তু এই ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত বিপজ্জনক। প্রাদেশিক শাসনকর্তা ও জায়গীরদারগণ কখনও কখনও ইচ্ছাকৃত অবহেলার দ্বারা সুলতানকে বিপদে ফেলতেন। আলাউদ্দীন খলজীই প্রথম ভারতীয় শাসক যিনি সুষ্ঠ ও সুন্দর ভিত্তির ওপর ভারতীয় বাহিনী গঠন করবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি কেন্দ্রীয় বিভাগ হতে সৈন্যদের নগদ ও নির্দিষ্ট বেতন দানের ব্যবস্থা করেছিলেন। অশ্বদের চিহ্নিত কবরার প্রথা প্রবর্তন করে তিনি সৈন্য বিভাগের দুর্নীতি দমন করে ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর সৈন্যদের যোগ্যতা বিনষ্ট হয় এবং সৈন্যবিভাগে নানা দুর্নীতি

প্রবেশ করে। অশ্বারোহী সৈন্যগণ ছিল সৈন্য বাহিনীর মেরুদণ্ড স্বরূপ। মোহাম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বকালে অশ্বারোহী সৈন্যদের সংখ্যা ছিল ৩৭,০০০। ফিরোজ শাহের আমলে মোট সৈন্য সংখ্যা ছিল ৮০,০০০ এবং কখনও কখনও ক্রীতদাস ব্যতীত ৯০,০০০ হাজার পর্যন্ত অশ্বারোহী থাকত। আরিখ-ই-মমালিক' সৈন্য বাহিনীর তত্বাবধান করতেন। কিন্তু রাষ্ট্রের অর্থের দ্বারা অভিজাতগণের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে ফিরোজ শাহ তুঘলক দিল্লী সাম্রাজ্যের পতনের বীজ বপন করেছিলেন।

(গ) সামাজিক অবস্থা:—ইসলাম জগতকে বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের শিক্ষা দান করেছে। উপযুক্ত গুণ থাকলে আজ যিনি ক্রীতদাস, কাল তিনি সুলতান হতে পারতেন। ইসলামের এই শিক্ষা চিরন্তন। দিল্লী সাম্রাজ্যের সময়ে রাজকার্যে নিযুক্তির ব্যাপারে কোন পার্থক্য ছিল না। নিজস্ব মেধার গুণে অনেক নিম্নপর্যায়ের ব্যক্তি সর্বোচ্চ পদ লাভ করেছেন। মুসলিম সমাজে বিভিন্ন বৃত্তধারী ব্যক্তির মধ্যে কোন ব্যবধান ছিল না। অর্থনৈতিক পার্থক্য থাকলেও অবশিষ্ট জন সাধারণের নিকট হতে তাঁরা দূরে সরে থাকতেন না। উচ্চ বেতনধারী সরকারী কর্মচারীদের একটি অংশ এবং ব্যবসায়ীরা সমৃদ্ধ শালী ছিল। জনসাধারণের একবৃহত্তম অংশ মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং দারিদ্র স্তরভুক্ত ছিল। মুসলমান অভিজাত শ্রেণী দিল্লীর সুলতানী আমলে সমাজে উল্লেখ যোগ্য স্থান অধিকার করেছিলেন। সুলতানদের কার্যের ওপর তাঁদের অমোঘ প্রভাব ছিল। তাঁরা রাষ্ট্রের গুরুত্ব পূর্ণ পদ, যথা—প্রাদেশিক শাসনকর্তা, সেনাপতি প্রভৃতি পদের অধিকারী ছিলেন। উত্তরাধিকারী নির্বাচনের ক্ষেত্রে অভিজাতগণ বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করতেন। ইলতুৎমিশের উত্তরাধিকারিগণের রাজত্বকালে তাঁরা এত বেশী প্রভাবশালী হয়ে ওঠেছিলেন যে, গিয়াসউদ্দীন বলবন ও আলাউদ্দীন খলজী তাঁদের কঠোর ভাবে দমন করতে বাধ্য হন। লোদী সুলতানগণের আমলে তাঁরা পুনরায় অহংকারী ও ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠেন। তাঁদের ক্ষমতা বিনষ্ট করতে গিয়ে ইব্রাহীম লোদীকে সিংহাসন ও প্রাণ দুই-ই হারাতে হয়। অভিজাতগণ সাধারণতঃ খান, মালিক, আমীর প্রভৃতি

উপাধি ধারণ করতেন। কিন্তু ত্রয়োদশ শতাব্দীর অভিজাতগণ জাতীয়তা বোধে উদ্বুদ্ধ ছিলেন না এবং ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডের অভিজাত গণের ন্যায় তাঁরা সুসংগঠিত দল ভুক্ত ও ছিলেন না। তুর্কী, আরবী, আফগানী, আবিসিনীয়, মিশরীয়, জাভা দেশীয় ভারতীয় প্রভৃতি নানা জাতির সংমিশ্রণে অভিজাত শ্রেণী গড়ে ওঠেছিল। কাজেই এই অভিজাত শ্রেণী সুলতানের স্বেচ্ছাচার মূলক কার্যের ওপর সম্মিলিত ভাবে কোন বাধা দিতে পারতেন না। বরং সাম্রাজ্যে গোলযোগ ও বিপদের কারণ হয়েছিলেন। আলেমগণ শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন এবং সমাজের ওপর তাঁদের অমোঘ প্রভাব ছিল। আলাউদ্দীন খলজী আলেমদের ক্ষমতা অনেক কমিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর পর হতে আর কেউ উলেমাগণের ক্ষমতা নিয়ে কোন প্রশ্ন তোলেন নি। মোহাম্মদ বিন তুঘলক ব্যক্তিগতভাবে হয়ত কাউকেও শাস্তি দিয়েছিলেন; কিন্তু শ্রেণীগত ভাবে আলেম ও শেখদের কর্তৃত্ব তিনি খর্ব করতে পারেন নি। সুলতানী আমলে সুফীগণ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। উলেমা ও শেখ ব্যতীত সৈয়দগণ ও সর্বশ্রেণীর লোকদের শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। হিন্দু ও মুসলমান সমাজে স্বামীয় ওপর স্ত্রীর নির্ভরশীলতা সামাজিক জীবনের একটা বৈশিষ্ট্য। সমাজে নারীদের সম্মান ছিল। প্রতেক শ্রেণীর লোক নিজস্ব ঐতিহ্য অনুযায়ী জীবন যাপন করত। উচ্চ শ্রেণীর কতিপয় স্ত্রীলোক শিল্পকলা ও বিজ্ঞান চর্চা করতেন। গ্রাম্য নারীরা গৃহকর্মে ব্যস্ত থাকত। সমুদ্র তীরবর্তী শহর ব্যতীত হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজে পর্দা প্রথা প্রচলিত ছিল। হিন্দুদের মধ্যে বাল্য বিবাহ ও সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মদ্যপান ও জুয়া খেলা ছিল সাধারণ ব্যপার। উৎসব ও নৃত্যগীত দরবারের অঙ্গ ছিল। ঐতিহাসিক আফিফ বলেন যে, প্রত্যক শুক্রবারের নামাযের পর দু-তিন হাজার সঙ্গীতজ্ঞ, ক্রীড়াবিদ ও গল্পকার রাজ দরবারে সমবেত হয়ে জনসাধারণকে তাঁদের স্ব স্ব কার্যকলাপ প্রদর্শন করে মনোরঞ্জন করতেন। সঙ্গীতবিদ, ক্রীড়াবিদ ও গল্প কথকগণ রাজপ্রাসাদ হতে পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করতেন। হিন্দু সমাজ

বিভিন্ন ভেদ নীতি দ্বারা আচ্ছন্ন ছিল। জাতিভেদ প্রথা অত্যন্ত প্রবল ছিল। শূদ্র ও অস্পৃশ্যদের প্রতি ব্রাহ্মণদের অত্যাচার চরমে উঠেছিল। এইরূপ অবস্থার মধ্যে ভারতে ইসলাম ধর্মের আবির্ভাব হয়। সাম্য, সহিষ্ণুতা ও সামাজিক সুবিচার অসংখ্য নির্যাতিত হিন্দুকে ইসলামের পতাকাতলে সমবেত করেছিল।

সুলতানী আমলে হিন্দুদের অবস্থা

বিরুদ্ধবাদী সমালোচকগণ বলে থাকেন যে, মুসলমান শাসনের অধীনে হিন্দুদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। কিন্তু নানা দলিল পত্র ও প্রমানের সাহায্যে এই কথা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করা যায় যে, শুধু ন্যায়পরায়ণতা নয়, বরং উদারতার সঙ্গে হিন্দুদের প্রতি ব্যবহার করা হত। তাদেরকে জিম্মির মর্যাদা দান করা হয়েছিল। সাময়িক ব্যাপারে যদিও কতকগুলি মন্দির ধ্বংস করা হয়েছিল এবং হিন্দুদের বাধ্য বাধকতা ও আনুগত্যের মধ্যে নিয়ে আসবার জন্য বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করা হয়েছিল, তথাপি সুলতানী আমলে ধর্ম ও উৎসবাদির ব্যাপারে তাদের স্বাধীনতা দান করা হয়েছিল। মিঃ এলফিনষ্টোন বলেন, "ধর্মীয় ব্যাপারে হিন্দুদের উৎপীড়ন করা হত না। মুসলিম শাসনের আমলেও হিন্দুগণ ধর্ম পালনের অধিকার ভোগ করত।" ভক্তিবাদ প্রচারের দৃষ্টান্ত হতে এই কথা সহজেই প্রমাণ করা যায় যে, মুসলমানদের অধীনতা স্বীকার করলে হিন্দু শাসকগণ তাঁদের ক্ষমতা বজায় রাখতে পারতেন। ফেরেস্তা বলেন, "শাসকদের মধ্যে একজন সুলতান হিন্দু পদাতিক সৈন্যকে তাঁর দেহরক্ষী নিযুক্ত করেছিলেন।" রাষ্ট্রের কার্যে আলাউদ্দীন খলজী ও মোহাম্মদ বিন তুঘলক অনেক হিন্দুকে নিয়োগ করেছিলেন। সামরিক কার্য হতে অব্যাহতি দেওয়ার বিনিময়ে হিন্দুদের ওপর জিযিয়া কর ধার্য করা হত। কিন্তু যারা স্বেচ্ছায় সামরিক কার্যে যোগদান করত তাদের জিযিয়া কর দিতে হত না। ডঃ এ, এম, হোসেন বলেন, ভিন্ন মতাবলম্বী বা বিধর্মী বলে নয়, রাজনৈতিক অসন্তুষ্টের কারণেই হিন্দুগণ অপদস্থ হত এবং একই কারণে মুসলমানগণও উৎপীড়ন ভোগ করত।

আলাউদ্দীন খলজী ও মোহাম্মদ বিন তুঘলক অনেক মুসলমানকে হত্যা করেছিলেন এবং অনেককে সাম্রাজ্য হতে বিতাড়িত করে দিয়েছিলেন। এ সত্য যে অনেক সুলতান নিজস্ব ধর্মীয় আচরণ বা উৎসবাদির ব্যাপারে অত্যন্ত গোঁড়া ছিলেন। কিন্তু তাঁরা অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের ওপর তাঁদের ধর্ম জোর করে চাপিয়ে দিতেন না। স্থানীয় শাসন ক্ষমতা সম্পূর্ণ রূপে হিন্দুদের হাতেই ছিল। কিন্তু শাসকগণ যে পরিমাণ কর ধার্য করতেন তা অপেক্ষা মুসলমান শাসকদের আমলে হিন্দুদের ওপর করভার অনেক কম ছিল। ব্যবসায় বাণিজ্য ও কৃষির ক্ষেত্রে হিন্দুরাও প্রচুর পরিমাণে অংশ গ্রহণ করত। টাকা কর্জ দেওয়া ও ব্যাংকের কাজ হিন্দুদের একচেটিয়া ছিল। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও হিন্দুদের প্রতি সমান সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করা হত। হিন্দুদের শিল্পকলা, স্থাপত্য বিদ্যা, ভাষা, সঙ্গীত, চিত্রকলা, ঐতিহ্য ও দর্শন মুসলমানদের সঙ্গে সঙ্গে উন্নতি লাভ করতে থাকে।

অর্থনৈতিক অবস্থা

সুলতানী আমলে যে সমস্ত বিদেশী পর্যটক ভারত বর্ষে এসেছিলেন তাঁরা এই দেশের তদানীন্তন অর্থনৈতিক অবস্থা মোটামুটি উন্নত ছিল এই কথা বলেছেন। তাঁদের অনেকের মত এই যে, ব্যবসায় বাণিজ্য ও শিল্পে উন্নতির জন্য রাষ্ট্র হতে প্রচুর উৎসাহ প্রদান করা হত। মার্কোপোলো ও ইবনে বতুতা ব্রোচও কালিকট সম্বন্ধে খুব উচ্চ মন্তব্য করেছেন। কারণ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত হতে ব্যবসায়ীরা এখানে জিনিস কিনবার জন্য আসত। ওয়াসফ গুজরাটকে ধনপূর্ণ ও জনবহুল বলেছেন। বঙ্গদেশ সম্বন্ধে ইবনে বতুতার মত এই যে, উহা ধনসম্পদে পরিপূর্ণ ও উর্বরা ছিল। গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীরা কৃষিজীবি হলেও সেখানে তূলা, পশম ও শিল্পের কাজও চলত। এছাড়া, রংয়ের কাজ ও কাপড় প্রিন্ট করবার ব্যবস্থাও প্রচলিত ছিল। মার্কোপোলো বলেন, "অধিবাসীরা সৎ ছিল এবং তারা ব্যবসায় ও শিল্প কর্মের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করত।" ধনিক শ্রেণীর জন্য প্রধান আমদানী দ্রব্য ছিল বিলাস সামগ্রী, অশ্ব ও গর্দভ। প্রধান রপ্তানী দ্রব্য হিসাবে কৃষিজাত

দ্রব্য ও বস্ত্রশিল্প বিদেশে প্রেরণ করা হত। সূতীবস্ত্র রপ্তানী করবার জন্য গুজরাট ও বঙ্গদেশ অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ছিল। ভারথেমার মতানুসারে "তূলা, আদা, আলু, শস্য ও বিভিন্ন প্রকার মাংসের প্রাচুর্যের জন্য বঙ্গদেশ পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ছিল। সাম্রাজ্যের শান্ত অবস্থায় জিনিস পত্র সস্তাদামে বিক্রয় হত। কিন্তু দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর সময় মূল্য অস্বাভাবিক হারে বেড়ে যেত। ফিরোজ শাহ তুঘলক ও ইব্রাহীম লোদীর রাজত্বকালে শস্যের দাম অতি অল্প ছিল। মোহাম্মদ বিন তুঘলকের সময় দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে প্রতি সের শস্যের মূল্য ১৬ হতে ১৭ জিতল পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছিল। ইবনে বতুতা বলেন যে, "বঙ্গদেশ অপেক্ষা সস্তাদরে জিনিস বিক্রয় হতে তিনি আর কোথায়ও দেখেন নি। তিনজন লোকের পরিবারে আট দিরহামের বেশী খরচ হত না।" জিনিস পত্রের মূল্য সেই সময়ে অত্যন্ত অল্প হলেও কৃষকদের জীবনযাত্রার মান উন্নত ছিল না। শাসক শ্রেণী ও রাজকর্মচারিগণ বিলাস বসনের মধ্যে জীবন কাটাতেন। চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগে অর্থনৈতিক অবনতি শুরু হয়। তৈমুরের আক্রমণের পর দেশের অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছিল এবং সমাজের ভিত্তি প্রবল ভাবে গড়ে ওঠেছিল।

সাহিত্য

দিল্লীর অধিকাংশ সুলতান, আমীর ও প্রাদেশিক মুসলমান শাসকগণ শিক্ষা এবং শিক্ষিতদের উদার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁদের সময়ে ফারসী সাহিত্য যথেষ্ট অনুপ্রেরণা লাভ করে। এই সময়ে যে জ্ঞানী এবং পণ্ডিত প্রভৃতি খ্যাতি লাভ করেন তাঁদের মধ্যে আমীর খসরু, কাজী মিনহাজউদ্দীন সিরাজ, জিয়াউদ্দীন বারাণী, সামশ, সিরাজ-ই-আফিফ এবং ইয়াহ ইয়া বিন আহমদ মধ্য যুগের ঐতিহাসিক সাহিত্যে বিশেষ প্রসিদ্ধ। বুলবুলে হিন্দ আমীর খসরু একজন বিখ্যাত কবি এবং সেই যুগের সর্বাপেক্ষা খ্যাতিমান ব্যক্তি ছিলেন। মাওলানা শিবলী বলেন, 'বিগত ছশো বছরের মধ্যে ভারতবর্ষে কাব্যকলার এমন বিশ্বজনীন প্রতিভা নিয়ে তাঁর ন্যায় আর কেউ জন্মগ্রহণ করেন নি।' বলবনের রাজত্বকালেই তিনি কবি খ্যাতি লাভ করেন।

তিনি আলাউদ্দীন খলজীর সভাকবি ছিলেন। তিনি গিয়াসউদ্দীন তুঘলকের পৃষ্ঠপোষকতাও লাভ করেন এবং তাঁর আদেশে 'তুঘলক নামা' রচনা করেন। তাঁর গদ্য রচনার মধ্যে ইজাজ খুসরভী, খাজাইনাল ফুতু' অথবা 'তারিখ-ই-আলাই এবং আফযলুল ফারাইদ প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর কাব্যের মধ্যে 'খামসার' পাঁচ মসনবী আলাউদ্দীন খলজীর জীবন এবং রাজত্বকালের ওপর আলোকপাত করে। তাঁর সমসাময়িক প্রসিদ্ধ ফারসী কবি হাসান-ই-দিহলাবী মোহাম্মদ বিন তুঘলকের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। মিনহাজউদ্দীন সিরাজ ভারতে মুসলিম শাসনের একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক ছিলেন। তাঁর একটি পুস্তকের নাম 'তাবকাত-ই-নাসিরী নাসিরউদ্দীন মাহমুদের নামানুসারেই রাখা হয়। এই সময় জিয়াউদ্দীন বারাণী ছিলেন সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক। তিনি অনেকগুলি পুস্তক প্রণয়ন করেন এবং এই সকল গ্রন্থের মধ্যে তারিখ-ই-ফিরোজ শাহীতে খলজী ও তুঘলক বংশের অতিশয় নির্ভরযোগ্য সংবাদ আমরা পেয়ে থাকি। তারিখ-ই-ফিরোজ শাহীর লেখক সামশ-ই-সিরাজ আফিফ এবং তারিখ-ই-মুবারক শাহীর লেখক ইয়াহ ইয়া বিন আহমদ ছিলেন তুঘলক যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক। কতকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থও এই সময়ে ফারসী ভাষায় অনূদিত হয়। দশম শতাব্দীতে আলবেরুণী ভারতবর্ষে আসেন। তিনি একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। বিভিন্ন বিষয়ের কয়েকটি বই তিনি সংস্কৃত হতে আরবীতে অনুবাদ করেন। বহমনী রাজ্যের অধিকাংশ শাসক এবং অন্যান্য স্বাধীন রাষ্ট্র যথা—বঙ্গদেশ, জৌনপুর, বিজাপুর, গোলকুণ্ডা, আহমদনগর, মালব এবং বিজয় নগরের শাসকগণ শিল্প এবং সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। সংস্কৃত এবং হিন্দী ভাষায় অনেক সুন্দর ধর্মগ্রন্থ রচিত হয় এবং হিন্দু পণ্ডিতগণ দর্শনশাস্ত্র প্রণয়ন করেন। হিন্দু কবিদের মধ্যে 'পৃথ্বীরাজ রইসার' প্রণেতা চাঁদবর্দি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ছিলেন। কিন্তু হিন্দু লেখকদের মধ্যে ইতিহাস রচনার প্রবণতা দেখা যায়নি। একমাত্র ঐতিহাসিক কলহানের গ্রন্থ 'রাজতরঙ্গিনী' বা রাজাদের নদী,

দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত হয়। বঙ্গদেশের কয়েকজন সুলতান বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। উর্দু সাহিত্য দিল্লীর সুলতান এবং দাক্ষিণাত্যের বাহমনী শাসকগণেরও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে।

স্থাপত্য শিল্প

দিল্লীর সুলতান ও প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ স্থাপত্য শিল্পের যথেষ্ট পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। দিল্লী সাম্রাজ্যের বিখ্যাত স্থাপত্য শিল্পগুলির অধিকাংশই সুলতানগণের পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মিত হয়। অন্যান্যগুলি বাংলা, গুজরাট, মালব এবং দাক্ষিণাত্যের রাজা ও অভিজাতগণের দ্বারা নির্মিত হয়। সুলতানগণ যে সকল অট্টালিকা নির্মাণ করেছিলেন। তাদের মধ্যে রাজপ্রাসাদ, দুর্গ, মসজিদ, মহৎ ব্যক্তির কবর এবং দরিদ্রের আশ্রয় স্থান ও সমাধি স্তম্ভই প্রধান। ভারতীয় মুসলিম ও স্থাপত্য রীতি সিরিয়া, বাইজানটাইন, মিশর এবং ইরানের স্থাপত্য রীতির সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছিল এবং এতে হিন্দু, বৌদ্ধ এবং জৈনদের অবদান কম ছিল না। স্যার জন মার্শাল বলেন, 'ইন্দো-ইসলামী শিল্পে কেবল বৈচিত্রময় ইসলামী রীতি নয়, আবার শুধু হিন্দুস্থানী রীতিও নয়। বিস্তারিত ভাবে বলতে গেলে, ইন্দো ইসলামী স্থাপত্যে অল্পবিস্তর উভয় জাতির অবদান রয়েছে।' ভারতীয় এবং ইসলামী রীতির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। হিন্দু স্মৃতি স্তম্ভের ওপর দেবদেবীর ছবি আঁকা থাকত এবং মুসলিম সজ্জারীতি সুন্দর হস্তলিপি, জ্যামিতিক নকশা এবং উদ্ভিদ বা পুষ্প চিত্রের ওপর গড়ে ওঠেছিল। ইসলামের সঙ্গে হিন্দুদের সংস্পর্শের ফলে এমন এক রীতি গড়ে ওঠে যাকে ইন্দো-ইসলামী স্থাপত্য শিল্প বলা হয়। হিন্দু স্থাপত্য রীতির মিশ্রণ এই কারণেই সম্ভব হয়েছিল যে, সুলতানগণ যে সকল স্থানীয় কারীগরদের (হিন্দু) নিযুক্ত করতেন জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সুলতানী শাসনের প্রাথমিক আমলে স্থাপত্য কর্মের সঙ্গে তাদের নিজস্ব জাতীয় ঐতিহ্যের চিহ্ন রেখে যেত। তথাকথিত ইন্দো-ইসলামী স্থাপত্য শিল্প বলতে এটিই বুঝায় যে, স্থাপত্য শিল্পে কতকগুলি বিশেষ হিন্দু শিল্প রীতির সংমিশ্রণ থাকত।

কালক্রমে মুসলিম কারীগর এবং শিল্পী এই দেশে বিপুল সংখ্যায় আসতে থাকে এবং পরবর্তীকালে হিন্দু স্থাপত্যশিল্পের প্রভাব লোপ পেতে থাকে। সুলতান কুতুবউদ্দীন আইবক দিল্লীতে সর্ব প্রথম স্থাপত্য শিল্পের পত্তন করেন। তাঁর নির্মিত 'কুওত-উল-ইসলাম মসজিদ এবং কুতুব মিনার দিল্লীর শিল্প রীতির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। কুতুব মিনার মূলতঃ একটি গম্বুজ এবং সেখান হতে মোয়াজ্জিন আজান দিতেন। কুতুবউদ্দীন এর নির্মাণ শুরু করেন; কিন্তু ইলতুৎমিশ এটি বর্ধিত এবং সম্পূর্ণ করেন। কুতুবউদ্দীন আইবক আজমীরে 'আড়াই-দিন - কা ঝোপড়া' নামে একটি মসজিদের গোড়া পত্তন করেন। নির্মাণ রীতির দিক দিয়ে এটি দিল্লীর কুওত-উল-ইসলাম মসজিদের অনুরূপ। ১২২৩ খ্রীষ্টাব্দে ইলতুৎমিশ জাম-ই-মসজিদ নির্মাণ করেন। তাঁর উত্তরাধিকারীগণ বলবনের সমাধি ব্যতীত অপর বিষয়ে কোন স্থাপত্য কীর্তির নিদর্শন রেখে যেতে পারেন নি। খলজী শাসনের সময় যে নির্মাণ কার্য সম্পন্ন হয়, তাতে মুসলিম স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন পরিলক্ষিত হয়। এই সমস্ত নির্মাণ কার্যের মধ্যে নিজামউদ্দীন আউলিয়ার দরগাহ এর জামাত খানা মসজিদ কুতুব মিনারের 'আলাই দরজা' বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। 'আলাই দরজা' মুসলিম স্থাপত্য শিল্পের অন্যতম রত্ন বিশেষ। তুঘলক শাসকগণ তাঁদের নির্মাণ কার্যে সরল অথচ ব্যাপক রীতির অনুসরণ করেছিলেন। গিয়াসউদ্দীনের মাজার এই ধরণের শিল্পকর্মের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। শিল্প কার্যে এই সারল্য এবং প্রশান্ত ভাব তুঘলকদের ধর্মীয় ধারণা হতেই উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। মোহাম্মদ বিন্ তুঘলক তাঁর নূতন রাজধানীতে 'বেগমপুরী মসজিদ' নামক একটি বিরাট মসজিদ নির্মাণ করেন। এই বংশের সুলতান ফিরোজ শাহ ছিলেন এই সকল নির্মাণ কার্যের একজন বড় পৃষ্ঠপোষক। তিনি নগর, প্রাসাদ, মসজিদ, পুষ্করিণী, জলাধার ও বাগান নির্মাণ কাজে প্রভূত অর্থ ব্যয় করেন। 'কালি' অথবা সঞ্জর মসজিদ' এবং খিরকী মসজিদ নির্মাণে তিনি প্রচলিত রীতির অনুসরণ করেন। বিরাট এক পুষ্করিণীর ধারে তিনি 'হজা

খাস' অথবা 'হজী আলাই' নির্মাণ করেন। তিনি ফিরোজাবাদ, ফতেহাবাদ, হিসার, ফিরোজ, জৌনপুর প্রভৃতি নগরীর প্রতিষ্ঠা করেন। কয়েকজন প্রাদেশিক শাসনকর্তা শিল্পে ও সাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন। জৌন পুরের 'আতালা মসজিদ; জাম-ই-মসজিদ' এবং লাল দরজা জৌনপুরী শিল্পের প্রকৃষ্ট নিদর্শন। বাংলার স্বাধীন শাসন কর্তাগণও শিল্পের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। পাণ্ডুয়ার 'আদিনা মসজিদ, বাগের হাটের (খুলনা) ষাট গম্বুজ মসজিদ' ও খান জাহান আলীর মাজার, তাঁতি পাড়া মসজিদ, গৌড়ের ছোটসোনা এবং বড়সোনা মসজিদ ও কদম রসূল প্রভৃতি তাঁদের শিল্পরুচীর পরিচয় বহন করে। মসজিদ ও সমাধি সৌধ ছাড়াও এই যুগের নির্মিত বিভিন্ন তোরণ দ্বার ও মিনার মুসলিম বাংলার স্থাপত্য শিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। এদের মধ্যে গৌড়ের দাখিল-দরজা ও আলাউদ্দীন হোসেন শাহের সমাধির তোরণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দাখিল দরজা ইষ্টক নির্মিত। বঙ্গদেশে মিশ্র রীতির এক প্রকার স্থাপত্য শিল্প গড়ে ওঠেছিল। গুজরাটের মুসলিম স্থাপত্য শিল্প নিজস্ব রীতির অনুসরণ করে। এর উন্নত অলঙ্করণ রীতির সারল্য এবং উদ্ভিদ ও পুষ্পরাজির চিত্র বঙ্গদেশের প্রচলিত সরলনীতি হতে পৃথক। ভারতে মুসলিম বিজয়ের পূর্ব হতে বঙ্গদেশে হিন্দু স্থাপত্যশিল্পের নিদর্শন পাওয়া যায়। মুসলমানগণ যখন এই দেশে অধিকার করেন তখন তাঁরা নিজেদের প্রয়োজনানুযায়ী এবং জিন রীতি গ্রহণ করেন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে অসংখ্য প্রাসাদ, মসজিদ এবং কবর নির্মিত হয়। মণ্ডুতে (মালবের রাজধানী) যে সমস্ত সুন্দর অট্টালিকা গড়ে ওঠে তাদের মধ্যে 'জাম-ই-মসজিদ', 'হিন্দুমহল', 'জাহাজ মহল', 'হুমাং শাহের কবর' এবং বাহাদুরের প্রাসাদ' ও রূপমতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দাক্ষিণাত্যের বাহমনী সুলতানগণ স্থাপত্যশিল্পের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁরা শিল্পে মিশ্ররীতির প্রবর্তন করেন। এটি ভারতীয়, তুর্কী, মিশরীয় এবং পারস্য রীতি সমন্বয়ে গড়ে ওঠে। গুলবর্গার 'জাম-ই-মসজিদ', দৌলতাবাদের চাঁদ মিনার, বিদরে মোহাম্মদ গাওয়ানের কলেজ প্রভৃতি দাক্ষিণাত্য শিল্পের উন্নত নিদর্শন।

॥ চতুর্থ অধ্যায় ॥

ভারতীয় সংস্কৃতির ওপর ইসলামের প্রভাব

(১) ভারতে ইসলামের আবির্ভাব এবং মুসলিম শাসনের স্থায়িত্বের ফলে এই দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় জীবনে গুরুতর পরিবর্তন সাধিত হয়। রাজনৈতিক দৃষ্টি কোণ হতে বিচার করলে দেখা যায় যে, প্রাক-মুসলিম যুগে যা সম্ভব হয়নি তুর্ক-আফগান বিজয়ের ফলে এই উপমহাদেশে সেই একতা সম্ভব হয়েছিল। মুসলিম বিজয়ের পূর্বে কোন হিন্দু শাসক ভারতের প্রদেশ গুলিকে একসূত্রে যোজনা করতে পারেন নি। দ্বিতীয়তঃ, মুসলিম নের্তৃত্বের অধীনে কেন্দ্রীয় শাসন বিভাগের দ্বারা বৃহৎ এক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে দূর প্রাচ্যের ক্ষমতা এবং গৌরব বহুল পরিমাণে বর্ধিত হয়েছিল। তা ছাড়া, রাজনৈতিক কারণে হিন্দু মুসলমানের মিলনের ফলে এমন এক নূতন ধরনের শাসন ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল যা ভারতীয় এবং ইসলামী চিন্তাধারার মিলন ঘটেছিল। (২) সামাজিক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, মুসলমানদের ভারত বিজয়ের ফলে হিন্দু সমাজের যথেষ্ট পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। প্রাথমিক তুর্কী শাসনের আমল হতে ইসলাম প্রমাণ করেছে যে, রাজোচিত গুণ থাকলে আজ যিনি ক্রীতদাস, কাল তিনি রাজা হতে পারেন। ইসলামের বিশ্বজনীন একতা এবং ভ্রাতৃত্ববোধ ব্রাহ্মণদের কুসংস্কারের ওপর প্রবল আঘাত হেনে ছিল। যে সমস্ত লোক তাদের বিশেষ, অধিকার এবং ক্ষমতা বজায় রাখবার ও ইসলামেয় অগ্রগতিকে রোধ করবার জন্য পরোক্ষভাবে জাতিভেদ প্রথাকে প্রবল করে তুলেছিল, ইসলাম তাঁদের সুন্দর শিক্ষা দান করেছিল। দ্বিতীয়ত অত্যন্ত কঠোরতার সঙ্গে পর্দাপ্রথা পালন করা হত। নারীদের ওপর বিদেশীদের আক্রমণের ভয় এবং শাসকশ্রেণী

পর্দা প্রথার যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন সেই জন্য সমাজে পর্দা প্রথার প্রচলন হয়। তৃতীয়তঃ, বিজেতা ও বিজিতদের মধ্যে সামাজিক রীতি নীতির আদান-প্রদান ঘটেছিল। বিজিত হিন্দুদের কতকগুলি আচার ব্যবহার বিজেতাগণ গ্রহণ করেছিল এবং অনুরূপভাবে বিজিতগণও বিজেতাদের অনেক রীতি নীতি গ্রহণ করেছিল। (৩) সংস্কৃতি ও সভ্যতার ক্ষেত্রে সমাজে বিরাট পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল। হিন্দু ও মুসলমানদের ঘনিষ্ঠ মিশ্রনের ফলে মুসলিম সংস্কৃতি বহুল পরিমাণে হিন্দুরা গ্রহণ করেছিল। মুসলিম শিল্প কলা ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করবার জন্য হিন্দুগণ আরবী ও ফারসী ভাষা শিক্ষা করে। উভয় সম্প্রদায় একত্রে বসবাস করবার ফলে শিল্প ও স্থাপত্য এবং সঙ্গীত ও চিত্রকলার ক্ষেত্রে ইন্দো-ইসলামী নামে এক নূতন রীতি গড়ে ওঠে। হিন্দু মুসলমানের সহাবস্থানের ফলে কালক্রমে এক সাধারণ ভাষার ও উৎপত্তি হয়। বিজেতাগণ তুর্কী ও ফারসী ভাষায় কথা বলত এবং উত্তর ভারতের অধিবাসীগণ হিন্দী ভাষায় কথা বলত। কাজেই বিজিত এবং বিজেতাদের মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতার জন্য সাধারণ ভাষার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল। ফলে হিন্দী এবং ফরাসী ভাষার সংমিশ্রণে উর্দু ভাষার সৃষ্টি হয়। (৪) হিন্দু ধর্মের ওপর ইসলামের প্রভাবের ফলে ভারতের ইতিহাসে এক বিরাট পরিবর্তন ঘটে। এখানে ইসলাম প্রভুত্ব বিস্তার করলে হিন্দু ধর্মের ক্ষতি হয়। ইসলাম ধর্মের প্রভাবের ফলে বৌদ্ধ ধর্ম বাংলা এবং বিহার হতে তিরোহিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, ভারত বর্ষে ইসলাম ধর্মের ব্যাপক প্রসার ঘটে। ইসলামের সাম্যবাদ, সামাজিক সম্মান ও মর্যাদা এবং মুসলমানদের অর্থনৈতিক সুবিধা অনেককেই বিজেতার ধর্ম গ্রহণ করতে অনুপ্রাণিত করেছিল। সর্বশেষে, মুসলিম বিজয়ের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণফল এই যে, এর ফলে নূতন এক ধর্মীয় চেতনা দেখা দেয় এবং এর প্রধান লক্ষ্য ছিল হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে একতা ও মিলন স্থাপন। আল্লাহ্‌র একত্ব এবং ইসলামের সহজ-সরল নীতি ভারতীয় চিন্তাবিদদের মনের ওপর অমোঘ প্রভাব বিস্তার করে। তাঁরা প্রায় সকলেই হিন্দুদের বর্ণ বৈষম্যের

বিরোধিতা করে মানবতার জয়গান গাইতে থাকেন। তাঁদের মতানুসারে শূন্যতায় কোন ধর্ম নেই আল্লাহ্‌র প্রতি ভক্তি অথবা প্রকৃত অনুরক্তিই ধর্ম।

সুলতানী আমলে সমাজ ও সংস্কৃতি

ভক্তি আন্দোলন ঃ—দাক্ষিণাত্যে যে ভক্তি আন্দোলন শুরু হয় উত্তর-ভারতের বিভিন্ন প্রদেশেও তা ছড়িয়ে পড়ে। রামানুজ এই আন্দোলনের প্রধান পুরোহিত ছিলেন। তিনি 'স্ত্রী' সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা বলে পরিগণিত। তাঁর মতানুসারে প্রেম এবং অনুরাগই ধর্মের মূলকথা এবং এ ছাড়া মুক্তি লাভ সম্ভব নয়। রামানন্দ চতুর্দশ শতাব্দীতে এলাহাবাদে জন্ম গ্রহণ করেন এবং তিনিই সর্ব প্রথম জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের ভক্তি আন্দোলনের তিনিই ছিলেন সংযোগকারী খলজী এবং তুঘলক শাসনকালে তিনি তাঁর বাণী প্রচার করেন। এই সময়ে বিখ্যাত সুফী মতাবলম্বী ফকীর শেখ নিজামউদ্দীন আওলিয়া প্রেম ও মানবতার বাণী প্রচার করেন। তাঁর শিষ্যগণ ভারতের সর্বত্র নিম্নশ্রেণীর লোকদের মধ্যে উপরিউক্ত বাণী প্রচারের জন্য আত্মনিয়োগ করেন। ঐতিহাসিক-গণ বলেন যে, রামানন্দ সুফী মতাবলম্বীদের দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে পরিভ্রমণ করেন এবং ধর্মীয় ও সামাজিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, হিন্দু ধর্মের বিশেষ পরিবর্তন ব্যতীত কোন রূপ সংস্কার সম্ভব নয়। সুফীদের মতামত ধর্মান্দোলনের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। তিনি তাঁর শিষ্যদের এই ব্যাপারে সাহায্য করতে সাহায্য করতে বলেন। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের জাতিভেদ প্রথাকে তিনি বিশেষ ভাবে বর্জন করেন এবং বিষ্ণুর পরিবর্তে রামচন্দ্রের পূজার প্রবর্তন করেন। হিন্দু মুসলমান নর ও নারী নির্বিশেষে অনেকেই তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। সর্বশ্রেণীর লোককে সাহায্য করবার জন্য তিনি শিষ্যদের উপদেশ দান করেন। তিনিই প্রথম মাতৃভাষায়

(হিন্দী) সাহায্যে ধর্ম প্রচার করেন। রামানন্দের শিষ্যদের মধ্যে কবীর ছিলেন সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। মুসলমান হলেও তিনি রামানন্দের দ্বারা প্রভাবান্বিত হন। ভারতের ধর্মান্দোলনের ইতিহাসে কবীর ছিলেন প্রেম এবং মানবতার বাণীর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রচারক। তিনি সাধারণ মানুষকে তাদের নিজস্ব ভাষায় বাণী দান করতেন এবং তাঁর দোঁহার মাধ্যমে ভক্তির মূলকথা প্রচার করেন। ধর্মের ক্ষেত্রে হিন্দু মুসলমানদের মিলনের চেষ্টা তিনিই প্রথম করেছিলেন। মূর্তি পূজা এবং জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে তিনি তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে শ্রী চৈতন্য বঙ্গদেশে সংস্কার আন্দোলন আরম্ভ করেন। তিনি ছিলেন গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রবর্তক। তিনি ২৫ বছর বয়সে গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাসী হন। জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদ করেন এবং বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের বাণী প্রচার করেন। শ্রীকৃষ্ণের অবতার হিসাবে লক্ষ লক্ষ লোকের দ্বারা তিনি পূজিত হন। অদ্যাবধি বঙ্গদেশের ঘরে ঘরে তাঁর নাম উচ্চারিত হয়। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর লোককে তিনি ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আলিঙ্গন করেন। শিখধর্মের প্রবর্তক গুরু নানক ছিলেন সেই যুগের আর একজন বিখ্যাত সংস্কারক। তিনি ছিলেন পাঞ্জাবের জনৈক তেলির পুত্র। ইসলামের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কবীরের ন্যায় তিনিও পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধাচরণ করেন। গুরু নানক জাতিভেদ প্রথার নিন্দা করে আল্লাহ্‌র একত্ব প্রচার করেন। হিন্দু-মুসলমান ধর্মের সমন্বয় সাধন তাঁর জীবনের ব্রত ছিল। কথিত আছে, সত্যের সন্ধানে তিনি পবিত্র মক্কা ও বাগদাদ পরিভ্রমণ করেন। ভারতের ইতিহাসে ভক্তি আন্দোলনের প্রভাব সুদূর প্রসারী ছিল। ইসলামের ভ্রাতৃত্ববোধ ভারতের হিন্দু ধর্মবোধকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করে। এই নূতন চিন্তাধারা নিম্নশ্রেণীর লোকদের শিক্ষা দিয়েছিল যে, মানুষের দ্বারা ঘৃণিত হলেও আল্লাহ্‌কে ভক্তি সহকারে উপাসনা করলে তিনি তাদের ভালবাসবেন। ধর্মীয় সংস্কারকগণ হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ দূর করতে চেষ্টা করেছিলেন। যদিও তাঁদের প্রচেষ্টা সম্যক সফল হয়নি, তবু তাঁরা

পরবর্তীকালে আকবরের উদার নীতির জন্য পথ রচনা করে গিয়েছিলেন কিন্তু এই আন্দোলনের সর্বাপেক্ষা উল্লেখ যোগ্য সুফল হয়েছিল মাতৃভাষার উন্নতি। সংস্কারকগণ মাতৃভাষাকে বাণী প্রচারের বাহন হিসাবে গ্রহণ করে উহার পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন।

সুফীবাদ ও তার প্রভাব

মুসলিম বিজেতাদের সঙ্গে অনেক সুফী সাধক ভারতে এসেছিলেন। তাঁরা এই উপমহাদেশে ইসলাম বিস্তারে এক গুরুত্ব পূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। এই দেশে ইসলাম প্রচারের জন্য তাঁদের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। তাঁদের প্রচারের ফলে হাজার হাজার নিম্নশ্রেণীর হিন্দু জনসাধারণ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। জাতিভেদ প্রথার সুফল এবং সুফীদের সহজ সবল জীবনযাত্রা এই উপমহাদেশে ইসলাম বিস্তারে তাঁদের সাফল্যের জন্য যথেষ্ট সহায়ক হয়েছিল। সুফীবাদ ইসলামের একটি রহস্যময় আধ্যাত্মিক আন্দোলন। মতবাদের লক্ষ্য আল্লাহ্‌র গূঢ় অনুভূতির অন্বেষণ। সুফীদের সাধনার মর্মকথা হল পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার মিলন সাধন। সুফীগণ পবিত্র কোরআন ও হযরত মোহাম্মদের বাণীকে সুফীবাদের প্রাথমিক উপাদান হিসাবে গ্রহণ করে না। সুফীরা আল্লাহ্‌র ধ্যান ও প্রেমের মধ্যে এমন মগ্ন হয়ে পড়েন যে, পার্থিব বস্তুর প্রতি তাঁদের কোন খেয়াল থাকে না। সুফীবাদকে ইসলামের গণ্ডীর মধ্যে ধরে রাখার জন্য সুফীগণ নিজেদেরকে সিলসিলাহ্ বা তরিকায় সংগঠিত করেন। সুফীবাদে অনেকগুলি 'সিলসিলাহ' বা উপ সিলসিলাহ্ ছিল কিন্তু উহাদের মধ্যে চারটি ছিল খুব গুরুত্ব পূর্ণ, যথা সেখ আবদুল কাদের জিলানী (১০৭৭-১১৬৬ খ্রীঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কাদেরীয়া খাজা বাহাউদ্দীন নাকশবন্দ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত নাকশ বন্দী, খাজা আবু ইসহাক শামীর প্রতিষ্ঠিত চিশতী এবং শেখ বাহাউদ্দীন জাকারিয়া কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সোহরাবর্দীয়া। গজনীর সুলতান মাহ্‌মুদের সঙ্গে অনেক সুফী সাধক ও যোদ্ধা ভারতে এসেছিলেন। এই সকল সুফী সাধক ভারতীয় সমাজে প্রবেশ করে এদেশে ইসলাম প্রচার করেন। সুলতান মাহমুদের মৃত্যুর

কয়েক বছর পরে শেখ আলী হুজওয়ারী গজনী হতে লাহোর আসেন। তিনি ইতিহাসে দাতাগঞ্জ বখশ নামেই সমধিক পরিচিত। এই উপমহাদেশের ইতিহাসে তিনি ছিলেন প্রথম মুসলমান অতীন্দ্রিয় বাদী। পাঞ্জাবে ইসলাম প্রচারে তাঁর যথেষ্ট অবদান ছিল। আজমীরের খাজা মুঈনুউদ্দীন সুফী সাধকদের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ও প্রভাবশালী লোক ছিলেন। তিনি চিশতী তরিকা ভুক্ত ছিলেন এবং এই উপমহাদেশে তিনিই উহার প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু মুসলিম জাহানের বিভিন্ন অংশে ভ্রমণ করেছিলেন। ১১৯২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভারতবর্ষে আসেন এবং আজমীরকে তার প্রচার কার্যের কেন্দ্র করেন। এই উপমহাদেশের হিন্দু মুসলমান সকলেরই তিনি প্রিয় পাত্র ছিলেন। এদেশের জনগণ তাঁকে আদর করে 'খাজা গরীব নওয়াজ' (গরীব লোকদের সুফী) বলে ডাকত। তাঁর সুনাম ও সুখ্যাতির জন্য তিনি ভারতীয় উপমহাদেশে 'সুলতান-উল-হিন্দ' (আধ্যাত্মিক পর্যায়ে হিন্দুস্থানের সুলতান) নামে পরিচিত। তিনি সর্ব প্রথম একজন ব্রাহ্মণ যোগীকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন। কথিত আছে, একদা ভ্রমণকালে দিল্লীতে পৌছালে সাতশ হিন্দু তাঁর নিকট ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। অতি অল্পকালের মধ্যে বহু ল্যোক তাঁর কাছে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। খাজা মুঈন উদ্দীন চিশতী মোহাম্মদ ঘুরীর সমসাময়িক ছিলেন। সুলতান ইলতুৎ মিশের রাজত্বকালে তিনি প্রাণত্যাগ করেন। এই মহাসাধককে আজমীরে সমাহিত করা হয়। তাঁর মাজার এই উপমহাদেশের একটি জনপ্রিয় তীর্থ স্থান। প্রতি বছর সকল শ্রেণীর অগণিত ভক্ত এখনও তাঁর মাজারে ভক্তি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে জমায়েত হন। শেখ কুতুবউদ্দীন বখতিয়ার কাকী ও শেখ ফরিদ উদ্দীন গঞ্জ শাকের (বাবা ফরিদ নামে সমাধিক পরিচিত) খাজা গরীব নওয়াজ মুঈনউদ্দীন চিশতীর একজন প্রধান উত্তরাধিকারী ছিলেন। ভারতের বিভিন্ন অংশে চিশতী তরিকাকে জনপ্রিয় করবার ব্যাপারে তাঁদের দান অপরিসীম। সুলতানী আমলে চিশতী তরিকা ছিল সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়ও শক্তিশালী। চিশতী তরিকার সুফীগণ উত্তর ভারত, দাক্ষিণাত্য এবং বঙ্গদেশে ইসলাম

প্রচারের ক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। এই উপমহাদেশের ইতিহাসে খাজা মুঈনউদ্দীন চিশতীর পরে সম্ভবতঃ শেখ নিজামউদ্দীন আওলিয়া জনপ্রিয় সুফী সাধক। তিনি বাবা ফরিদের একজন বিখ্যাত শিষ্য ছিলেন। অধ্যাত্ম সাধনায় তিনি বিরাট সাফল্য অর্জন করেছিলেন। অতীন্দ্রিয় সাহিত্যে তিনি অতীন্দ্রিয় বাদীদের রাজা হিসাবে পরিচিত। ১২৩৮ খ্রীষ্টাব্দে নিজামউদ্দীন আউলিয়া বাদায়ুনের এক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং দিল্লীতে শিক্ষা প্রাপ্ত হন। ধর্ম পয়ায়ণতা ও সরলতার জন্য তিনি সকল শ্রেণীর লোকের প্রশংসা, প্রীতি ও শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। গুজরাট, দাক্ষিণাত্য ও বঙ্গদেশে ইসলাম প্রচারের জন্য তিনি এক দক্ষ সুফী সাধকমণ্ডলী গড়ে তোলেন। এদেশে তাঁর অনেক শিষ্য ছিলেন। ১৩২৫ খ্রীষ্টাব্দে শেখ নিজামউদ্দীন পরলোক গমন করেন। দিল্লীর অদূরে জিয়ামপুরে তাঁর মাজার রয়েছে। শেখ বাহাউদ্দীন জাকারিয়া মুলতানী ভারতে সোহরাবর্দীয়া তরিকার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। ১১৮২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মুলতানে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি বহু মুসলিম দেশ পরিভ্রমণ করেন। বাগদাদে থাকাকালীন তিনি শেখ শিহাবউদ্দীন সোহরাবর্দীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। মুলতানে ফিরে এসে তিনি সেখানে সোহরাবর্দীয়া খানকা প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁর প্রচেষ্টাতেই এই তরিকা প্রাধান্য লাভ করে। বর্তমান পাকিস্তান ও গুজরাটে ইসলাম প্রচারে সোহরাবর্দীয়া তরিকার যথেষ্ট অবদান রয়েছে। সৈয়দ জালালউদ্দীন কৈখারী সোহরাবর্দীয়া তরিকার একজন বিখ্যাত সুফী ছিলেন। তিনি সাধারণতঃ মখদুম জাহানিয়া জাঁহা নামে পরিচিত ছিলেন। সিনপুতে ইসলাম প্রচারে তিনি গুরুত্ব পূর্ণ অংশ গ্রহণ করেছিলেন। হযরত শাহ্ জালাল এই উপমহাদেশের সুফীবাদের ইতিহাসে অপর একজন বিখ্যাত লোক। শাহ জালাল শেখ শিহাবউদ্দীন সোহরাবর্দীর শিষ্য ছিলেন। সুলতান ইলতুৎমিশের রাজত্বকালে তিনি তুরস্ক হতে ভারতে আসেন। দিল্লীতে কিছুকাল অবস্থানের পর শাহ জালাল বঙ্গে এসে সিলেটে আস্তানা গাড়েন এবং সেখানে জীবনের অবশিষ্টকাল অতিবাহিত করেন। বঙ্গদেশে ইসলাম

প্রচারের জন্য তাঁর দান অপরিসীম। সুফীরা সাধারণতঃ পার্থিব জগত হতে দূরে থাকেন। কিন্তু তৎকালীন সিলেটের হিন্দু রাজা মুসলমানদের প্রতি দুর্ব্যবহার করলে হযরত শাহ জালাল তাঁর বিরুদ্ধে বাংলার সুলতান শামসউদ্দীন ফিরোজশাহের পক্ষে যুদ্ধে যোগদান করেন। তিনি সিলেটে প্রাণত্যাগ করেন (১৩৪৭ খ্রীষ্টাব্দে) এবং সেখানে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। পশ্চিম ও মধ্য এশিয়া হতে সরাসরি অথবা ভারতের বিভিন্ন অংশ হতে বহু সুফী সাধক বঙ্গদেশে আগমন করে ইসলাম প্রচারে যথেষ্ট অবদান রেখে গিয়েছেন। এই সমস্ত সুফী সাধকদের মধ্যে শেখ সারফউদ্দীন ইয়াহ্ইয়া মনিরী, শেখ আখি সিরাজউদ্দীন, শেখ আলাউল হক ও শেখ নূর কুতুব আলমের নাম এখানে উল্লেখযোগ্য। ইসলামের খেদমতে বঙ্গদেশে যে সমস্ত সুফী সাধক সংগ্রামী ভূমিকা গ্রহণ করে ছিলেন তাঁদের মধ্যে ত্রিবেনীর (হুগলীর) জাফর খান গাজী, বাগের হাটের (খুলনা) খান জাহান আলী ও শাহ ইসলাম গাজীর নাম ইতিহাসের পাতায় চিরদিন অম্লান হয়ে থাকবে।

শেরশাহ : সমীক্ষা—১২

শেরশাহ সাহসী বীর, সমর কুশলী সেনাপতি ও সমর বিজয়ী নেতা ছিলেন সন্দেহ নেই। কিন্তু শাসক হিসাবে তাঁর দক্ষতা অপরাপর গুণাবলীকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। মাত্র পাঁচ বছর রাজত্ব করে তিনি শাসন ব্যবস্থার যে উন্নতি সাধন করেছিলেন, তা ভারতের ইতিহাসে তাঁকে অমরত্ব দান করেছে। এই অল্প সময়ের মধ্যে নানা প্রকার কল্যাণমূলক সংস্কার এবং শাসনব্যবস্থার প্রতিক্ষেত্রে উন্নতি সাধন করে তিনি তাঁর অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দান করেছিলেন। পরবর্তীকালে মুঘল সম্রাট আকবর তাঁর নীতি অনুসরণ করেই অধিকতর সুদক্ষ শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনে সক্ষম হয়েছিলেন। হিন্দু ও মুসলমান প্রজা-বর্গের মধ্যে সমন্বয় সাধন করাই ছিল শেরশাহের শাসন ব্যবস্থার মূলনীতি। ঐতিহাসিকগণ তাঁর রাজত্বকালকে 'স্বর্ণযুগ' আখ্যা দিয়েছেন। ইংরেজ ঐতিহাসিক কীনি বলেন, 'কোন শাসকই এমন

কি ব্রিটিশ সরকার ও শেরশাহের নিজ হস্তে কেন্দ্রীভূত ছিল। তিনি ছিলেন রাজ্যের প্রধান শাসক, বিচারক ও সেনানায়ক। কিন্তু স্বৈততন্ত্র হলেও শেরশাহের শাসন ব্যবস্থা স্বেচ্ছাতন্ত্র ছিল না। জনকল্যাণ সাধনই ছিল শেরশাহের শাসন ব্যবস্থার মূল নীতি। প্রথম মুসলমান শাসক হিসাবে শেরশাহই সর্বপ্রথম জনসাধারণের কল্যাণ ও তাদের সমর্থনের ভিত্তিতে সাম্রাজ্য ও শাসনব্যবস্থা সংগঠনের চেষ্টা করেছিলেন। তিনি ছিলেন প্রকৃত প্রজাহিতৈষী শাসক। ডঃ কে, দত্ত বলেন, প্রজাপীড়ন না করে প্রজাদের সুখ ও সন্তোষের ওপরই তিনি নিজের মহত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। ইউরোপের ইতিহাসে অষ্টদশ শতাব্দীতে যে সকল প্রজাহিতৈষী, জ্ঞানদীপ্ত, স্বৈরাচারী শাসকের পরিচয় পাওয়া যায় ষোড়শ শতাব্দীর ভারত ইতিহাসে শেরশাহ তাদের অগ্রদূত হিসাবে নিজ পরিচয় রেখে গিয়েছেন। তাঁদের শাসন ব্যবস্থা ন্যায় নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। কেন্দ্রীয় শাসনকার্য পরিচালনার জন্য কতকগুলি বিভাগ ছিল। প্রত্যেক বিভাগে একজন করে প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন। শেরশাহ তাদের কার্যকলাপ তদারক করতেন এবং প্রজাদের উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখতেন। শাসনকার্যের সুবিধার জন্য শেরশাহ তাঁর সাম্রাজ্যকে ৪৭টি ভাগে বিভক্ত করেছিলেন। এর প্রত্যেকটিকে 'সরকার' বলা হত। প্রত্যেক সরকার কয়েকটি 'পরগণায়' বিভক্ত ছিল। ঐতিহাসিক আব্বাস সারওয়ানীর মতানুসারে সাম্রাজ্যে ১,১৩,০০০ 'পরগণা' ছিল। শেরশাহ প্রত্যেক পরগণায় একজন করে 'শিকদার, আমীন, মুন্সীফ, কোষাধ্যক্ষ ও দুজন 'কারকুন' (লেখক) একজন হিন্দী ও আর একজন ফারসী ভাষায় হিসাব লিখবার জন্য নিযুক্ত করেছিলেন। শিকদার ছিলেন পরগণার সামরিক অধিকর্তা। কেন্দ্রীয় সরকারের আদেশ কার্যকর করা এবং প্রয়োজন বোধে আমীনকে সামরিক সাহায্য দান করা ছিল তাঁর কর্তব্য। আমীন ছিলেন সর্বোচ্চ বেসামরিক কর্মচারী। তাঁর ওপর পরগণার রাজস্ব নির্ধারণ ও আদায়ের ভার ছিল। আমীন তাঁর কাজের জন্য সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট দায়ী থাকতেন। প্রত্যেক সরকারের

ওপর একজন করে 'শিকদার-ই-শিকদারান' ও মুন্সেফ ই-মুন্সিফান থাকতেন। সরকারের অধীন পরগণাগুলির শাসনকার্য পরিদর্শনের ভার ছিল তাঁদের ওপর। শেরশাহ নিজে প্রত্যেক শাসন বিভাগের কার্য পরিদর্শন করতেন। একই স্থানে অধিককাল কাজে নিযুক্ত থাকবার ফলে রাজকর্মচারীদের মধ্যে যাতে স্থানীয় প্রভাব-প্রতিপত্তি জন্মাতে না পারে, সেইজন্য তিনি প্রতি তিন বছর অন্তর তাঁদেরকে একস্থান হতে অন্য স্থানে বদলি করবার প্রথা প্রবর্তন করেছিলেন।

(২) রাজস্ব সংস্কার ঃ রাজস্ব সংস্কারেই শেরশাহের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। রাজস্ব আদায় সম্পর্কে শেরশাহ কতকগুলি যুক্তিসঙ্গত উদার নীতি অবলম্বন করেছিলেন। পূর্বে রাজস্বের পরিমাণ নির্ধারণ করবার জন্য জমি জরিপের কোন ব্যবস্থা ছিল না। 'কানুন গো' নামক রাজকর্মচারীদের মৌখিক বিবরণের ওপর নির্ভর করে জমির রাজস্বের পরিমাণ নির্ধারিত হত। কিন্তু শেরশাহ নির্ভুল জমি জরিপের ব্যবস্থা করলেন। অতঃপর জমির উৎপাদিকা শক্তি অনুপাতে বিভিন্ন খণ্ডের বিভিন্ন পরিমাণ রাজস্ব নির্ধারণ করেছিলেন। মুকাদ্দাম, চৌধুরী, পাটোয়ারী প্রভৃতি কর্মচারীর মারফৎ রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা ছিল বটে, কিন্তু প্রজাগণ সরাসরি রাজকোষে রাজস্ব জমা দিতে পারত। উৎপন্ন শস্যের এক তৃতীয়াংশ রাজস্ব হিসাবে গ্রহণ করা হত। শেরশাহ 'কবুলিয়ত' ও 'পাট্টার' প্রচলন করেন। প্রজার স্বত্বেও কর স্থির করে তিনি প্রজাকে পত্র (পট্টা) প্রদান করতেন এবং প্রজাও রাজকোষে প্রদেয় রাজকর স্বীকার করে স্বীকৃতি পত্র (কবুলিয়ত) প্রদান করত। অবশ্য মুলতান ও রাজপুতনার মরু-অঞ্চলে ভূমি পরিমাপ সম্ভব হয়নি ফলে সেই অঞ্চলে পাট্টা কবুলিয়ত প্রথাও প্রচলিত হয়নি। রাজস্ব নির্ধারণে যথা সম্ভব উদারতা প্রদর্শন করা হত। কিন্তু নির্ধারিত রাজস্ব আদায়ে কোন প্রকার বিলম্ব বা অবহেলা কোন অবকাশ ছিল না অবশ্য কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে ফসল না জন্মালে কৃষকদের রাজস্ব মকুব করা হত, এমন কি, প্রয়োজনবোধে সরকারী কোষাগার হতে ধন দানের ব্যবস্থাও ছিল। শেরশাহের এই

রাজস্ব নীতি রাষ্ট্রের সম্পদ প্রভৃতি পরিমাণে বৃদ্ধি করেছিল। পরবর্তী কালে ভূমি বণ্টন ও রাজস্ব নীতি বহুলাংশে শেরশাহ প্রবর্তিত রাজস্ব নীতির অনুসরণেই গড়ে ওঠেছিল। শেরশাহের রাজকোষ দু'ভাগে বিভক্ত ছিল—কেন্দ্রীয় রাজকোষ ও প্রাদেশিক রাজকোষ। কেন্দ্রীয় রাজকোষের আয়ের উৎস ছিল—(ক) খারাজ বা ভূমি রাজস্ব, (খ) খুমস বা লুণ্ঠিত দ্রব্যের এক-পঞ্চমাংশ, (গ) জিযিয়া কর, (ঘ) বাণিজ্য শুল্ক, (ঙ) প্রান্তীয় শুল্ক, (চ) লবণ শুল্ক, (ছ) মুদ্রাশালার আয়-টাঁকশাল, (জ) উত্তরাধিকার বিহীন মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি ও (ছ) নব নিযুক্ত কর্মচারীর প্রদত্ত উপহার। প্রাদেশিক রাজকোষের আয়ের উৎস ছিল কয়েক প্রকার স্থানীয় কর ও শুল্ক। যথা—পথকর, জলকর, যানবাহনের ওপর কর, বাস্তুভিটার ওপর কর, গৃহপালিত পশুর ওপর কর ইত্যাদি।

(৩) শুল্ক ও মুদ্রানীতির সংস্কার : শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতির জন্য শেরশাহ আন্তঃ প্রাদেশিক শুল্ক ওঠিয়ে দিয়েছিলেন। এ ছাড়া, শেরশাহ মুদ্রানীতির ও সংস্কার সাধন করেছিলেন। তিনি এক প্রকার নূতন রৌপ মুদ্রা প্রচলন করেন। উহা পরবর্তীকালে টঙ্কা বা টাকা নামে পরিচিত হয়। তাম্র নির্মিত মুদ্রা প্রধানতঃ 'দাম' নামে পরিচিত ছিল ; রৌপ্য নির্মিত ছিল বলে শেরশাহের মুদ্রা 'রূপিয়া' নামে পরিচিত। শেরশাহ মুদ্রার অর্ধাংশ (আধুলি), চতুর্থাংশ (সিকি), অষ্টমাংশ (দু-আনা), ষোড়াংশ (এক আনা) প্রচলন করেন। ভারতীয় মুদ্রার ইতিহাসে শেরশাহের মুদ্রা ধাতুর বিশুদ্ধতায়, মানের অনুপাতে, সৌন্দর্যেও অক্ষরের স্পষ্টতায় বিশিষ্টতা অর্জন করেছে। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তাঁর প্রচলিত মুদ্রাই ভারতীয় মুদ্রার আদর্শ ছিল। শেরশাহের মুদ্রার ওপরে আরবী অক্ষরে সুলতানের নাম, উপাধি, টাকশালের নাম এবং কোথাও খলিফার নামে অঙ্কিত থাকত।

(৪) জনহিতকর কার্য : সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সংযোগ স্থাপন এবং এক স্থান হতে দ্রুত অপর স্থানে যাতায়াতের সুবিধার জন্য শেরশাহ বহু সুন্দর ও প্রশস্ত রাস্তা নির্মাণ করেছিলেন। এই গুলির

মধ্যে 'গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড' নামক রাস্তাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের দৈর্ঘ্য পনেরশ মাইল এবং শেরশাহ নামকরণ করেন 'সড়ক-ই-আজম'। এই রাস্তাটি পূর্ববঙ্গের সোনার গাঁও হতে সিন্ধুদেশ পর্যন্ত একটানা চলে গেছে। পথিকদের সুবিধার জন্য শেরশাহ রাস্তার দুপাশে ছায়াদানকারী বৃক্ষ রোপন, এবং সরাইখানা স্থাপন করেছিলেন। প্রত্যেক সরাইখানায় তিনি হিন্দু ও মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করেছিলেন। সংবাদ আদান প্রদানের জন্য তিনি 'ঘোড়ার ডাক' এর ব্যবস্থা করেন। তিনি শিক্ষার উন্নতির জন্য বহু বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন।

(৫) বিচার বিভাগঃ শেরশাহ ছিলেন ন্যায়বান সম্রাট। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সুবিচারের ব্যবস্থা ও শান্তি রক্ষার প্রচেষ্টার জন্য তিনি ইতিহাসে যথেষ্ট প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন। একবার তিনি তাঁর পুত্রকেও অপরাধের জন্য শাস্তি দিয়েছিলেন। পরগণাতে অমীন দেওয়ানী মোকদ্দমা এবং কাজী ও মীর আদল ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার করতেন। সম্রাট স্বয়ং বড় বড় মোকদ্দমার বিচার পরিচালনা করতেন। দেশের আভ্যন্তরীন শান্তি ও শৃংখলা বজায় রাখার জন্য শেরশাহ পুলিশ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করেছিলেন। নিয়মিত পুলিশ ছাড়াও অধর্মীয় ও অসামাজিক কার্য কলাপের প্রতি দৃষ্টি রাখার জন্য তিনি 'মুহতাসিব' নামক এক শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগ করেছিলেন। গ্রামের মোড়লদের ওপর তিনি গ্রামের শান্তি রক্ষার ভার অর্পণ করেছিলেন। দেশের বিভিন্ন অংশের সংবাদ সংগ্রহের জন্য শেরশাহ গুপ্তচর প্রথারও প্রবর্তন করেছিলেন।

(৬) সামরিক সংস্কারঃ আলাউদ্দীন খলজীর সামরিক নীতির প্রতি শেরশাহ অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তাঁর ন্যায় তিনি ও সরাসরি প্রতিষ্ঠান গুলিকে কেন্দ্রীভূত করেছিলেন। সৈন্যগণ সরাসরি রাষ্ট্রের সংস্পর্শে থাকত। সৈন্য ও সুলতানের মধ্যে সংযোগ পূর্ণ এমন একটি সামরিক নীতি আকবরের রাজত্বকালেও আমরা দেখতে পাই না। তিনি প্রয়োজনীয় অশ্বগুলিকে চিহ্নিত করেছিলেন এবং সৈন্যদের বিচারমূলক

হাজিরা রক্ষার ব্যবস্থাও করেছিলেন। শেরশাহের সেনাবাহিনীতে প্রায় দেড় লক্ষ অশ্বারোহী এবং প্রায় অর্ধ লক্ষ পদাতিক ও গোলন্দাজ বাহিনী ছিল। সম্রাট কর্তৃক সমস্ত সৈন্য সরাসরি নিযুক্ত হত এবং তাদের ব্যক্তিগত গুণাবলী বিচার করে বেতন নির্দিষ্ট করা হত। এই সমস্ত কার্য এবং ভারতীয় সৈন্যবাহিনীকে নূতন ভাবে প্রতিষ্ঠা করবার ব্যাপার তিনি জালাল উদ্দীন খলজীর নিকট বিশেষভাবে ঋনী ছিলেন। তিনি অভিজাতগণ ও সাধারণ সৈন্যদের মধ্যে সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটিয়ে ছিলেন কেবল নিজেদের সর্দার হিসাবে নয়, সম্রাটের সেবক রূপেও তিনি তাদের উর্ধ্বতন কর্মচারীর আদেশ পালন করবার জন্যই এই নির্দেশ দান করেছিলেন। সাধারণ সৈন্য ও তাদের উর্ধ্বতন কর্মচারীদের মধ্যে সংযোগের ফলে যে সামরিক বিদ্রোহ দেখা দিত তা দমন করবার জন্যও তিনি এই নির্দেশ দান করেছিলেন। সৈন্যবাহিনীতে কঠোর নিয়ম শৃংখলার সৃষ্টি করে তিনি সৈন্যদের মধ্যে দুর্নীতি প্রতিরোধ করেছিলেন। সৈন্য বিভাগের এক অংশ 'ফৌজ' নামে অভিহিত হত এবং ফৌজদার উহার অধিনায়ক। তিনি কার্যের বিনিময়ে জায়গীর প্রদান প্রথার বিলোপ সাধন করেছিলেন। সামরিক শাসনকর্তাগণ দু বছরের অধিক কাল কোন জায়গায় থাকতে পারতেন না। আকবরের মনসব-এর ন্যায় কোন শ্রেণী বিভাগ না থাকলেও শেরশাহ ব্যক্তিগত গুণানুসারে সৈন্যদের মান নির্ণয় করেছিলেন। সুতরাং এই কথা বলা যায় যে, শেরশাহের সামরিক প্রতিষ্ঠান ছিল দক্ষতার একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত।

(৭) ধর্মীয় নীতি : ধার্মিক মুসলমান হলেও শেরশাহ ধর্মান্ধ ছিলেন না। মুসলমান শাসক হিসাবে তিনিই সর্বপ্রথম প্রজাদের সুখ সুবিধার ব্যাপার আন্তরিকতার সঙ্গে পর্যালোচনা করেছিলেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, "ন্যায়বিচার ও সহিষ্ণুতার মাধ্যমে হিন্দুদের একতাবদ্ধ করতে হবে। ব্রহ্মজিৎ গৌর ও রামসিংহকে রাষ্ট্রের গুরুত্ব পূর্ণ পদে নিযুক্ত দ্বারা তিনি হিন্দুদের প্রতি তাঁর উদার ও সহিষ্ণু মনোভাবের পরিচয় দিয়েছিলেন। হিন্দুদের জন্য তিনি স্বতন্ত্র সরাইখানা নির্মাণ করে এর দেখাশোনার জন্য ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করেছিলেন। তাই একথা

সঙ্গত নয় যে, 'শেরশাহের ধর্মীয় নীতি সংকীর্ণ ছিল'। হিন্দুদের নিকট হতে জিযিয়া কর আদায়, রাজপুতনার মন্দির ধ্বংস ও রাইসিনের পূরনমলের প্রতি তাঁর ব্যবহারের বিরুদ্ধে অধ্যাপক শর্মা যে অভিযোগ করেছেন, তা মূলতঃ সংকটজনক পরিস্থিতি ও রাজনৈতিক প্রয়োজনীয় তার জন্যই ঘটেছিল। দীর্ঘকাল রাজত্ব করতে পারলে হয়ত এই সকল নীতিরও তিনি বিলোপ সাধন করতেন। তিনি মাত্র পাঁচ বছর রাজত্ব করেছেন। এই সংক্ষিপ্ত সময় সকল ব্যাপারের প্রতি দৃষ্টিদানের পক্ষে যথেষ্ট নয়। শেরশাহের ধর্মীয় নীতি সম্পর্কে কানুনগো মন্তব্য করেছেন, হিন্দুধর্মের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ছিল সম্মানজনক নিস্পৃহতা, কিন্তু অবস্থা সূচক অপছন্দতা নয়। শেরশাহের ধর্মনিরপেক্ষতা আকবর অপেক্ষা সফল হয়েছিল। আকবর যেখানে মুসলমানদের বিরাগভাজন হয়েছিলেন, শেরশাহ সেখানে হিন্দু—মুসলমানদের মধ্যে মিলন সেতু রচনা করেছিলেন।

(৮) চরিত্র: (ক) শের শাহের চরিত্র বহুবিধ গুণাবলীতে বিভূষিত ছিল। তিনি ছিলেন সহিষ্ণু, পরিশ্রমী ও উচ্চাভিলাষী। ব্যক্তিত্ব মণ্ডিত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্য রাজকর্মচারী ও জনগণের ওপর তাঁর অসীম প্রভাব ছিল। তিনি স্বীয় ধর্মের প্রতি যেমন নিষ্ঠাবান ছিলেন পরধর্মের প্রতি তেমনি ছিলেন উদার। যোগ্য হিন্দুদেরকে তিনি শাসন ব্যবস্থায় অংশ গ্রহণের অধিকার দিয়েছিলেন। তিনি নিয়মিত নামায পড়তেন, কোরআন শরীফ পাঠ করতেন। ধর্ম প্রতিষ্ঠান ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের প্রতি তিনি সহানুভূতি প্রবণ ছিলেন। মদ খাওয়া ও ব্যভিচারকে তিনি ঘৃণা করতেন। অসামাজিক কার্যের বিরুদ্ধে তিনি কঠোর নিয়মবিধি প্রণয়ন করেছিলেন। জনগণ ও প্রজাদের প্রতি তাঁর অসীম দরদ ছিল। তাদের সুখ দুঃখ ও অভিযোগ অভাবের দিকে তিনি সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। শাসক হিসাবে তিনি চতুর ও ধূর্ত ছিলেন। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য তিনি অনেক সময় দুর্নীতি ও ধূর্ততার আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু এজন্য তাঁর চরিত্রের ওপর দোষারোপ করা যায় না। কারণ মধ্য যুগে অনুরূপ রীতি কোন অপরাধ বলে গণ্য হত না। তাঁর স্মরণ শক্তি ছিল

অসাধারণ। গুলিস্তাঁ, বোঁস্তা, সিকন্দার নামা প্রভৃতি গ্রন্থের আদ্যোপ্রান্ত তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল। (খ) সাহিত্যানুরাগী শেরশাহের শিল্পানুরাগও প্রশংসনীয়। দিল্লীর পুরোন কেল্লা ও সাসারামে তাঁর সমাধি সৌধ তৎকালীন শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন। নিজের আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা, সকলের প্রতি কর্তব্য সম্পাদনে নিরলসতা, প্রজার প্রতি বাৎসল্য হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সম ব্যবহার প্রভৃতি সদগুণের জন্য শেরশাহ ভারতের ইতিহাসে বিশেষ শ্রদ্ধার আসন অধিকার করে রয়েছেন। (গ) শেরশাহের যোগ্যতা, দক্ষতা, বিচক্ষণতা ও কল্যাণকামী প্রচেষ্টা ইতিহাসে তাঁকে অমরত্ব দান করেছে। মধ্যযুগে ভারতের ইতিহাসে বিশেষ শ্রদ্ধার আসন অধিকার করে রয়েছেন। মধ্যযুগে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক মঞ্চে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন। কিন্তু শাসনকার্যে এবং রাষ্ট্রীয় নীতিতে তিনি যে পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন তা ছিল পরবর্তী যুগের পরিণত চিন্তাধারার প্রতিচ্ছবি। সেই অনুন্নত পরিবেশ ও যুগে তিনি শাসন কার্যে যে মেধা ও বিচক্ষণতা দেখিয়েছেন, কোন সরকারই এমন কি, ব্রিটিশ সরকারও তা দেখাতে পারেন নি। আশ্চর্য দক্ষতা ও বিচক্ষণতার সঙ্গে তিনি হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করেছিলেন। সর্বভারতীয় জাতি গঠনে তাঁর এই দূরদর্শিতা ইতিহাসে তাঁকে অমর করে রেখেছে। রাজ্যজয়েই সম্রাটের সকল কৃতিত্ব নিহিত এই কথা তিনি বিশ্বাস করতেন না। সাম্রাজ্যের বৃহত্তর জনগণের মঙ্গল সাধন করে, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য সুবিচার ও নিরাপত্তাকে সুনিশ্চিত করে তিনি একজন আদর্শ শাসক ও সম্রাটের মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গিয়েছেন। ইতিহাসে মুঘল সম্রাটআকবরের শ্রেষ্ঠত্বের পশ্চাতে যে সকল পরিকল্পনা ছিল, সেই গুলির অধিকাংশই ছিল শেরশাহের অনুকরণ। সার্বিক বিচারে তিনি আকবরকে অতিক্রম করতে না পারলেও অনেক ক্ষেত্রেই তিনি আকবরের তুলনায় শ্রেষ্ঠ ছিলেন। ইতিহাসে শেরশাহ একটি উচ্চস্থানের অধিকারী। রাজনৈতিক সংস্কার ও ধর্মীয় সহিষ্ণুতার নীতির প্রবর্তন করে তিনি নিজের অজান্তেই আকবরের শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তি স্থাপন করেন।

॥ পঞ্চম অধ্যায় ॥

আকবরের ভারত-ভারত ই আকবর

(১) ভারতে আকবরের শাসন নীতি তাঁর গভীর রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচায়ক। বাবরের বাহুবলে মুঘল সাম্রাজ্যের যে ভিত্তি পত্তন হয়েছিল, আকবরের পরাক্রমে উহা সমগ্র উত্তর ভারতে এবং দাক্ষিণাত্যের অনেকাংশ পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করেছিল। দূরদর্শী আকবর বুঝতে পেরেছিলেন যে, বাহুবলে রাজ্য জয় করা যায় সত্য, কিন্তু সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করবার জন্য প্রয়োজন শাসক ও শাসিতের মধ্যে সদ্ভাব ও প্রীতির সম্বন্ধ। এর জন্য তিনি প্রজাদের বিশ্বাস ও মনোভাব রীতি নীতি ও ঐতিহ্য, ধ্যান-ধারণা ও আশা আকাঙ্খা বিবেচনা করে তাদের সহযোগিতা ও শুভেচ্ছার ভিত্তিতেই সাম্রাজ্য গঠনের চেষ্টা করেছিলেন। উদারনৈতিক ভিত্তিতে সুশাসন প্রবর্তন এবং শাসক ও শাসিতের মধ্যে অন্তরের যোগস্থাপন—এটাই ছিল আকবরের শাসন প্রণালীর বৈশিষ্ট্য। তুর্কী জাতি কর্তৃক ভারত বিজয়ের ফলে ভারতে হিন্দু মুসলিম সংস্কৃতির সমন্বয় সাধন হয়েছিল। হিন্দুগণ রাজস্ব বিভাগে কর্মচারীরূপে নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং সম্ভ্রান্ত হিন্দুগণ শাসনব্যবস্থায় যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। মুঘল শাসন ব্যবস্থাতেও হিন্দু মুসলিম ধারার সংমিশ্রণ ঘটে ছিল; কারণ মুঘল শাসন ব্যবস্থা তুর্ক-আফগান যুগের শাসন ব্যবস্থার ভিত্তিতেই রচিত হয়েছিল। স্যার যদুনাথ সরকার মুঘল শাসন ব্যবস্থাকে আরব পারসিক শাসন ব্যবস্থা নামে অভিহিত করেছেন, কিন্তু উহার পরিবেশ ছিল ভারতীয়। এই শাসনব্যবস্থাকে সুনিয়ন্ত্রিত ও সুব্যবস্থিত করবার জন্য রাজাকে সর্বদা তৎপর থাকতে হত। এই শাসন ব্যবস্থা কেবল সামরিক শক্তির ওপরই নির্ভর শীল ছিল না—শাসক ও শাসিতের সম্প্রীতি ও সদ্ভাবই ছিল এই শাসন ব্যবস্থার মূল ভিত্তি এবং প্রজার কল্যাণেই এই শাসন ব্যবস্থা

পরিকল্পিত হত। প্রজাসাধারণের ব্যক্তি স্বাধীনতা, সামাজিক রীতি নীতি ও গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার নীতি এই ব্যবস্থায় ব্যাহত হয়নি।

(২) কেন্দ্রীয় শাসনঃ সম্রাট সামরিক ও বেসামরিক শাসন বিভাগের সর্বময় কর্তা ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর ইচ্ছা ও নির্দেশ অনুসারেই শাসনকার্য পরিচালিত হত। তিনি ছিলেন একাধারে শাসক, বিচারক, সমর নায়ক ও ধর্ম সমস্যার মীমাংসক। কেন্দ্রীয় রাজতন্ত্রের ওপর শাসন বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং সম্রাটের হাতে ছিল অসীম ক্ষমতা। স্বৈরাচারী হলেও তিনি সাম্রাজ্যের বৃহত্তর অংশের মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য রাখতে হত বলে স্বাভাবিকভাবেই বিবেক তাঁর লাগাম হীন স্বেচ্ছাচারিতাকে প্রতিহত করত। তিনি সকল ধর্মের লোকদের প্রতি ধর্মীয় সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করতেন। শাসনকার্য পরিচালনার জন্য সম্রাটের মন্ত্রী পরিষদ ছিল। কিন্তু সম্রাটের কর্তৃত্বে মন্ত্রীরা কোন বাধা সৃষ্টি করতে পারতেন না। তবে প্রয়োজনে তিনি সভাসদ, আমীর ওমরাহ ও পদস্থ রাজকর্মচারীদের নিযুক্তি, বদলি, পদোন্নতি ও পদচ্যুতি সম্রাটের মর্জির ওপর নির্ভর করত। যুদ্ধ ঘোষণা কিংবা চুক্তি সম্পাদনের ব্যাপারে তিনিই ছিলেন সর্বময় কর্তা। সম্রাটের ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণের ফলেই সুষ্ঠু ও জনকল্যাণকর প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছিল। শাসন ব্যবস্থায় সম্রাটের পরেই ছিলেন ভকিল। ভকিলের যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল। তিনি সম্রাটকে পরামর্শ ও উপদেশ দিতেন। সাধারণতঃ তাঁর ওপর বিশেষ কার্যের দায়িত্ব অর্পিত ছিল না। রাজত্বের প্রথম ভাগে অভিভাবক বৈরাম খান এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মুঘল সরকারের শাসনকার্য পরিচালনার জন্য নানা বিভাগ ছিল, যথা—(ক) অর্থ নৈতিক (দেওয়ানের অধীনে), (খ) সমর বিভাগ, বেতন ও হিসাব বিভাগ (মীর বকসীর অধীনে), (গ) সম্রাটের গৃহ-বিভাগ (খান-ই-সামান এর অধীনে)। (ঘ) বিচার বিভাগ (কাজীর অধীনে), (ঙ) ধর্মীয় ও দাতব্য বিভাগ (সদর-ই-সুদূরের অধীনে), (চ) গণচরিত্র পর্যবেক্ষণ বিভাগ (মুহতাশিবের অধীনে), (ছ) অস্ত্রশস্ত্র

বিভাগ (মীর অতীস অথবা দারোগা-ই-তোপখানার অধীনে), (জ) গুপ্তচর ও ডাক বিভাগ (দারোগা-ই-ডাক চৌকীর অধীনে), (ঝ) মুদ্রা বিভাগ (রাজস্ব দারোগার অধীনে)। আকবরের রাজত্বের ন বছর হতে দিওয়ান প্রধান কর্মকর্তা হন। তিনি সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক বিভাগ শাসন করতেন এবং সমস্ত হিসাব পত্র পরীক্ষা করে দেখতেন। প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সমস্ত কর্মচারী শাসনকর্তা হতে আমিল ও পাটোয়ারী পর্যন্ত প্রত্যেকের কার্য পর্যবেক্ষণ করবার ক্ষমতাও দিওয়ানকে দেওয়া হয়েছিল। রাজস্ব ধার্য ও আদায় করবার ক্ষমতাও তাঁর ছিল। রাজস্ব সংক্রান্ত কাগজ পত্র এবং সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে চিঠি পত্রের আদান প্রদান তাঁর দফতরে ও তাঁরই তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হত। প্রত্যেক সামরিক ধর্মাধ্যক্ষ ছিলেন রাজকীয় সেনাবাহিনীর মনসবদার। বকসী ছিলেন সামরিক বিভাগের প্রধান কর্মকর্তা। সৈন্য বাহিনীর নিযুক্তি, তাদের শৃংখলা বিধান, সামরিক পরীক্ষা, অশ্বের পরিদর্শন ও নির্ধারিত সময়ে সৈন্যদের একত্রিত করা এবং অভিযানের জন্য অস্ত্রশস্ত্র বিতরণের কর্তব্য তাঁর ওপর ন্যস্ত ছিল। রাজকীয় সৈন্য বাহিনীর তিনি ছিলেন প্রধান কর্তা এবং সেই জন্য তিনি সমস্ত সামরিক ও বেসামরিক কর্মচারীদের বেতনের তালিকা পরীক্ষা করে অনুমোদন দান করতেন। সম্রাটের গৃহ বিভাগের জন্য 'খান-ই-সামান' নামক কর্মচারী নিযুক্ত হতেন এবং তাঁর ওপর সম্রাটের পরিবারের সমস্ত দায়িত্ব অর্পিত হত। দূর দেশে যাত্রা কিংবা অভিযানের সময় তিনি সম্রাটের সঙ্গে থেকে তাঁর খাদ্য, শিবির ও গুদাম তদারক করতেন। মুঘলদের আমলে এরা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সদর-ই-সুদূর ছিলেন সর্বোচ্চ বিচার কর্তা। কিন্তু সাধারণতঃ সম্রাট ছিলেন বিচার বিভাগের সর্বময় কর্তা। ফৌজদারী মামলার প্রধান বিচারক ছিলেন কাজী। তিনি ইসলামের আইনানুসারে বিচার করতেন। জনসাধারণের নৈতিক কার্য পর্যবেক্ষণ করতেন মুহতাসিব। শরীয়তের নিয়মগুলি যথাযথ পালিত হচ্ছে কি না তা লক্ষ্য করা ছিল তাঁর কর্তব্য। 'দারোগা-ই গাওসলখানা এবং আরজি মোকারব নামে কেন্দ্রীয় শাসন বিভাগের আরও দুজন প্রধান কর্মচারী

ছিলেন। প্রথমোক্ত ব্যক্তি সম্রাটের ব্যক্তিগত কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন এবং শেষোক্ত ব্যক্তি সম্রাটের আদেশ পুনরুশীলন করে সম্রাটের অনুমোদনের জন্য দ্বিতীয়বার উহা তাঁর নিকট পেশ করতেন। অন্যান্য কর্মচারীদের মধ্যে 'দারোগা-ই-ডাকচৌকি ও মীর আরজ এর নাম করা যায়। অন্যান্য আরও কর্মচারী নানা দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

(৩) প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা: শাসনকার্যের সুবিধার জন্য আকবরের সমগ্র সাম্রাজ্যকে কয়েকটি সুবা বা প্রদেশে বিভক্ত করেছিলেন। আগ্রা, দিল্লী, আজমীর, এলাহাবাদ, অযোধ্যা, আমেদাবাদ (গুজরাট), লাহোর, বঙ্গদেশ, বিহার, মালব, বেরার, খান্দেশ, আহমদ নগর, মুলতান ও কাবুল এই ১৫টি সুবায় সাম্রাজ্য বিভক্ত হয়ে ছিল। আকবরের আমলে প্রত্যেক সুবা এক একজন সুবাদারের অধীনে থাকত এবং তাঁরা সাধারণতঃ সিপাহসালার বা নাজিম নামে অভিহিত হতেন। সিপাহসালারদের ক্ষমতা ছিল অসীম। তিনি সামরিক ও বেসামরিক উভয় বিভাগের সর্বময় কর্তা ছিলেন। নিজের তত্বাবধানে তিনি কর্ম চারীদের নিয়োগ কিংবা বরখাস্ত করতে পারতেন। কিন্তু যুদ্ধ ঘোষণা বা অন্যান্য দেশের সঙ্গে সন্ধি করবার অধিকার তাঁর ছিল না। কিংবা ধর্মীয় কোন ব্যাপারেও তিনি হস্তক্ষেপ করতে পারতেন না। দিওয়ান, বকসী, সদর, আমিল, ফৌজদার, বিতিখসি, কোতোয়াল, পোদ্দার, ওয়াকেয়া-নবিশ, কাজী প্রভৃতি অনেক কর্মচারী তাঁর অধীনে কার্য করতেন। দিওয়ান ছিলেন শাসন বিভাগের প্রধান কর্তা। কখনও কখনও তিনি সুবাদারের প্রতিপক্ষ হিসাবে কাজ করতেন। এবং কেন্দ্রীয় শাসনকর্তার নিকটেই কেবল দায়ী থাকতেন। কোন কারণে দু জনের মধ্যে বিবাদ দেখা দিলে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের নিকট বিচারের দাবী জ্ঞাপন করা হত। রাজস্ব প্রশাসন ছাড়াও প্রাদেশিক শাসন বিভাগের সকল কার্যও তিনি তদারক করতেন। বকসীও তাঁদের সমমর্যাদার অধিকারী ছিলেন এবং কেন্দ্রীয় শাসন বিভাগের অনুরূপ কার্য সম্পন্ন করতেন। প্রদেশের বিচার কার্যের জন্য শাসনবিভাগ 'সদর' নিযুক্ত করতেন। কাজী ও মীর আদলগণ তাঁর অধীনে ছিলেন। আমিল ছিলেন রাজস্ব

আদায়কারী ; কিন্তু বিভিন্ন ধরনের কাজও তাঁকে করতে হত। দস্যু বৃত্তি ও অনুরূপ অন্যান্য অপরাধ দমন করে দেশে আইন ও শৃংখলা প্রতিষ্ঠা, উৎপাদনশীল ভূমির গুণাগুণ বিচার, পতিত জমির পুনরুদ্ধার, কৃষির উন্নতি, বাসাবাড়ীর ভাড়া সম্পর্কে তদন্ত বিবরণী পেশ করা এবং বাজার দর ও জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা প্রভৃতি কাজ তাঁর তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হত। প্রত্যেক সুবা আবার কতকগুলি 'সরকার' এবং প্রত্যেক সরকার কতকগুলি পরগণা বা মহলে বিভক্ত ছিল। সরকার ছিল আধুনিক যুগের জেলার ন্যায় এবং এর শাসন কর্তা ছিলেন ফৌজদার। সুবাদার কর্তৃক তিনি নিযুক্ত হতেন এবং সামরিক ও বেসামরিক দায়িত্ব তাঁর ওপর অর্পিত ছিল। জেলার শাসন শৃংখলা রক্ষার জন্য তিনি দায়ী থাকতেন। বিতিখসি আমিলের সমপর্যায়ভুক্ত ছিলেন এবং তাঁকে নিয়ন্ত্রণ করে রাখতেন। কোতোয়াল ছিলেন প্রকৃতপক্ষে একজন পুলিশ কর্মচারী। সুতরাং অপরাধীকে শাস্তি দান ও অপরাধ দমন করা, অপরাধীদের সম্পর্কে বিবরণ সংগ্রহ করা এবং জনসাধারণের জীবন ও সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করা তাঁর অবশ্য কর্তব্য ছিল। চুরি ডাকাতি বন্ধ করবার জন্য রাত্রিতে তিনি ঘুরে বেড়াতেন এবং নবগতাদের গতিবিধির ওপর লক্ষ্য রাখতেন ও জিনিস পত্রের ওজন ঠিক আছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখতেন। এই সকল কর্তব্য সম্পাদন করবার জন্য তাঁর অধীনে অনেকগুলি কর্মচারী থাকত। পোদ্দার ছিলেন কোষাগারের কর্মচারী। কৃষকদের নিকট হতে টাকা গ্রহণ করা এবং রাজকীয় কোষাগারে ঐগুলি তালা বন্ধ করে রাখা ছিল তাঁর কর্তব্য। দিওয়ানের লিখিত অনুমতি ব্যতীত তিনি কোন টাকা কাউকেও দিতে পারতেন না। ওয়াকেয়া-ই-নবিশ ছিলেন ঘটনাবলীর দলিল রক্ষক। সিপাহসালার বিচার সভায় বসলে তিনি ও তাঁর পাশে আসন গ্রহণ করতেন এবং কার্যাবলীর সারাংশ লিখে কেন্দ্রীয় শাসন বিভাগে প্রেরণ করতেন। এতদ্ব্যতীত কারকুন, কানুনগো, মুকাদ্দম, পাটোয়ারী প্রভৃতি কর্মচারী নানা কাজে নিযুক্ত ছিলেন। সম্রাট ছিলেন বিচার বিভাগের সর্বময় কর্তা। তিনি প্রধান

কাজী (সদর-ই-সুদুর) নিযুক্ত করতেন এবং অন্যান্য অধীন কাজী প্রধান কাজীগণ দ্বারা নিযুক্ত হতেন। কাজী, মুফ্‌তী ও মীর আদলের সাহায্যে প্রধান কাজী বিচার কার্য সম্পন্ন করতেন। মুফতী আইনের ব্যাখ্যা দিতেন। কাজী শরীয়তের ব্যাখ্যা অনুযায়ী বিচার করতেন এবং মীর আদল বিচারের রায় দিতেন। মুসলিম আইনানুযায়ী কাজী উত্তরাধিকার, বিবাহ তালাক প্রভৃতি বিষয়ের বিচার করতেন। আইনের চক্ষে সকলেই সমান ছিল এবং বিচার কার্যে ন্যায়, সততা ও নিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণ করা হত।

(৪) রাজস্ব ব্যবস্থা :—ভূমি রাজস্ব নীতি সম্রাট আকবরের সর্বাপেক্ষা বড় কৃতিত্বের পরিচয় বহন করে। অর্থবিভাগের সুবন্দোবস্ত দ্বারা তিনি সাম্রাজের বুনিয়াদকে সুদৃঢ় করেছিলেন। আকবর সরকারের আয়ের প্রধান উৎস ছিল ভূমি রাজস্ব, বাণিজ্য শুল্ক, টাঁকশাল, উত্তরাধিকার স্বত্ব, লুণ্ঠিত দ্রব্য ও ক্ষতিপূরণের অর্থ, উপঢৌকন প্রভৃতি। এই সকলের মধ্যে ভূমি রাজস্ব ছিল রাষ্ট্রের আয়ের প্রধানতম উৎস। ভূমি রাজস্বের ক্ষেত্রে শেরশাহের কৃতিত্ব ছিল সর্বাপেক্ষা বেশী এবং তাঁকে এই ব্যাপারে আকবরের পূর্বসূরী-বলা যায়। তিনি শৃংখলার সঙ্গে কৃষিভূমি জমি জরিপ করেছিলেন এবং তাঁরই প্রতিষ্ঠিত রীতিকে আকবর যথাযথ রূপদান করেছিলেন। সিংহাসনে আরোহণ করবার পর আকবর শেরশাহের কার্য পুনরারম্ভ করেন এবং মুজাফফর তারবাতি ও রাজা টোডরমলের ন্যায় সুযোগ্য দেওয়ানের সাহায্যে উহার যথেষ্ট উন্নতি বিধান করেন। রাজস্ব বিভাগে টোডরমল ছিলেন একজন যোগ্যতম ব্যক্তি। শেরশাহের আমলে এই কাজ করে তিনি প্রভূত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। তিনি সমগ্র আবাদী জমি জরীপ বা পরিমাপ (পায়মাইস) করার ব্যবস্থা করেন। শেরশাহের আমলে জরীপে শনের দড়ি ব্যবহার করা হত। অধিক তাপে বা স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায় সেই দড়ি সঙ্কুচিত বা সম্প্রসারিত হত। ঈশ্বরী প্রসাদের মতে, টোডরমল এর পরিবর্তে বাঁশের দ্বারা জরীপের ব্যবস্থার প্রচলন করেন। এই বাঁশের দু দিকে লোহার আংটা দ্বারা বাঁধা হত। প্রতি

বিঘার উৎপাদনের গড় নির্ণয় করবার জন্য জমি চারভাগে ভাগ করা হয়েছিল, যথা—পোলাজ যা সর্বদা আবাদ হত এবং কখনও পড়ে থাকত না)। পরৌতি (উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য যা বছরে কিছুকাল পড়ে থাকত), চাদার (যা তিন-চার বছর ধরে পড়ে থাকত) এবং বনযার (পাঁচ বছর বা ততোধিক কাল যা পড়ে থাকত)। প্রথম দু শ্রেণীর জমির আবার তিনটি পর্যায় ছিল, যথা উত্তম, মধ্যম এবং নিকৃষ্ট। প্রতি বিঘার উৎপাদিত শস্যের দ্বারা এই তিন পর্যায়ের ভূমির গড় নির্ণয় করা হত এবং এক তৃতীয়াংশ খাজনা হিসাবে গ্রহণ করা হত। এই হিসাবেই জমির খাজনার পরিমাণ নির্ধারণ করা হত। অন্য দু শ্রেণীর জমি সম্পর্কে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা ছিল। আবাদী জমির ওপরই কর ধার্য করা হত। করদাতাগণ ইচ্ছানুযায়ী নগদ অর্থ বা দ্রব্যের বিনিময়ে কর প্রদানকরতে পারত। অবশ্য সম্রাট নগদ অর্থ গ্রহণই পছন্দ করতেন। শস্যের বিভিন্নতা অনুযায়ী করেরও পার্থক্য ছিল। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, বালি এবং গমের কর নীল ও ইক্ষুর করের সমান ছিল না। গুজরাটে এই নীতি প্রথম প্রবর্তন করেন রাজা টোডরমল এবং পরবর্তী কালে মুঘল সাম্রাজ্যে ত্রুটি আদর্শ নীতি হিসাবে গৃহীত হয়। একে 'যবতী' ধরণের রাজস্বনীতি বলা হয়। বিদর, এলাহাবাদ, অযোধ্যা, আগ্রা, দিল্লী, মালব মুলতানে এবং গুজরাটের কয়েকটি প্রদেশে এই নীতি ব্যাপক ভাবে প্রচলিত ছিল। অন্যান্য কর নীতির মধ্যে 'গালাবক্স' এবং নামাখ উল্লেখযোগ্য। প্রথমোক্ত নীতি শস্য বিভাগের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং নিম্ন সিন্ধু ভূমি, কাবুলের একাংশ ও কাশ্মীরে এই নীতি প্রচলিত ছিল। শেষোক্ত নীতিতে রায়ত এবং রাষ্ট্রের মধ্যে কোন মধ্যবর্তী ব্যক্তি ছিল না। শাসন বিভাগ সরাসরি কৃষকদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল। প্রথমে উহা একটি বার্ষিক ব্যবস্থা ছিল, পরে উহা দশ শালা বন্দোবস্তে পরিণত হয়। কতকগুলি অন্যায় করের বিলোপ সাধন করা হয় এবং অন্যায় কর আদায় করা হলে কৃষকগণ সম্রাটের নিকট হতে উদ্বৃত্ত লাভ করত। অনেক ব্যাপারে প্রজাদের কর হতে

অব্যাহতি দেওয়া হত। বিশেষতঃ যখন বন্যা অথবা অন্যান্য দুর্যোগের জন্য জমির ক্ষতি হত, তখন কর মকুব করা হত। সার প্রয়োজন হলে বীজ ও কৃষিযন্ত্র ক্রয় করবার জন্য 'তাকাভি' ঋণ দেওয়া হত এবং কিস্তি অনুসারে তা আদায় করা হত। কেন্দ্রের প্রধান দেওয়ানের নিকট আমিল রাজস্ব প্রেরণ করতেন এবং তাঁকে বিতিখসি, পোদ্দার, কানুন গো, পাটোয়ারী, মুকাদ্দম প্রভৃতি কর্মচারীগণ সাহায্য করতেন। রায়তদের সদয় ব্যবহার করবার জন্য রাজস্ব কর্মচারীদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল এবং অভাবের দিনে রাজস্ব আদায় করতে জোর জুলুম না করবার জন্যও আদেশ দেওয়া হয়েছিল। আকবরের রাজস্ব নীতি সম্পর্কে ডঃ স্মিথ বলেন, "সংক্ষেপে বলতে গেলে শাসন ব্যবস্থা ছিল প্রশংসনীয়, নিয়মকানুন ছিল সুষ্ঠু এবং কর্মচারীদের প্রতি সদয় হতে যে আদেশ দেওয়া হয়েছিল, তা সত্যই উল্লেখ যোগ্য।" আকবরের রাজস্ব নীতি সুফল দান করেছিল। এর দ্বারা রাষ্ট্র ও কৃষককুল উভয়ই লাভবান হয়েছিল। রাষ্ট্রের চাহিদার অংশ নির্দিষ্ট হওয়ায় ভূমি-রাজস্বের পরিবর্তন ঘটত না এবং রাজস্ব কর্মচারীদের দুর্নীতি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এই রাজস্ব নীতি এলে রাজকোষের অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং সম্রাট বিভিন্ন জনকল্যাণ মূলক কার্যে অর্থ ব্যয় করেন। এতে কৃষকরাও সমৃদ্ধ শালী হয়ে ওঠেছিল।

(৫) সামরিক বিভাগঃ—আকবর যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন নির্দিষ্ট কোন রাজ্য তাঁর ছিল না। পৈতৃক সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করা নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা এবং সাম্রাজ্যে আইন ও শৃংখলা বজায় রাখার জন্য তাঁর একটি সুসংগঠিত সৈন্য বাহিনীর প্রয়োজন ছিল। রাজকীয় সৈন্য বাহিনী তখন (১) পদাতিক (২) অশ্বারোহী (৩) গোলন্দাজ ও (৪) নৌ বাহিনী এই চার ভাগে বিভক্ত ছিল। পদাতিক বাহিনী বন্দুক ধারী (বন্দুক চিস) তরবারির যোদ্ধা (সামাশের বায), প্রাসাদের দ্বাররক্ষী (দারোয়ান), প্রাসাদের প্রহরী (খিদমতিয়া) কুস্তিগীর (পালোয়ান) এবং পালকী বাহক (কার) নিয়ে গঠিত ছিল। সকল লোককে পদাতিক বাহিনীতে

নিয়োগ করা হত। বর্তমান কালের পদাতিক বাহিনী ও মুঘল আমলের পদাতিক বাহিনী এক নয়। সম্রাট নিজেই প্রধান সেনাপতি হিসাবে কাজ করতেন এবং তাঁর অধীনে 'সিপাহসালার' নামে অনেক সেনাপতি ছিলেন। রাজকীয় বাহিনীর মধ্যে অশ্বারোহী ছিল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ শাখা। মনসবদারী প্রথা অশ্বারোহী বাহিনীর সুন্দর একটি প্রতিষ্ঠান ছাড়া আর কিছুই ছিল না। অশ্বারোহী বাহিনীর প্রতি আকবরের দৃষ্টি ছিল এবং এই বাহিনীকে অত্যন্ত সুদক্ষ একটি সৈন্যদল গড়ে তোলার জন্য তিনি প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এই উদ্দেশ্যেই তিনি দাস প্রথা ও সৈন্যদের বিস্তৃত তালিকা প্রণয়নের রীতি প্রবর্তন করেন। আকবর নিজেই রাজকীয় অশ্বশালা পরিদর্শন করতেন এবং কোথায়ও অসন্তোষ জনক অবস্থা পরিলক্ষিত হলে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের পদচ্যুত করতেন। গোলন্দাজ বাহিনীকে তোপখানা বলা হত। সম্রাট বাবর উত্তর ভারতে এটি প্রথম প্রবর্তন করেন। সম্রাট হুমায়ুনের বিপুল সংখ্যক গোলন্দাজ ছিল। হুমায়ূনের সমসাময়িক ও প্রতিদ্বন্দ্বী গুজরাটের বাহাদুর শাহ শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে গোলন্দাজ বাহিনী নিয়োগ করতেন। বিদেশ হতে ক'মান আমদানী করা হত এবং পরে ভারত বর্ষেও এটি তৈরী করা হত। কিন্তু কামান সমূহ অত্যন্ত ভারী হওয়ায় একস্থান হতে অন্য স্থানে পরিবহন করতে অসুবিধা হত। এইজন্য আকবর যতদূর সম্ভব হালকা কামান তৈরী করার চেষ্টা করেন। গোলন্দাজ বাহিনীর প্রধান কর্মচারীকে আতশ বা দারেগা-ই-তোপখানা বলা হত। তাঁর কাজে সাহায্য করতেন 'মুশফিক' নামে একজন গুরুত্বপূর্ণ কর্মচারী। আকবর আরাকানের মগ এবং পর্তুগীজদের হাত হতে উপকূল ভাগকে রক্ষা করার জন্য একটি নৌবহর নির্মাণ করেন। আমীর-উল-বাহার নামে একজন উচ্চ পদ সহ কর্মচারীর অধীনে ঐ নৌ বিভাগ ন্যস্ত ছিল। এই ঐ বহরের প্রধান কাজ ছিল হস্তী বাহিনীকে নদী পার হতে সাহায্য করা এবং নদীপথে সৈন্য বাহিনীর যাতায়াতের ব্যবস্থা করা। সম্রাট আকবর আমীর-উল-বাহারকে তাঁর বিভাগের প্রয়োজনীয় ব্যয় ভার

বহনের জন্য অনেকগুলি পরগণা দান করেছিলেন। তিনি জাহাজ নির্মাণ শিল্পে যথেষ্ট উৎসাহ দিতেন। ফলে লাহোর, এলাহাবাদ, কাশ্মীর, বঙ্গদেশ ও খাট্টায় প্রধান জাহাজ নির্মাণ কেন্দ্র গড়ে ওঠেছিল। আকবরের একটি হস্তীদলও ছিল। তিনি হস্তী অত্যন্ত পছন্দ করতেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে হস্তী ব্যবহার করতেন। সম্রাট নিজে যে সমস্ত হস্তী ব্যবহার করতেন সেগুলিকে 'খাসা' (বিশেষ) বলা হত এবং দশ বিশ অথবা ত্রিশটি হস্তী দ্বারা গঠিত অন্যান্য হস্তী বাহিনীকে 'হালকা' (বৃত্ত) নামে অভিহিত করা হত। কোন কোন মনসবদারদের নির্দিষ্ট সংখ্যক অশ্ব ছাড়াও কিছু সংখ্যক হস্তীও রাখতে হত। প্রত্যেক হস্তীর আলাদা নাম ছিল।

(৬) মনসবদারী প্রথা ঃ আকবরের সামরিক প্রশাসনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল মনসবদারী প্রথা। মনসবদারদের ওপর অশ্বারোহী বাহিনীর নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব ছিল। মুঘল সমর বিভাগের প্রাণকেন্দ্র ছিল অশ্বারোহী বাহিনী। কেন্দ্রীয় রাজকীয় বাহিনীতে সুবিশাল সৈন্য বাহিনীর ব্যয়ভার পোষণ করা কষ্টসাধ্য ছিল বলে মনসবদারদের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সংখ্যক অশ্বারোহী সংগ্রহ করা হত। আকবরের শাসনামলের পূর্বে সেনাবাহিনীর অবস্থা খুব সন্তোষজনক ছিল না। তখন জায়গীরদাররা সম্রাটকে সৈন্য সরবরাহ করতেন। কিন্তু এই ব্যবস্থা ছিল ত্রুটি পূর্ণ এবং এতে সেনাবাহিনীর মানের অবনতি ঘটে। কাজেই আকবর সেনাবাহিনী সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। এতদুদ্দেশ্যে সম্রাট আকবর একটি নূতন পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। নূতন পরিকল্পনার ভিত্তিতে সামরিক সংস্কারের জন্য ১৫৭১ খ্রীষ্টাব্দে শাহবাজ খানকে প্রধান সামরিক কর্মকর্তা (মীর বকসী) নিয়োগ করা হয়। মনসব শব্দের অর্থ পদ, মর্যাদা বা অফিস। কোন বিশেষ পদ মর্যাদার অধিকারী কিংবা অফিসের কর্মকর্তাকে মনসবদার বলা হত। মনসবদারগণকে বিভিন্ন পদমর্যাদায় বিভক্ত করা হয়েছিল। প্রত্যেক মনসবদার তাঁর পদ মর্যাদানুযায়ী রাষ্ট্রকে সামরিক সাহায্য প্রদানে বাধ্য ছিলেন। আবুল ফজলের বর্ণনায়

৬৬ রকমের মনসবদারের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ৩৩ রকমের বেশী মনসবদার ছিলেন না। সর্বনিম্ন পর্যায়ের একজন মনসবদারের অধীনে সৈন্য সংখ্যা ছিল ১০ জন। সর্বোচ্চ পদমর্যাদা সম্পন্ন একজন মনসবদারের অধীনে ১০ হাজার সৈন্য থাকত। রাজ-পরিবারের ব্যক্তিরা ৪,০০০ হতে ১০,০০০ সৈন্যের মনসবদারী লাভের যোগ্য বিবেচিত হতেন। তবে রাজা টোডরমল, মানসিংহ, মীর্জা শাহকখ ও কুলিচ খানের ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা শিথিল করা হয়েছিল। রাজপরিবার ভুক্ত না হওয়া সত্বেও তাঁরা প্রত্যেকে ৭,০০০ সৈন্যের মনসবদার ছিলেন। রাজকোষাগার হতে মনসবদারগণকে নিয়মিত বেতন দেওয়া হত। সেই বেতন হতে তাঁরা নির্দিষ্ট সংখ্যক অশ্ব, হস্তী ও ভারবাহী পশু পদমর্যাদানুযায়ী প্রতিপালন করতেন। তাঁদের নিযুক্তি, পদোন্নতি ও পদচ্যুতি সম্রাটের বিবেচনার ওপর নির্ভর করত। এই পদ বংশগত নয়, ব্যক্তিগত ছিল। ক্ষমতা ও সামরিক গুণের ভিত্তিতেই এই পদ দেওয়া হত। আকবরের সময় তিন হাজারের ওপরের মনসবদার এবং পরবর্তীকালে ৫ শোর ওপরের মনসবদারে তুটি পদ ছিল, যথা— ৭৫০ জাট ও ৫০০ সওয়ার। জাট ও সওয়ারের পার্থক্য সম্বন্ধে ডঃ ঈশ্বরীপ্রসাদ বলেন, 'জাট ছিল মনসবদারগণের ব্যক্তিগত পদ। কিন্তু এর সঙ্গে যুক্ত কতকগুলি উদ্বৃত্ত ঘোড়সওয়ারের একজন পরিচালক আলাদা ভাতা পেতেন এবং তাঁকে সওয়ার বলা হত।' যে সকল মনসবদারের জাট ও সওয়ারের সংখ্যা সমান (২০০০ জাট ও ২০০০ সওয়ার) ছিল তাঁরা প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত ছিলেন, যাদের সওয়ার জাটের অর্ধেক (২০০০ জাট ও ১০০০ সওয়ার) তাঁরা দ্বিতীয় শ্রেণী এবং যাঁদের সওয়ার জাটের অর্ধেকেরও কম (২০০০ জাট ও ৫০০ সওয়ার) তাঁরা তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। এই প্রথার তুর্নীতি দমন করে আকবর এর উন্নতি বিধান করবার জন্য বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করেছিলেন। প্রায় অনেক ব্যাপারে কর্মচারীগণ মিথ্যা সৈন্য সংখ্যা দেখিয়ে ভাতা গ্রহণ করত। সম্রাটকে ফাঁকি দিয়ে তারা অন্যায়ভাবে ভাতা গ্রহণ করত। এই তুর্নীতি দমন করবার জন্য

সুলতান আলাউদ্দীন ও শেরশাহ প্রবর্তিত রীতি অনুসারে সম্রাট আকবর অশ্বগুলিকে চিহ্নিত করেন এবং সৈন্যদের ও পশুদের বর্ণনা-মূলক সংখ্যা গণনা নীতির প্রবর্তন করেন। এই সৈন্যতালিকা সরকারের নিকট জমা দিতে হত। অশ্বচিহ্নিত করণের জন্য স্বতন্ত্র একটি বিভাগ সৃষ্টি করে বকসী ও দারোগার ওপর এর তত্ত্বাবধানের ভার দেওয়া হয়েছিল। আকবরের পূর্বে সেনাবাহিনীতে জায়গীর প্রথার প্রচলন ছিল। জায়গীরদারগণ নিজস্ব এলাকায় সংগৃহীত রাজস্ব দ্বারা নিজেদের বেতন গ্রহণ করতেন। কিন্তু সম্রাট আকবর জায়গীর ব্যবস্থার পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি মনে করতেন যে, একটি জায়গীর রাষ্ট্রের মধ্যে আর একটি রাষ্ট্র বিশেষ। তাই তিনি জায়গীর প্রথা বিলুপ্ত করেন এবং সকল জমি রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে (খালসা) রূপান্তরিত হয়। তিনি মনসবদারদের জমির পরিবর্তে নগদ বেতন দিতেন। এই ব্যবস্থার ফলে রাষ্ট্রের আয় বৃদ্ধি পায় এবং রায়তদের ওপর মনসবদারদের অত্যাচার হ্রাস পায়। মনসবদারী প্রথার ফলে শাসন বিভাগ ছাড়াও বিরাট সৈন্য বাহিনী প্রতিপালন করবার সুবিধা হয়েছিল। সাম্রাজ্যের কোন অংশে গোলযোগ দেখা দিলে কেন্দ্রের সাহায্যের জন্য অপেক্ষা না করে সংশ্লিষ্ট অঞ্চল হতে সৈন্যবাহিনী সংগ্রহ করে বিদ্রোহ দমন করা হত। তাছাড়া, প্রত্যেক মনসবদার আপন জাতি হতে নিযুক্ত করা হত। সুতরাং এই নীতির ফলে অধিনায়কগণ তাঁদের দলের আনুগত্য আদায় এবং সৈন্য বাহিনীর একতা ও সংহতি রক্ষা করতে পারতেন। গুণ ও ক্ষমতার ভিত্তিতে পদোন্নতি হত বলে প্রত্যেক দল যুদ্ধে জয়ী হবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করত। এতে সামরিক দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। দলগত ভিত্তির ওপর মনসবদারী প্রথা প্রতিষ্ঠিত হবার ফলে সৈন্য বিভাগে বিভিন্ন দলের মধ্যে ঈর্ষা ও বিরোধিতা দেখা দিয়েছিল এবং ক্রমে উহা মুঘলদের সামরিক শক্তিকে দুর্বল করে ফেলেছিল। মনসবদারগণকে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে কার্যে নিযুক্ত করা হত এবং সৈন্যদের শৃঙ্খলা ও প্রয়োজন মেটাবার দায়িত্ব তাঁদের ওপর অর্পিত ছিল বলে কেন্দ্রের সঙ্গে সম্পর্কের চরম অবনতি ঘটেছিল।

কেন্দ্রীয় শাসনের দুর্বলতার সুযোগে শক্তিশালী মনসদারগণ তাঁদের সৈন্যবাহিনীসহ সিংহাসনের প্রতিদ্বন্দ্বী দাবিদারগণের পক্ষ অবলম্বন করতেন। মনসবদারগণ ব্যতীত দাখিলি ও আহাদি নামে আরও দুটি সৈন্য বাহিনী ছিল। মনসবদারগণের অধীনে দাখিলীগণ একটি নির্দিষ্ট স খ্যক সৈন্যবাহিনী গঠন করত এবং রাষ্ট্র কর্তৃক তাদের বেতন দেওয়া হত। আহাদিগণ নিজেরাই একটা দল গঠন করত। দেহরক্ষী হিসাবে কাজ করবার জন্য সম্রাট তাদের নিযুক্ত করতেন। আহাদিদের জন্য পৃথক দফতর (দেওয়ান) বেতনদাতা (বক্সী) থাকত। সাধারণ সৈন্য অপেক্ষা তাদের বেতন বেশী ছিল।

(৭) সংস্কার কার্য ঃ—আকবরের দৃষ্টি কেবল কোন এক বিশেষ বিভাগে সীমাবদ্ধ ছিলনা, বরং শাসন বিভাগের প্রত্যেক স্তরকে তা স্পর্শ করেছিল তিনি ছিলেন একজন বড় সংস্কারক। শাসন ব্যবস্থায় ও সামাজিক ক্ষেত্রে তিনি অনেক সংস্কার সাধন করেছেন। তিনি যুদ্ধবন্দীদের দাস করবার প্রথা বিলোপ করেছিলেন এই মর্মে আদেশ দান করেছিলেন যে, বিজয়ী সৈন্য বাহিনীর কোন সৈন্য বিজিত সৈন্যদের স্ত্রী পুত্রের ওপর কোন প্রকার অত্যাচার করতে পারবে না। হিন্দু তীর্থ যাত্রীদের ওপর হতে তিনি কর উঠিয়ে দিয়েছিলেন এবং ১৫৬৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জিযিয়া করের বিলোপ সাধন করেন। আলাউদ্দীন খলজী ও শেরশাহের পথ অনুসরণ করে তিনি অশ্বকে চিহ্নিত করবার প্রথার প্রচলন করেন। ফলে সৈন্য বিভাগের দুর্নীতি বন্ধ হয়। মুদ্রা ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করে তিনি বহু সংখ্যক স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্রমুদ্রার প্রচলন করেন। নিখুত ধাতু ও সঠিক ওজনের দ্বারা তিনি মুদ্রা খোদাই করে ছিলেন

আকবর দলিল বিভাগ সংগঠিত করেন এবং ফতেপুর সিক্রীতে দলিল-গৃহ নির্মাণ করেন। হিন্দুদের কয়েকটি সামাজিক রীতি আকবরের নিকট নিষ্ঠুর ও অবিজ্ঞ জনোচিত মনে হয়েছিল। সংস্কারকের মনোবৃত্তি নিয়ে তিনি এগুলির ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেছিলেন। ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ কোন নারীকে স্বামীর চিতায় পুড়িয়ে মারতে পারবেনা—এই মর্মে

সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে তিনি এক আদেশ জারী করেছিলেন। বিধবাদের পুনর্বিবাহের প্রয়োজন তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি বাল্যবিবাহ বন্ধ ও বিধবাদের পুনর্বিবাহ অনুমোদন করেন।

(৮) ধর্মীয় নীতি :—আকবর ছিলেন একনিষ্ঠ সুন্নী মুসলমান। আল্লাহ্র উপাসনায় তিনি মাঝে মাঝে সারা রাত্রি অতিবাহিত করতেন এবং শরীয়তের অনুশাসনের বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটতে দিতেন না। উলেমাদের তিনি সম্মান করতেন এবং নির্ভিক ব্যক্তিদের প্রতি সকল সময় সশ্রদ্ধ ছিলেন। পীর ও ফকীরদের প্রতি তাঁর বিশ্বাস ছিল এবং প্রায়ই তাঁদের আস্তানায় তিনি যাতায়াত করতেন। মুসলমান প্রজাদের ইসলামের ধর্মস্থানে তীর্থ করতে যাবার জন্য তিনি উৎসাহ দিতেন ও রাজকোষাগার হতে অর্থ দান করতেন। এই সম্বন্ধে ঐতিহাসিক বাদাউনী লিখেছেন যে, আকবর প্রায়ই সকাল বেলায় ফতেপুর রাজ প্রাসাদের নিকটবর্তী একটি পুরাতন ভবনের সম্মুখে একখানা পাথরের ওপর বসে আল্লাহ্ তায়ালার চিন্তায় মগ্ন থাকতেন। মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ দেখে তিনি অন্তরে খুবই ব্যথা অনুভব করতেন। সুন্নী, শিয়া মাহদী ও সুফীদের মধ্যে মতবিরোধ লেগেই থাকত এবং প্রায় তারা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করত। তিনি এই সমস্ত বিরোধের অবসান ঘটিয়ে বিবাদমান ধর্মমতগুলির মধ্যে একটি সংযোগ সাধনের আশা করতেন। গোঁড়ামী তাঁর ভাল লাগত না। তিনি সত্যের সন্ধান করতে লাগলেন। ১৫৭৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি একজন গোঁড়া সুন্নী মুসলমান হিসাবে জীবন যাপন করেন এবং এর পর তাঁর ধর্ম চিন্তায় পরিবর্তন দেখা দেয়। আকবরের ধর্ম সংস্কারের ইতিহাস জানতে হলে তদানীন্তন পরিবেশ ও পরিস্থিতি সম্পর্কে মোটামুটি জ্ঞান রাখা দরকার। তাঁর পিতা ও পিতামহ গোঁড়া মুসলমান ছিলেন না। তাঁর মাতা হামিদা বানু বেগম ও গৃহশিক্ষক মৌলবী আবদুল লতিফ ছিলেন উদার মতাবলম্বী। শিক্ষক আবদুল লতিফের জীবনের নীতি ছিল 'সুল্‌হ-ই-কুল' অর্থাৎ বিশ্বজনীন সহিষ্ণুতা। তিনি তাঁর ছাত্রের মধ্যে এই ধারণার জন্ম দিয়েছিলেন এবং উদার নীতির মূল্যবোধ জাগিয়ে

তুলেছিলেন। সুতরাং পূর্ব পুরুষ ও শিক্ষকের প্রভাব আকবরের ধর্মাদর্শ ও মানসিকতাকে গড়ে তুলেছিল। পৃথিবীর ইতিহাসে ষোড়শ শতাব্দী ছিল ধর্মান্দোলন ও অনুসন্ধিৎসার যুগ। ভারতবর্ষ কবীর নানক, শ্রীচৈতন্য প্রমুখ মহাপুরুষগণের মধ্যে এই ধর্মান্দোলনের আদর্শরূপ দর্শন করেছিল। তাঁরা প্রেম ও এক মহান সত্য ও বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ববোধের বাণী প্রচার করেছিলেন। এই সকল ধর্মনেতার চিন্তাধারা সম্রাট আকবরের মনকে প্রভাবিত করেছিল। ভক্তি ও মাহদা আন্দোলন তখন জনসাধারণের মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। হাজার বছরের শেষভাগে পাপ পঙ্ক হতে মানুষকে উদ্ধার করবার জন্য একজন 'মসিহ' পৃথিবীতে আবির্ভূত হবেন। এটাই ছিল মাহদী পন্থীদের বিশ্বাস। ভারত উপমহাদেশে জৌনপুরের সৈয়দ মোহাম্মদ এই আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন এবং নিজেকে তিনি সেই 'মাহদী' (ত্রাণকর্তা) বলে ঘোষণা করেছিলেন। আফগানিস্তানেও অনুরূপ রাসনী আন্দোলন দেখা দিয়েছিল। রাসনীগণও একজন মসিহ বা উদ্ধারকর্তার আবির্ভাবকে বিশ্বাস করত। বিভিন্ন পয়গম্বরের অধীনে এই ধর্মান্দোলন পরিচালিত হয়েছিল এবং এটি আকবরের মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করে থাকতে পারে। কিন্তু তিনি তাঁদের একজনকেও পয়গম্বর মনে করতেন না। যদি তাঁরা পয়গম্বর হন তা হলে তিনিও একজন পয়গম্বর এবং তিনিও ধর্ম প্রচার করতে পারেন—ক্রমে এই ধারণা তাঁর মনে উদিত হল। এই উপমহাদেশে আকবর এক অখণ্ড সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। এই দেশে হিন্দুগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল বলে হিন্দুদের প্রতি তিনি সহিষ্ণুতার নীতি গ্রহণ করেছিলেন। হিন্দুদের বন্ধুত্ব অর্জন করবার জন্য তিনি তীর্থকর ও জিযিয়াকর মকুব করেছিলেন এবং ঠিক একই কারণে রাজপুত রমণীকে তিনি বিবাহ করেছিলেন। তাঁর হিন্দু পত্নীরা রাজ অন্তঃপুরে হিন্দুদের কতকগুলি সামাজিক রীতি নীতি ও অনুষ্ঠানের প্রচলন করেছিলেন। সুফী ভ্রাতৃদ্বয় (ফৈজী ও আবুল ফজল) ও তাঁদের পিতার সঙ্গে সাহচর্যের ফলে আকবরের ধর্মজীবন বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। 'অসাধারণ

বুদ্ধি, সতর্ক মন, অনুসন্ধিৎসা ও বংশগত মর্যাদা, উন্নত শিক্ষা এবং সৎ সংসর্গের ফলে আকবর তদানীন্তন যুগের আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসা—প্রবণতাকে সম্যক উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তিনি শুধু তাঁর যুগের সন্তান ছিলেন না, তিনি ছিলেন এর শ্রেষ্ঠ প্রতীক।' শেখ মোবারকের পুত্র আবুল ফজলের রাজসভায় আগমনের সঙ্গে সঙ্গে দর্শন ও ধর্মীয় আলোচনার জন্য আকবর ফতেপুর সিক্রীতে উপাসনাগার নির্মাণ করতে আদেশ দিয়েছিলেন। আলেমদের উপাসনাগারে আমন্ত্রণ করে তিনি তাঁদের বক্তব্য মনোযোগ সহকারে শুনতেন। কিন্তু তাঁদের আলোচনার মধ্যে তিনি যখন বিদ্বেষ, একঘেয়ে গোঁড়ামী ও ব্যক্তিগত আক্রমণের মনোভাব দেখতে পেলেন তখন তিনি বুঝতে পারলেন যে, শেখ মখতুম-উল-মূলক, শেখ আবদুন নবী প্রমুখ ধর্মীয় প্রধানগণ মহান চরিত্র ও ধর্মীয় কৃতিত্বের অধিকারী নন। উলেমাদের ইসলামের ভুল ব্যাখ্যা প্রদান ও আলোচনা আকবরের অনুসন্ধিৎসু মনকে শান্ত করতে পারল না। কাজেই তিনি অন্যত্র সত্য অন্বেষণ করতে লাগলেন। তিনি তখন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী পণ্ডিতদের তাঁর উপাসনায় আমন্ত্রণ করতে লাগলেন। এই আমন্ত্রণের ফলে পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষ তাঁদের জ্ঞানীধর্ম নেতাদের আকবরের সভায় প্রেরণ করতে লাগলেন। ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দে আকুয়াভিভ ও মনসারেটের জেসুইট মিশনকে আকবর তাঁর সভায় সাদর আহ্বান করলেন। খ্রীষ্টধর্মকে প্রশংসা করলেও আকবরের দৃষ্টি কেবল খ্রীষ্টানদের ধর্ম বিস্তারের প্রতি নিবদ্ধ ছিল না। তিনি জোরোষ্ট্রীয় ও জৈনধর্ম সম্বন্ধেও জ্ঞান অর্জন করতে ইচ্ছা করলেন। তিনি পার্সী ধর্মগুরু দস্তুর মেহেরজি রচনা ও জৈনধর্ম গুরুদের তাঁর সভায় আমন্ত্রণ জানালেন। সম্রাটের ওপর পার্সী ধর্ম গুরুর আশ্চর্য প্রভাব দেখা যেতে লাগল। আকবর একজন বিজ্ঞ হিন্দু পণ্ডিতকেও হিন্দুধর্ম ও দর্শন ব্যাখ্যা করবার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। আকবর প্রত্যেক ধর্মের মূলতত্ত্ব মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করতে লাগলেন এবং প্রত্যেক ধর্মের প্রতি এমন অনুরক্তি প্রদর্শন করতে লাগলেন যে, 'জনসাধারণ তাঁকে মাঝে মাঝে জোরোষ্ট্রীয়ান,

হিন্দু, জৈন অথবা খ্রীষ্টান বলে চিন্তা করতে লাগল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আকবর কোন বিশেষ ধর্মে ধর্মান্তরিত হননি। আলোচনা ও তর্ক-বিতর্কের মাধ্যমে বিভিন্ন ধর্মের সংস্পর্শে আসবার ফলে ক্রমে ক্রমে আকবর স্বতন্ত্র এক ধর্ম চিন্তার অধিকারী হলেন। মখদুম উল-মূলক ও আবদুন নবীর মধ্যে বিবাদের ফলে তিনি তাঁদের ধর্মনেতা হিসাবে অনুপযুক্ত মনে করলেন এবং ব্যথিত হলেন। অপরপক্ষে তিনি নিজের বুদ্ধিমত্তা ও সত্যের প্রতি প্রকৃত অনুরক্তির কথা উপলব্ধি করলেন। এই সময়েই শেখ মোবারক তাঁকে পরামর্শ দিলেন যে, যেহেতু তিনি রাষ্ট্রের সর্বময়কর্তা, সেহেতু তিনি ধর্মনেতাও হতে পারেন। ধর্মনেতা সম্বন্ধে এই পরামর্শ আকবরের মনকে খুব প্রভাবান্বিত করল। আকবর ধর্ম সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগলেন। তাঁর চিন্তাধারায় নূতন রূপ পরিগ্রহ করল। তিনি আলেমদের মধ্যে কোন্দল লক্ষ্য করে তাদের হাতে অধিক ক্ষমতা প্রদানে অসম্মতি জানিয়ে নিজেই রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় বিষয়ে চূড়ান্ত রায় দানের ক্ষমতা গ্রহণ করলেন। আলেমদের মধ্যে ধর্ম বিষয়ে কোন মতানৈক্য দেখা দিলে সম্রাট নিজেই এর বিচারের ভার নেবেন—এই উদ্দেশ্যে তিনি স্বয়ং ফতেপুর সিক্রীর মসজিদে শুক্রবারের দিন খোতবা পাঠ করার প্রস্তাব করলেন। ফৈজী এই খোত্‌বা রচনা করেন। খোত্‌বায় বলা হয়ঃ "তাঁর নামে পাঠ করছি যিনি আমাদের সার্বভৌমত্ব দান করেছেন; যিনি আমাদের দিয়েছেন এক বিরাট হৃদয় এবং শক্তিশালী বাহু। যিনি আমাদের ন্যায়পরায়ণতা ও ন্যায়বিচারের পথে পরিচালিত করেন, যিনি ন্যায়-পরায়ণতা ব্যতীত অন্যান্য সব বস্তুকে আমাদের অন্তর হতে বিদূরিত করেন; তাঁর প্রশংসা করা আমাদের জ্ঞান শক্তির বাইরে, তিনি সর্ব-শক্তিমান মহামহিম আল্লাহ্‌ আকবর।" সম্রাট আকবর খোতবা পাঠ শুরু করলেন। তাঁর খোতবা পাঠ নিয়ে উলেমাদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। আল্লাহ্‌ আকবর নামে যে বাক্যটি রচনা করা হয়, তাঁরা তার এই ব্যাখ্যা দেন যে, আকবর নিজেই আল্লাহ্। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সম্রাট আকবর তা মনে করেন নি। তিনি আক্ষরিক অর্থে

'আল্লাহ আকবর' ব্যবহার করেছেন অর্থাৎ 'আল্লাহ্ মহান'—এই অর্থ তিনি বোঝাতে চেয়েছেন। কিন্তু খোতবা পাঠ হতেও অধিক আপত্তির কারণ হল শেখ মোবারকের পরামর্শে সম্রাটের মুজতাহিদের ভুমিকা গ্রহণ করা। এই সিদ্ধান্তের ফলে ইংল্যাণ্ডের অষ্টম হেনরীর মত তিনি সকল ধর্ম সম্বন্ধীয় বা বেসামরিক ব্যাপারে সর্বোচ্চ বিচারকে পরিণত হলেন। ১৫৭৯ খ্রীষ্টাব্দে নেতৃস্থানীয় আলেমগণ তাঁকে ইমাম-ই-আদিল বা মাজাহিব অর্থাৎ মুসলিম আইনের চূড়ান্ত ব্যাখ্যাকারী হিসাবে ঘোষণা করতে সিদ্ধান্ত নিলেন। এই ঘোষণা তাঁর অভ্রান্ত ও সর্বময় কর্তৃত্বের ঘোষণা নামে পরিচিত। শেখ মোবারক কাল বিলম্ব না করে একটি দলিল রচনা করলেন। এবং সম্রাট স্বচ্ছন্দে সেই দলিলে সাক্ষর দিলেন। এই দলিলে যে সমস্ত কথার উল্লেখ আছে তার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি এখানে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য ; যেহেতু হিন্দুস্থান এখন নিরাপত্তা ও শান্তির কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়েছে, যেহেতু এই ভূখণ্ড ন্যায়বিচার ও পরোপকারের দেশে পরিবর্তিত হয়েছে, সে জন্য বিপুল সংখ্যক লোক বিশেষ করে শিক্ষিত ও আইনজ্ঞরা এই দেশে আগমন করে একে স্বদেশ হিসাবে পছন্দ করেছেন। এখন আমরা প্রধান উলেমারা যাঁরা আইন বিজ্ঞানে পরদর্শী এবং যাঁরা সততা ও ধর্ম ভিরুতার জন্য প্রসিদ্ধ, তারা নিম্নলিখিত হাদীস ও পবিত্র কোরআনের বাণী উপলব্ধি করেছি, আল্লাহ্তায়ালাকে মান্য কর, রসুল কে মান্য কর এবং যাঁরা তোমাদের ওপর ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাদের মান্য কর। নিশ্চিত ভাবে শেষ বিচারের দিন যে ব্যক্তি আল্লাহ্তায়ালার সবচেয়ে প্রিয় হবেন তিনি ইমাম-ই-আদিল ; যারা আমীরকে মান্য করে তারা আল্লাহ্কে মান্য করে এবং যারা ইমামকে অমান্য করে তারা আল্লাহ্কে অমান্য করে। এবং তৃতীয়তঃ যুক্তি ও সাক্ষের ওপর ভিত্তি করে আমরা সম্মত হয়েছি যে, আল্লাহ্র দৃষ্টিতে 'সুলতান-ই-আদিল' এর পদ মর্যাদা মুজতাহিদের পদ মর্যাদা হতে উচ্চ। 'আমরা আরও ঘোষণা করছি যে, ইসলামের রাজা, বিশ্বাসীদের আমীর, পৃথিবীতে আল্লাহ্র ছায়া আবুল ফতেহ জালাউদ্দীন মোহাম্মদ আকবর বাদশাহ গাজী একজন অত্যন্ত

ন্যায়পরায়ণ, বিজ্ঞ ও আল্লাহ্ ভক্ত রাজা। 'ভবিষ্যতে ধর্ম বিষয়ে মুজতাহিদগণ ঐক্যমতে পৌঁছাতে না পারলে সম্রাট যদি ইচ্ছা করেন তা হলে জাতির স্বার্থে এবং রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যে কোন একটি মত গ্রহণ করতে পারেন এবং সেই উদ্দেশ্যে ফরমান জারী করতে পারেন। এই রূপ নির্দেশ আমাদের ও সমগ্র জাতির ওপর কার্যকরী হবে। আমরা আরও ঘোষণা করছি যে, সম্রাট যদি নূতন নির্দেশ জারী করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন, তবে আমরাও সমগ্র জাতি তা মানতে বাধ্য থাকব। অবশ্য অনুরূপ আদেশ সর্বদাই কোরআনের নির্দেশ মোতাবেক হবে এবং জাতীয় স্বার্থের অনুকূলে হবে। যদি কেউ এই আদেশ অমান্য করে, তা হলে তার পরকাল নষ্ট হবে ; তার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হবে এবং তার কোন ধর্মীয় সুযোগ-সুবিধা থাকবে না। এই ঘোষণা পত্র প্রকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গোড়া ধর্ম পন্থীগণ চরম আঘাত পেল। তারা দেখল যে, আকবর রাজনৈতিক ও ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রে সর্বময় কর্তৃত্ব লাভ করেছেন। এটি তারা সহ্য করতে পারল না। কিন্তু একথা তারা বুঝে দেখল না যে, কোন বিষয় যদি কোরআনের পরিপন্থী হয় এবং তা যদি জাতীয় স্বার্থের অনুকূলে না হয় তা হলে সম্রাটের ব্যাখ্যা কার্যকর হবে না। অধিকন্তু, মুসলিম, আইন ব্যাখ্যা করবার ক্ষমতা লাভ করলেও সম্রাট আইন তৈরীর করবার ক্ষমতা পেলেন না! দলিলে দেখা যায় যে, আকবর শুধু উলেমারা ঐক্যমতে পৌঁছাতে না পারলেই ধর্ম বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষমতা লাভ করেছিলেন। কিন্তু যে সমস্ত বিষয়ে উলেমারা ঐক্যমত্যে পৌঁছাতে পারেন সে সমস্ত বিষয়ে সম্রাটের কোন ক্ষমতাই ছিল না। একে অভ্রান্ত অনুশাসনও বলা যায় না এই কারণে যে, এই ঘোষনাপত্র খানি আকবর নিজে জারী করেন নি এবং তিনি নিজেকে কখনও অভ্রান্ত বলে দাবী ও করেন নি। এই ঘোষণাপত্র খানি বিশিষ্ট উলেমারা প্রকাশ করেন এবং তাঁরাই তাঁকে উক্ত ক্ষমতা প্রদান করেন। এই আদেশের ফলে এটাই লাভ হল যে, ধর্মজ্ঞ ব্যক্তিগণ অন্য ধর্মমতের ওপর কোন রকম জোর জবরদস্তি করতে পারতেন না। কিন্তু গোঁড়া ধর্মান্ধ ব্যক্তিগণ

বুঝতে পারলেন না যে, এই বিষয়ে সম্রাটের শক্তি সীমাবদ্ধ এবং কোরআনের বিরুদ্ধে কোন আইন প্রণয়ন করবার তাঁর ক্ষমতা নেই। আকবরকে তাঁরা ভুল বুঝেছিলেন এবং তাঁর সত্যানুসন্ধানকে ইসলামের নিন্দাসূচক কার্য বলে মনে করলেন। ঐতিহাসিক আবুল ফজলের মতে আকবরের বিরুদ্ধে রক্ষণশীল উলেমাদের বিরোধতার কারণ ছিল তিনটি, যথা---(১) বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিদের দরবারে আহ্বান ও আপ্যায়ন। (২) **সুলহ-ই-কুল** বা বিশ্বজনীন সহিষ্ণুতা নীতি ও (৩) নীচমনা ব্যক্তিদের স্বার্থপরতা। গোঁড়া আলেমগণ আকবরের উদার নীতি বুঝতে পারেন নি। সম্রাট এমন একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চেয়ে ছিলেন যেখানে সকলেই সমান। কারণ উলেমাদের গোঁড়ামীতে তিনি বিরক্ত হয়েছিলেন। তিনি সকলের গ্রহণযোগ্য একটি সূত্র বার করে বিবাদমান ধর্মমত গুলির মধ্যে নূতন সংযোগ স্থাপনের পরিকল্পনা করছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল মহৎ। আকবরের সত্যকারের ইচ্ছা ছিল তাঁর সাম্রাজ্যের সকল প্রজাকে ঐক্যবদ্ধ করে একটি সাধারণ বন্ধনে বাঁধা।

(৯) দীন-ই-ইলাহী : ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দে আকবরের ধর্মীয় চিন্তাবোধ চূড়ান্ত রূপ লাভ করে। এই সময়ে তিনি দীন-ই-ইলাহী ধর্ম প্রচার করেন। বাদাউনী এই নবধর্মের সংজ্ঞা দান কালে একে 'তৌহিদ-ই-ইলাহী বা ঐশী একেশ্বরবাদ' বলে অভিহিত করেন। ঐতিহাসিক ডঃ ইশ্বরী প্রসাদের মতে, দীন-ই-ইলাহী হল একটি উদার পন্থী ধর্মীয় মতবাদ ; সকল ধর্মের মধ্যে যা কিছু ভাল আছে তা এর অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। বস্তুতঃ উপাসনালয়ে বসে সুদীর্ঘকাল আলাপ আলোচনার পর আকবর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে মৌলিক আদর্শের ক্ষেত্রে সকল ধর্ম সমান ; তবে রীতি নীতির প্রশ্নে তাদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। ধর্ম বিশ্বাসের সমন্বয় সাধনের জন্য তিনি তাই সকল ধর্মের সারাংশ সংগ্রহ করে একটি নূতন ধর্ম প্রচার করেন এবং এর নাম দেন 'দীন-ই-ইলাহী।' মূলতঃ দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য ও স্থাপনের উদ্দেশ্যেই আকবর এই নবধর্মের উদ্ভাবন করেন। তাই একে ধর্ম না বলে ধর্মীয় সমাজবিধি বলা উচিত। অধ্যাপক

এস, আর, শর্মা বলেন, "দীন-ই-ই লাহীকে ধর্ম বলে স্বীকার করা হলে অতিশয়োক্তি করা হবে। এর জন্য কোন গ্রন্থ অবতীর্ণ হয়নি। কোন পয়গম্বরও এ প্রচার করেননি, এমন কি, এর মহৎকোন ধর্মবিশ্বাসও নেই। সম্রাট আকবরের মানসিক ধ্যান ধ্যারনা ও ব্যক্তিগত আচার আচরণ অনুধাবন করতে না পারায় দীন-ই-ইলাহী সম্পর্কে যথেষ্ট ভ্রান্ত ধারনার সৃষ্টি হয়েছে। ধর্ম অপেক্ষা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই তিনি দীন-ই-ইলাহী প্রচার করেন। তাই আকবরকে ধর্ম প্রচারক না বলে বরং রাজনীতিবিদ বলা উচিত। ধর্ম প্রচারকের মনোভাব নিয়ে তিনি কখনও তাঁর এই নবধর্ম প্রচার করেননি বা তিনি নিজেকে পয়গম্বর বলেও দাবী করেননি। তবে তিনি শান্তির বাণী (সুলহ-ই-কুল) প্রচার করেছেন এবং ভারতের ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করে গিয়েছেন। তিনি ধর্মের মাধ্যমে বাস্তবে না হলেও আনুষ্ঠানিক ভাবে ভারতের সকলজাতির মধ্যে ঐক্য স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। আবুলফজল তাঁর ৭৭ নং আইনে দীন-ই-ইলাহীর মৌলিক আদর্শ ও রীতি নীতি সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দান করেছেন। দীন-ই-ইলাহীর অনুসারীদের মধ্যে নিম্নোক্ত আদর্শ ও রীতিনীতির প্রচলন ছিল।

(১) দীন-ই-ইলাহীর অনুসারীরা নূতন প্রথায় সম্ভাষণ করতেন। পরস্পর দেখা হলে তাঁরা একজন বলতেন 'আল্লাহ আকবর', এবং জবাবে অন্যজন বলতেন 'জাল্লা জালালুহু।

(২) এই সম্প্রদায়ের প্রত্যেককে জন্মবার্ষিকী পালন করতে হত এবং সেই সময় ভোজের আয়োজন করে স্বধর্মীদের দাওয়াত করতে হত।

(৩) দীন-ই-ইলাহীর অনুসারী হলে যতদূর সম্ভব মাংস খাওয়া হতে বিরত থাকতে হত। তবে মাংস খাওয়ার জন্য কারো প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা চলত না। প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীর জন্য স্ব স্ব জন্মমাসে মাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ ছিল।

(৪) মৃত্যুর পর দাওয়াতের মাধ্যমে লোক খাওয়াবার পরিবর্তে জীবিত কালেই এই খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করতে হত।

(৫) দীন-ই-ইলাহীর সদস্যরা কসাই, ধীবর, ব্যাধ প্রভৃতি নিচু জাতির লোকদের সঙ্গে মেলামেশা করবে না।

(৬) দীন-ই-ইলাহী ধর্মের অনুসারীদের অগ্নিকে পবিত্র জ্ঞান এবং সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে হত। দীন-ই-ইলাহীর অনুসারীদের মধ্যে চারটি শ্রেণী বিভাগ ছিল। চারটি উৎসর্গ, যথা সম্পত্তি, জীবন, সম্মান ও ধর্ম ছিল এই শ্রেণী বিভাগের ভিত্তি মূল। যারা ধন সম্পত্তি উৎসর্গ করতে প্রস্তুত ছিল তারা প্রথম শ্রেণী ভুক্ত। যারা ধন ও জীবন উৎসর্গ করত তারা দ্বিতীয়, যারা ধন, জীবন ও সম্মান উৎসর্গ করতে ইচ্ছুক ছিল তারা তৃতীয় এবং যারা সম্রাটের জন্য ধন, জীবন, সম্মান ও ধর্ম উৎসর্গ করত তারা চতুর্থ শ্রেণী ভুক্ত ছিল। দীন-ই-ইলাহী ধর্মমতের জন্য সম্রাট এমন কতকগুলি আইন প্রণয়ন করে ছিলেন, যা ইসলামের পক্ষে ধ্বংসাত্মক বলে অভিযোগ করা হয়েছে। বাদাউনী, তাঁর সমর্থকগণ ও জেসুইট লেখকদের মতানুসারে আকবর ইসলাম ধর্মের প্রতি শত্রুতা করেছিলেন। ডঃ স্মিথ বলেন, 'আকবর যৌবনকালে তাঁর পূর্ব পুরুষের ধর্মের প্রতি তীব্র বিরোধিতা প্রদর্শন করেছিলেন।" উপাসনাগারকে আস্তাবলে রূপান্তরিত করণ, নামায নিষিদ্ধকরণ, মক্কার তীর্থযাত্রা বন্ধ করে দেওয়া, সম্রাটকে সেজদা করা, আজান দেওয়া বন্ধ করা, দাড়ি কেটে ফেলা, মোল্লাদের বিতাড়িত করা ও সম্রাটের প্রাসাদে শূকর ও কুকুর প্রতিপালন প্রভৃতি আকবরের বিরুদ্ধে কতকগুলি বিশেষ অভিযোগ বাদাউনী আণয়ন করেছিলেন। সম্রাটের প্রতি যাঁর ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ছিল এবং যাঁর মন্তব্য প্রধানতঃ জনশ্রুতির ওপর নির্ভরশীল, তেমন একজন গোঁড়া ধার্মিক লেখকের উক্তি মেনে নেবার পূর্বে আমাদের বিচার করে দেখতে হবে।' যে সমস্ত মসজিদ বিজয়ের চিহ্নরূপে হিন্দু অঞ্চলে স্থাপন করা হয়েছিল, প্রকৃত পক্ষে সেই গুলির কোন প্রয়োজন ছিল কিনা? এই সকল অপ্রয়োজনীয় মসজিদ সম্রাটের আদেশে অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছিল। কিন্তু যেখানে নিয়মিত নামায পড়া হত, তা তিনি স্পর্শও করেন নি। তাঁর সময়ে নির্মিত অনেক মসজিদ এখনও দিল্লীতে বর্তমান রয়েছে।

মক্কায় তীর্থ যাত্রা কোন কালেই বন্ধ করা হয়নি। ১৫৯৫ খ্রীষ্টাব্দে গুজরাটের যে তৃতীয় জেসুইট মিশন আগমন করেন, তাঁরা অনেক নরনারীকে মক্কায় তীর্থ যাত্রা করতে দেখেছিলেন। ধর্ম বিশ্বাসের প্রতীক হিসাবে নয়, আনুগত্যের জন্যই সম্রাটকে সেজদা করা হত। যে সমস্ত হিন্দু সম্রাটকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে আনন্দ লাভ করত, তাদেরকে সন্তুষ্ট রাখবার জন্যই এই ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছিল। পারস্যের দরবারে উহাই ছিল আনুগত্য প্রদর্শনের জনপ্রিয় রীতি এবং আব্বাসীয় খলিকাদের সময় এই রীতি প্রচলিত হয়েছিল। 'সুলহ-ই-কুলের' বিরুদ্ধ পন্থী অনেক মোল্লা ও শেখদের সাম্রাজ্য হতে বিতাড়িত করা হয়েছিল। স্বাভাবিক কারণেই তারা রুষ্ট হয়ে ছিলেন এবং সম্রাটের বিরুদ্ধে ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগ আণয়ন করে ছিলেন। এই ভাবে প্রতিটি অভিযোগ বিচার করে দেখলে সহজেই বোঝা যায় যে, ঐ সমস্ত অভিযোগ মিথ্যাও কল্পনা প্রসূত। আকবরের প্রবর্তিত ধর্মীয় আইন কানুন ইসলামের মূলনীতির পরিপন্থী ছিল না। স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত অনেকে 'দীন-ই-ইলাহীর প্রতি আকৃষ্ট হলেও উহা জনপ্রিয় হতে পারে নি। হিন্দু রাজা বীরবল সহ আঠার জন ব্যতীত অপর কেউ-ই দীন-ই-ইলাহীর পতাকা তলে সমবেত হয় নি। জনসাধারণের মনে কোন আবেদন সৃষ্ট করতে পারেনি বলে দীন-ই-ইলাহী ব্যর্থ হয়। সাধারণ লোক আকবরের ধ্যান-ধারণা বুঝতে পারেনি বলে তাঁর ধর্ম বিশ্বাসও গ্রহণ করেনি। তত্নপরি এই ধর্ম বিশ্বাস কর্তৃপক্ষের সক্রিয় সমর্থন লাভ করতেও সমর্থ হয়নি। আকবর কোনদিন তাঁর সমর্থকগণকে এই ধর্ম গ্রহণ করতে বলেন নি। কিংবা গ্রহণ করতে বাধ্য করেন নি। তাই তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই উহার সমাপ্তি ঘটে।

(১০) হিন্দু ও ইংরেজ নীতি : একজন প্রতিভাবান রাজনীতি বিদ ও দূরদর্শী কূটনীতিজ্ঞ হিসাবে আকবর ভারতের রাজনীতিতে হিন্দুদের সহযোগিতার মূল্য উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি এও জানতেন যে, হিন্দুদেরকে মুসলমানদের সম পর্যায়ে নিয়ে আসতে না পারলে একটি

বিরাট জাতি গঠনকরা কিছুতেই সম্ভব নয়। কাজেই রাজত্বের প্রথম হতেই তিনি পরবর্তী শাসকদের নীতি ত্যাগ করেছিলেন এবং বিশৃংখলা এবং বিরোধিতার অবসান ঘটাতে চেষ্টা করেছিলেন। তিনি হিন্দু রমনী বিবাহ করেন এবৎ হিন্দুদের রাজকার্যে নিয়োগ করেছিলেন। এতদ্বতীত, আকবর বিশ্বজনীন ধর্মীয় সহিষ্ণুতার (সুলহ-ই-কুল) নীতি গ্রহণ করেছিলেন। রাজত্বের প্রথম ভাগে যুদ্ধবন্দী হিন্দুদের জোরপূর্বক ইসলাম ধর্মগ্রহণ করবার জন্য বাধ্যতামূলক নীতির বিরুদ্ধে তিনি আইন প্রণয়ন করেছিলেন। সমস্ত প্রজাকে তিনি নিজের ধর্ম পালন করবার ও বিবেকানুযায়ী চলবার স্বাধীনতা দান করেছিলেন। হিন্দুদের মন্দির নির্মাণ ও ধর্মীয় উৎসবাদি পালন করবার জন্য অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। নানা ব্যাপারে তিনি হিন্দুদের ধর্মীয় উৎসবে যোগদান করতেন। অমুসলমানদের ওপর হতে তিনি জিযিয়া কর উঠিয়ে দেন, যুদ্ধ বন্দীদের দাস করবার নীতি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন ও হিন্দুদের ওপর আয়োজিত তীর্থ করের বিলোপ সাধন করেন। মুঘল সম্রাটের পক্ষে এই সকল করের বিলোপ সাধন করা এক বিরাট অর্থনৈতিক ত্যাগ স্বীকার বলতে হবে। তিনি হিন্দু সংস্কৃতির একজন উদার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং তাঁর অনুগ্রহ লাভের আশায় দরবারে আগত হিন্দু পণ্ডিত, কবি, সঙ্গীতজ্ঞ ও চিত্রশিল্পীদের তিনি প্রচুর উৎসাহ দান করতেন। আকবর তাঁর সকল প্রজার মঙ্গল কামনা করতেন এবং এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তিনি হিন্দু সমাজের দুর্নীতি দমন করতে চেয়েছিলেন। তিনি বাল্য বিবাহ নিষিদ্ধ করেছিলেন। বিধবাদের পুনর্বিবাহে উৎসাহ দান করতেন ও সতীদাহ প্রথা নিবারণ করবার চেষ্টা করেছিলেন। অল্পকালের মধ্যেই আকবর হিন্দুদেরকে তাদের অতীতের কথা ভোলাতে পেরেছিলেন এবং হিন্দুস্থানের প্রথম জাতীয় সম্রাট হিসাবে তাদের মনে স্থায়ী আসন লাভ করেছিলেন। তাঁর এই মিলনাত্মক নীতির ফলে যে হিন্দুরা একদিন মুসলমান বিজেতাদের প্রতি বিরুদ্ধ ভাব পোষণ করত তারা তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু হল এবং জীবনের শেষ পর্যন্ত তাঁর সেবায় নিযুক্ত ছিল। উজবেক আফগানদের প্রতিরোধ করবার ব্যাপারে তাদের সাহায্যও সমর্থন মুঘল

সম্রাটের পক্ষে বিশেষ ফলদায়ক হয়েছিল, ধর্ম সম্পর্কে আকবরের সীমাহীন কৌতুহল তাঁকে পর্তুগীজদের সংস্পর্শে আসতে বাধ্য করেছিল এবং তিনি তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। নানা ব্যাপারে তিনি গোয়ার খ্রীষ্টান মিশনকে আগ্রায় নিমন্ত্রণ করে পাঠাতেন। ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দে বোডলফ একুইডিয়া ও ফাদার মনসারেটের অধীনে পর্তুগীজ মিশন তাঁর দরবারে এসে হাজির হয়েছিল। ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে মুঘল দরবারে দ্বিতীয় মিশন এসেছিল। মিশনারীদের তিনি আন্তরিক ভাবে স্বাগত জানিয়েছিলেন। কিন্তু তারা আকবরকে তাদের ধর্ম গ্রহণ করাতে পারল না। লাহোরে সম্রাটের দরবার থাকা কালীন তৃতীয় মিশন এসেছিল। প্রথম দুটি মিশন মুঘল সাম্রাজ্যে ব্যবসায় করবার অনুমতি লাভ করে কিছু সফলতা লাভ করেছিল। আকবরের এই আমন্ত্রণের অন্তরালে ধর্ম অপেক্ষা রাজনৈতিক কারণ ছিল অধিক। দাক্ষিণাত্যের বিরুদ্ধে তিনি পর্তুগীজদের সহায়তা কামনা করেছিলেন।

(১১) সাহিত্য ও শিল্প : আকবর কেবল বিজেতা ও সুশাসকই ছিলেন না। সাহিত্য ও শিল্পেরও তিনি একজন বড় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এই সময়ে বিভিন্ন ধরণের সাহিত্যের জন্ম হয়েছিল। ঐতিহাসিক সাহিত্য গ্রন্থের মধ্যে এই যুগে আবুল ফজলের 'আকবর নামা' ও আইন-ই-আকবরী এবং নিজামউদ্দীন আহমদের 'তাবাকাত-ই-আকবরী' সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। হিন্দী 'রামায়ণ' রচয়িতা এবং প্রসিদ্ধ হিন্দী কবি ও সাধক তুলসীদাস এই সময় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে বাদাউনীর 'মুনতাখাবুত তাওয়ারিখ' গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা যায়। আগ্রার দুর্গ ও ফতেপুর সিক্রীর অসংখ্য অট্টালিকা আকবরের শিল্প ও স্থাপত্যপ্রীতির কথা আজও ঘোষণা করছে।

আকবর : সমীক্ষা ১৩

(১) ভারতে আকবরই ছিলেন মুঘল সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। একাধারে বিজেতা, রাজনীতিজ্ঞ ও সুশাসক হিসাবে তিনি মুঘল ইতিহাসে অদ্বিতীয় ছিলেন। নানা কৃতিত্বের জন্য তিনি কেবল মুঘল

ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাটই নন সমগ্র পৃথিবীতেও তাঁকে শ্রেষ্ঠ বলা যায়। লরেন্স বাইনিয়ন বলেন, 'বিভিন্ন রাষ্ট্র, জাতি ও ধর্মকে একসূত্রে গেঁথে তোলবার মধ্যেই তাঁর কৃতিত্ব নিহিত আছে। ধর্ম ও বিবেকের স্বাধীনতা দান, জিযিয়া ও অন্যান্য করের বিলোপ সাধন, সতীদাহ ও শিশুকন্যা হত্যা নিবারণ, বিধবা বিবাহে উৎসাহ দান, যুদ্ধ বন্দীদের দাস করবার প্রথার বিলোপ, ভূমি, রাজস্ব নীতির ব্যাপক প্রবর্তন, সর্বত্র শিক্ষার প্রসার, ললিতকলার পৃষ্ঠপোষকতা এবং সর্বোপরি আইন ও শৃংখলার বলে সাম্রাজ্যের সর্বত্র শান্তি ও সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি বহুমুখী কার্যের দ্বারা তিনি পৃথিবীর প্রত্যেক নরপতিকে অতিক্রম করে গেছেন। একজন সৈনিক, বিজেতা, মহানুভব ও জ্ঞানী শাসক, রাজনীতিজ্ঞ, সংস্কারক, আইনজ্ঞ ও শান্তি স্থাপনকারী—এককথায়, যে কোন দিক হতে আমরা তাঁকে বিচার করি না কেন, আকবর ভারতের ইতিহাসে এক অদ্বিতীয় স্থান অধিকার করে রয়েছেন।

(২) সিংহাসনে আরোহন করবার পর আকবর প্রতিদ্বন্দ্বী সর্দারদের পরাস্ত করে বিদ্রোহ দমন করেন এবং এক একটি প্রদেশ অধিকার করে সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি সাধন করেন। একজন সুদক্ষ সেনাপতি ও বিজেতা হিসাবে আপন ক্ষমতার বলে আরব সাগর হতে বঙ্গোপসাগর এবং হিমালয় হতে নর্মদা পর্যন্ত তিনি সমগ্র হিন্দুস্থানের অধীশ্বর হয়েছিলেন।

(৩) একজন মহান ও সার্থক শাসকের সমস্ত গুণ তাঁর মধ্যে বর্তমান ছিল। কল্যাণকর ও বাস্তবমুখী শাসননীতির ওপর তাঁর সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, তিনিই সুশাসক যিনি একাধারে প্রজাদের শ্রদ্ধা, ভালবাসা, আনুগত্য ও সম্পূর্ণ সহযোগিতা লাভ করতে পারেন। তিনি আর্তের প্রতি দয়ালু ও সকলের কাছে ন্যায়বিচারক ছিলেন এবং প্রত্যেকেই মনে করত যে, সম্রাট তাঁর পক্ষে আছেন। রাজনৈতিক দূরদর্শিতার বলে তিনি সর্ব-শ্রেণীর প্রজাদের শুভেচ্ছা ও সহযোগিতার ওপর মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। একই পতাকা তলে ভারতীয় ঐক্য বিধান

করাই ছিল তাঁর প্রধান লক্ষ্য এবং এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করবার জন্যই তিনি জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। ডঃ কানুনগো বলেন, জাতীয় একতা বিধান করবার মহান ধারণার জন্য তিনি ভারতীয় শাসকদের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করেছিলেন। মিঃ জওহরলাল নেহেরু, তাঁকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের 'জনক' আখ্যা দিয়েছেন।

(৪) আকবর তাঁর রাজত্বের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কল্যাণমূলক শাসনতান্ত্রিক ও সামাজিক সংস্কার কার্যে ব্রতী হয়েছিলেন। যুদ্ধ বন্দীদের দাস করবার প্রথার তিনি বিলোপ সাধন করেন এবং জিযিয়া ও অন্যান্য তীর্থকর উঠিয়ে দিয়েছিলেন। দুর্নীতি পরায়ণ কর্মচারীদের দমন করবার জন্য তিনি অশ্বচিহ্নিত করবার ব্যবস্থা করেন। সম্রাট জায়গীরকেও নিজস্ব ভূমিতে পরিণত করে ও কর্মচারীদের নগদ বেতন দান করে জায়গীর প্রথার দুর্নীতি দমন করেছিলেন। তিনি রাজকীয় মুদ্রার সংস্কার সাধন করেছিলেন। সতীদাহ ও বাল্যবিবাহ নিরোধ করে তিনি সমাজের কুসংস্কার দূর করেছিলেন।

(৫) ধর্মীয় সহিষ্ণুতা আকবরের শাসননীতির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি অমুসলমানদের স্বাধীনভাবে তাদের ধর্ম উপাসনার অনুমতি দান করেছিলেন। শাসকশ্রেণী ও ভারতের অন্যান্য জাতির মধ্যে ধর্মের ক্ষেত্রে এক বিরাট পার্থক্য ছিল। এই পার্থক্য দূরীকরণের জন্য তিনি সুলহ-ই-কুল বা বিশ্বজনীন সহিষ্ণুতার নীতি গ্রহণ করেছিলেন। ইউরোপের শাসকশ্রেণী যখন প্রতিদ্বন্দ্বী ধর্মের প্রতি ধর্মান্ধতা ও অসহিষ্ণুতার নীতি গ্রহণ করেছিলেন, তখন তিনি এই ধর্মীয় সহিষ্ণুতার নীতি অবলম্বন করেন। রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও শাসনতান্ত্রিক প্রতিজ্ঞার দিক হতে আকবর ইউরোপীয় শাসকদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। এইজন্য মৃত্যুর পরেও তিনি তাঁর কার্যের দ্বারা অমর হয়ে রয়েছেন। একজন ভদ্র, অমায়িক ও অসাধারণ বুদ্ধির অধিকারী হিসাবে আকবর পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য সমস্ত শাসকদের অন্যতম ছিলেন। স্বাস্থ্য ও মনের দিক হতে তিনি সুন্দর কতকগুলি গুণের অধিকারী ছিলেন। অসাধারণ শারীরিক বলের দ্বারা তিনি অক্লান্ত কর্মী হতে

পেরেছিলেন এবং বিস্ময়কর সহিষ্ণুতা ও মানসিক বলের পরিচয় দিতে পেরেছিলেন। তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও সীমাহীন অনুসন্ধিৎসা ছিল তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।

(৬) নিরক্ষর হলেও তিনি সুসভ্য ও জ্ঞানী ছিলেন। তিনি সুন্দর সাহিত্য রুচির অধিকারী ছিলেন। তাঁর দরবারে পণ্ডিত, কবি ও দার্শনিকগণ বিভিন্ন বিষয়ের পুস্তক তাঁর সম্মুখে পাঠ করতেন। শিল্প-কলা ও সাহিত্যের তিনি উদার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতার ফলে চিত্র, সঙ্গীত ও স্থাপত্য শিল্পের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছিল। আকবরের বিভিন্ন কার্যাবলী ও কৃতিত্ব বিচার করে বলা যায় যে, পৃথিবীর সমসাময়িক শাসকদের মধ্যে তিনি সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। ডঃ স্মিথ বলেন, 'আকবর মানুষের জন্মগত রাজা ছিলেন। ইতিহাসে পরিচিত সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী সার্বভৌম সম্রাটদের মধ্যে তিনি অন্যতম হিসাবে দাবী করবার অধিকার রাখেন। অসাধারণ গুণ, মৌলিক চিন্তা ও অপূর্ব কৃতিত্বের ওপর তাঁর এই দাবী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।'

জাহাঙ্গীর: সমীক্ষা ১৫

(১) শাসক হিসাবে তিনি তাঁর মনুষ্যত্ব, শিষ্টাচার ও দানশীলতার জন্য উল্লেখযোগ্য ছিলেন। তাঁর জীবনী আলোচনা করে এই কথা বলা যায় যে, প্রজাদের প্রতি তিনি দয়ালু, সহানুভূতিশীল ও বিবেচক ছিলেন। গুণীদের ও বিশ্বস্ত ভৃত্যদের তিনি প্রচুর পুরস্কার দান করতেন। অপরপক্ষে, অন্যায়কারীদের তিনি অত্যন্ত কঠোর ও অমানুষিক শাস্তি প্রদান করতেন। কিন্তু রক্তপাতের প্রতি তাঁর আসক্তি ছিল না। নিষ্ঠুরতা ও কোমলতা, কঠোরতা ও সুরুচি প্রবণতা এবং ন্যায় বিচার ও খেয়ালীপনার অদ্ভুত সংমিশ্রণের ফলে অনেকে তাঁকে বৈপরীত্যের সংমিশ্রণ বলে আখ্যা দিয়েছেন। শাসন পরিচালনায় জাহাঙ্গীর মহান আকবরের নীতি অনুসরণ করেছিলেন। তিনি যাতায়াত এবং বাণিজ্যিক শুল্ক প্রভৃতি নানা অন্যায় কর উঠিয়ে

দিয়েছিলেন। শাসন পরিচালনার ব্যাপারে তাঁর প্রভূত জ্ঞান ছি
এবং সাম্রাজ্যের সর্বত্র তিনি সুবিচার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তি
একজন উৎসাহী শিকারী ও সামরিক অভিযান পরিচালনা করবার স
সর্বগুণের অধিকারী ছিলেন।

(২) ধর্মীয় বিষয়ে জাহাঙ্গীর ছিলেন নিরপেক্ষ, তিনি আল্লাহ্‌র প্রা
যেমন অবিশ্বাসী ছিলেন না। তেমনি অতিরিক্ত ধর্ম পরায়ণও ছিলে
না। ডঃ বেণী প্রসাদ বলেন, 'তিনি আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব এবং হিন্দু অথ
মুসলিম, জীবিত অথবা মৃত যে কোন আল্লাহ্‌ভক্ত সন্ন্যাসীও ফকীরে
বিশ্বাস করতেন,। সকল ধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতাবোধ ছিল এবং তি
সুলহ-ই-কুল নীতি অনুসরণ করতেন। আত্মীয় বর্গের প্রতি তি
উদার ও স্নেহ প্রদর্শন করতেন। পিতার প্রতি অবাধ্যতার জন্য অনুতা
করতেন এবং সম্রাট হবার পর আত্মজীবনীতে নিজের সম্পর্কে অত্য
শ্রদ্ধাপূর্ণ উক্তি করেছেন।

(৩) তিনি নিজে চিত্রকর ও কবি ছিলেন এবং সাহিত্য ও শিল্পে
পৃষ্ঠপোষকতাও করতেন। চিত্র বিদ্যার প্রতি অনুরাগের জন্য জাহাঙ্গীরকে
শিল্পীদের রাজা বলা হয়। তাঁর রচিত তুযুক-ই-জাহাঙ্গীরী তাঁর সাহিত্
কীর্তির উজ্জ্বলতম নিদর্শন। তিনি প্রকৃত প্রেমিক ছিলেন এবং ভারতে
প্রাকৃতিক দৃশ্যে তিনি আনন্দ অনুভব করতেন। নিজের চারিত্রিক
দৃঢ়তা এবং সুন্নী মুসলমানদের প্রবল সমর্থন তার বিজয়কে ত্বরান্বিত
করেছিল। একজন ধার্মিক মুসলমান হিসাবে তিনি ইসলামকে রক্ষার
দাবী বড় করে তুলে ধরেছিলেন এবং দারার স্বধর্মচ্যুতির ব্যাপারকে কাজে
লাগিয়েছিলেন। আকবরের সময় হতে অনেক ধর্মপ্রাণ মুসলমান
ইসলামের গৌরবকে পুনরুদ্ধার করবার জন্য একজন নেতার অনুসন্ধান
করছিলেন। আওরঙ্গজেবকে ইসলামের রক্ষক মনে করে তাঁরা তাঁর
পতাকাতলে সমবেত হয়েছিলেন এবং তাঁকে পূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতা
দান করেছিলেন। নম্র প্রকৃতি ও চারিত্রিক উদারতার জন্য তিনি
অনেকের হৃদয় জয় করেছিলেন।

শাহাজাহান : সমীক্ষা ১৬

(১) রক্তপাতের মাধ্যমে সিংহাসনে আরোহণ করলেও শাহজাহান একজন দয়ালু ও উদার শাসক ছিলেন। ভারতীয় ঐতিহাসিকগণ তাঁকে একজন আদর্শ মুসলিম শাসক, শরীয়তের (ইসলামী অনুশাসনের) একজন রক্ষক ও ভারতে ইসলাম ধর্মের পুনর্জাগরণের নেতা হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তাঁর দয়া, ধর্মভীরুতা ও প্রজা হিতৈষণারও উচ্চ প্রশংসা লাভ করেছে। তাঁর হিন্দু বিরোধী কার্যকলাপ ও ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা এখনও তর্কের বিষয় হয়ে রয়েছে। শাহজাহানের মধ্যে দৈহিক শক্তি, তীক্ষ্ম অন্তদৃষ্টি, সাহসিকতা এবং সর্বোপরি অপূর্ব পরিচালন ক্ষমতা ছিল।

(২) শাহজাদা হিসাবে তিনি কর্তব্যপরায়ণ এবং স্বামী হিসাবে স্ত্রী মমতাজ বেগমের অনুরাগী ছিলেন। অবশ্য পিতা হিসাবে তিনি নীতি পরায়ণতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারেন নি। জাঁকজমক ও ঐশ্বর্যের প্রতি অনুরাগ ছিল তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের বর্ণনা দিতে গিয়ে বারনিয়ার ও মনুচির ন্যায় বিদেশী পর্যটকগণ তাঁকে ইন্দ্রিয়পরায়ণ ও প্রমোদ বিলাসী বলে বর্ণনা করেছেন।

(৩) শাহজাহানের রাজত্বকাল মুঘল সাম্রাজ্যের ইতিহাসে একটি বিশেষ স্মরণীয় যুগ। সিংহাসনে আরোহণের পর শাহজাহান পর্তুগীজ জলদস্যুদের দমন ও হুগলী অধিকার করেন। দাক্ষিণাত্য পর্যন্ত তিনি সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি সাধন করেছিলেন। দক্ষিণে তিনি আহমদ-নগর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত করেন এবং বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা আয়ত্তে নিয়ে আসেন। সম্রাট বাহিনী আসামের আহোমদের সঙ্গে ও যুদ্ধ করেছিল এবং এর ফলে সাম্রাজ্য কামরূপ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।

(৪) শাসন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে শাহজাহান আকবরের উন্নত নীতি গ্রহণ করেন এবং ন্যায় বিচার ও বদান্যতার জন্য প্রশংসা অর্জন করেন। তাঁর সময়ে রাজ্যের সর্বত্র শান্তি বিরাজমান ছিল। রাজস্ব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছিল এবং প্রজাবর্গ ছিল সুখী ও সমৃদ্ধশালী। দু একটি বিদ্রোহ

ব্যতীত শাহজাহানের রাজত্ব কালে শান্তি ও শৃংখলা কখনও ব্যাহত হ
নি। বি. পি. সাকসেনা বলেন, 'শাহজাহানের রাজত্বকালে মুঘ
সাম্রাজ্য সমৃদ্ধিও প্রাচুর্যের উচ্চ পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল।' ভারতবর্ষে
ঐশ্বর্য বহু বিদেশীর মন আকর্ষণ করেছিল এবং তাঁরা এই দেশ সম্বে
চমকপ্রদ বর্ণনা লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। তাঁরা শাহজাহানের সু
শাসন ব্যবস্থার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। ফরাসী পর্যটক তাভা
নিয়ার বলেন, 'শাহাজাহান রাজা হিসাবে প্রজাকে শুধু শাসনকর নয়
পরিবার ও সন্তানদের পিতার ন্যায় তিনি প্রজা শাসন করতেন। কাফি
খান নামক অন্য একজন সম-সাময়িক ঐতিহাসিকও শাহজাহানে
সুশাসনের প্রশংসা করেছেন। ইতালীর পর্যটক মনুচি ও কাফি খানে
মন্তব্য সমর্থন করে শাহজাহানের শাসন ব্যবস্থাকে 'খুব উন্নত' বলেছেন
এই সকল পর্যটক ও ঐতিহাসিকের মন্তব্য গ্রহণ করলে আমর
ডঃ স্মিথের এই মন্তব্য স্বীকার করে নিতে পারি না যে, শাহজাহানে
শাসন ব্যবস্থা 'প্রজাদের প্রতি শ্রদ্ধাহীন ও সম্পূর্ণ সহানুভূতিহীন' এব
শাসন প্রণালীর ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।

(৫) শিল্পও স্থাপত্যের ক্ষেত্রে ভারতের ইতিহাসে শাহজাহান অদ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন। তাঁর প্রিয়তম পত্নী মমতাজের সমাধির ওপর তিনি যে তাজমহল গড়ে গিয়েছেন তা পৃথিবীর সর্বকালের সর্বপেক্ষা সুন্দর এক শিল্প কর্ম। দিল্লীর দেওয়ান-ই আম ও দেওয়ান-ই খাস এবং আগ্রার জাম-ই-মসজিদ ও মতি মসজিদ শিল্লোৎকর্ষ ও সৌন্দর্যের জন্য আজও পৃথিবীতে বিখ্যাত হয়ে আছে। ময়ুর সিংহাসন ও শাহজাহানের সৌন্দর্য জ্ঞান এবং ঐশ্বর্যের উজ্জ্বলতম নিদর্শন ছিল।

(৬) সাহিত্য ও চিত্রবিদ্যা শাহজাহানের রাজত্বকালে যথেষ্ট উৎকর্ষতা লাভ করেছিল। নিজে একজন সংস্কৃতিসেবী ও পণ্ডিত ছিলেন বলে শিক্ষা ও শিক্ষিতের তিনি পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। অনেক বিখ্যাত পণ্ডিত ব্যক্তি তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে যে সকল বিখ্যাত ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধ লাভ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে 'বাদশাহ' নামার প্রণেতা আবদুল হামিদ লাহোরী, অন্য একটি 'বাদশাহ'

নামার রচয়িতা আমীর ফাজীল, শাহজাহান নামার লেখক ইনায়েত খান, 'আমল সালিহ' গ্রন্থের রচয়িতা মোহাম্মদ সালিহ, আবুল কাসিম ইরাণীও মীর্জা জিয়াউদ্দীনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। এই সময় শাহজাদা দারা শিকো ও অনেকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থ ফারসী ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। এই সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে 'সাকিনাতুল আউয়া, 'হাসনাতুল আরেফিন' ও রিসালাহ্ ই-হকনামা' প্রধান ও বিখ্যাত। সম্রাট ব্যবসায় বাণিজ্যের জন্য প্রচুর উৎসাহ দান করতেন। শাহাজাহানের রাজত্বকালে ভারত বর্ষ পশ্চিম এশিয়া ও ইউরোপের সঙ্গে রপ্তানী ব্যবসায়ে প্রভূতি উন্নতি সাধন করেছিল। সাম্রাজ্যের অর্থ দপ্তর প্রাচুর্য পূর্ণ হয়ে ওঠে ছিল। তাঁর ত্রিশ বছরের রাজত্বকালে সাম্রাজ্যে শান্তি ও সমৃদ্ধি অব্যাহত ছিল। এই সকল ব্যাপার পর্য্যালোচনা করে বলা হয়, শাহজাহানের রাজত্বকালে মুঘল বংশ ও সাম্রাজ্য গৌরবের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিল।

ঔরঙ্গজেব সমীক্ষা—১৭

(১) ঔরঙ্গজেব নিঃসন্দেহে ভারতের শ্রেষ্ঠ শাসকদের অন্যতম ছিলেন। একজন সুদক্ষ সেনাপতি, আদর্শ শাসক, সরল ও ধার্মিক লোক, নিরপেক্ষ বিচারক এবং প্রজাহিতৈষী হিসাবে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শাসকদের মধ্যে তিনি উচ্চাসন লাভ করেছিলেন। সারল্য, কর্তব্য-পরায়ণতা, নিরপেক্ষতা ও সৎ উদ্দেশ্য তাঁর চরিত্রের প্রধান গুণ ছিল। তিনি তাঁর অদম্য সাহস, দৃঢ়চিত্ততা ও অক্লান্ত কর্মগুণের দ্বারা প্রসিদ্ধ হয়ে রয়েছেন। রাজত্বের প্রথম ভাগে সিংহাসন অধিকার করবার জন্য ঔরঙ্গজের নিষ্ঠুর উপায় গ্রহণ করলেও পূর্ব পুরুষদের ধারানুক্রমিক কার্যাবলী ও তদানীন্তন রাজনৈতিক অবস্থার বিচারে তিনি ক্ষমার পাত্র। সিংহাসন অধিকার করবার পর তিনি কখনও বৃথা রক্তপাতের প্রশ্রয় দেননি। বরং তিনি নিষ্ঠুরতা অপেক্ষা কোমল স্বভাবের অধিকারী হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর রাজ্যশাসনের আদর্শ ছিল মহান। ঔরঙ্গজেব বলেন, 'নিজের জন্য নয়, অন্যের জন্য পরিশ্রম করে বাঁচতে

আমি আল্লাহ্, কর্তৃক প্রেরিত হয়েছি। আমার প্রজাদের সুখের সা
আমার যে সুখ সম্পর্কিত নয়, সেই সুখের জন্য চিন্তা না করাই আমা
কর্তব্য।' তিনি তাঁর এই মহান আদর্শে অবিচলিত ছিলেন। সিংহাস
গ্রহণ করবার পর তিনি ন্যূন পক্ষে ৮০টি কর উঠিয়ে দিয়েছিলেন
রাজনীতির দ্বারা ধর্মকে তিনি কলুষিত হতে দিতেন না। সেইজ
তিনি ভবিষ্যৎ বিপদের ইঙ্গিত করেছিলেন। এই বিষয়ে কোন সন্দে
নেই যে, তিনি ইসলামকে পবিত্রতার সম্পূর্ণতার মধ্যে উন্নীত করে
চেয়েছিলেন। এই কথাও সত্য যে, একজন মুসলমান শাসক হিসাবে
তিনি ভারতবর্ষ শাসন করেছিলেন। এইজন্য আকবরের সময় যে সম
লোক প্রশ্রয় পেয়েছিল, তারা তাঁকে পছন্দ করত না।

(২) ঔরঙ্গজেব শাসনদক্ষতা, তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও শারীরিক শক্তি
অধিকারী ছিলেন। উত্তরাধিকারের যুদ্ধ, বিদ্রোহ দমন ও দাক্ষিণাত
অভিযান সৈনিকও সেনাপতি হিসাবে তাঁর শক্তিমত্তা এবং বুদ্ধির পরিচ
দেয়। কূটনীতি, সেনাপতিত্ব ও রাজনীতির ক্ষেত্রে তাঁর সমকক্ষ কে
ছিলেন না। মারাঠাদের সঙ্গে যুদ্ধে তিনি সম্পূর্ণ সফলকাম হতে
পারেননি সত্য, তবে তিনি তৎকালে যে অসুবিধাজনক পরিস্থিতির
সম্মুখীন হয়েছলেন তাই এই অকৃতকার্যতার জন্য সম্পূর্ণ রূপে দায়ী
ছিল, এই কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। শাসক হিসাবে ঔরঙ্গজেব
রাষ্ট্রের সকল বিভাগের শাসনকার্য পরিদর্শন করতেন। অন্যায়কর,
দুর্নীতি ও অনৈসলামিক কার্যকলাপের ওপর তিনি তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখতেন।
কৃষিকার্যে তিনি উৎসাহ দান করেন এবং অনেক রাস্তা ও সেতু নির্মাণ
করেন। তিনি নিরপেক্ষ বিচারক ছিলেন। তাঁর নিকট দরিদ্র ও ধনী,
অভিজাত ও সাধারণ মানুষ সমান বিচার লাভ করত। ব্যক্তিগত
জীবনে সরল হলেও সর্বদা নিয়মতান্ত্রিকতার মাধ্যমে তিনি দরবারের
মর্যাদা রক্ষা করতেন।

(৩) ঔরঙ্গজেব একজন শিক্ষাবিদ ছিলেন। শিক্ষাকার্যে তিনি
পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। তাঁর সুবিস্তৃত সাম্রাজ্যে তিনি অনেকগুলি
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। কোরআনের সূরাগুলি তাঁর মুখস্থ ছিল

এবং বহু হাদীস তাঁর জানা ছিল। মুসলিম ধর্মশাস্ত্রে তাঁর অগাধ ব্যুৎপত্তি ছিল। আরবীও পার্শী সাহিত্যেও তিনি যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করেন। তাঁর পৃষ্ঠ পোষকতার ফলে 'ফতোয়া-ই-আলমগীর' রচিত হয়।

(৪) একনিষ্ঠ মুসলমান হলেও অন্য ধর্মের প্রতি তিনি সহিষ্ণু ছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে যশোবন্ত সিংহ ও জয় সিংহের ন্যায় অনেক হিন্দু উচ্চ রাজকার্যে নিযুক্ত ছিলেন। আকবরের রাজত্বকালের তুলনায় তাঁর সময়ে হিন্দু রাজকর্মচারীদের সংখ্যা অধিক ছিল। কিন্তু শরীয়তের নিয়মকানুন সম্বন্ধে তিনি অধিকতর সচেতন ছিলেন। কাফিখান বলেন, "কেবল তৈমুরের বংশের সুলতান নয়। দিল্লীর সকল সুলতানদের মধ্যে সিকান্দার লোদীর পর ধর্মানুরক্তি, কঠোর পবিত্র জীবন ও ন্যায়পরায়ণতা তাঁর ন্যায় আর করো ছিল না। সাহস, কষ্ট সহিষ্ণুতা ও সুবিচারের ক্ষেত্রে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন।'

(৫) ঔরঙ্গজেব সরল জীবন যাপন করতেন এবং স্পষ্টবাদী ছিলেন। রাজভাণ্ডারকে তিনি পবিত্র আমানত মনে করতেন এবং নিজের জন্য তা হতে এক পয়সাও ব্যয় করতেন না। কোরআন শরীফ নকল করেও নিজের হাতে টুপি সেলাই করে তিনি জীবিকা নির্বাহ করতেন। তিনি কখনও প্রবৃত্তির দাস হয়ে পড়েননি এবং 'নিষিদ্ধ খাদ্য, পানীয়, পোশাক ইত্যাদি গ্রহণ করতেন না।' কাজেই ব্যক্তিগত জীবনে সরল ও নিরাসক্ত, ধর্মীয় জীবন যাপনে কঠোর, একজন উচ্চ শিক্ষাবিদ দরিদ্র ও শিক্ষিতদের পৃষ্ঠপোষক, উন্নত ধরণের পত্র লেখক, সম্মান ও ন্যায়পরায়ণতার প্রতীক এবং মসী অসির একজন সুদক্ষ ধারক ও বাহক হিসাবে ঔরঙ্গজের প্রকৃত পক্ষেই একজন মহান শাসক ছিলেন।

॥ ষষ্ঠ অধ্যায় ॥

মুঘল আমলের শাসন ব্যবস্থা

(১) মুঘলদের শাসন ব্যবস্থা প্রধানতঃ আকবরেরই রচনা। এ সম্পর্কে এডওয়ার্ডস ও গ্যারেট মন্তব্য করেছেন, "আধুনিক ভার মুঘল-শ্রেষ্ঠ আকবরের শাসন প্রতিভার নিকট বাহ্যিক ভাবে যত প্রতীয়মান হয় তার চেয়েও বেশী ঋণী।" বাবর ও হুমায়ুন ন প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের বহুবিধ সমস্যায় ব্যস্ত ছিলেন বলে তাঁদের কো শাসন ব্যবস্থার দিকে মনোযোগ দিতে পারেন নি। ভারতীয় বৈদেশিক শাসন ব্যবস্থার সংমিশ্রণে মুঘল শাসন ব্যবস্থা গ ওঠেছিল।

(২) সামাজিক অবস্থা : মুঘল যুগে ভারতবর্ষের সামাজিক অব খুব চমক প্রদ ও নানা দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সমাজ ছি সামন্ততান্ত্রিক এবং এটি প্রধানতঃ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল, যথা- অভিজাত, মধ্যবিত্ত ও নিম্নশ্রেণী। সামন্ততান্ত্রিক সমাজে সম্রাট ছিে প্রধান। তাঁর নীচে ছিলেন মন্ত্রী ও আমীরগণ। অভিজাত বর্গ খ জাঁকজমক ও বিলাসিতার মধ্যে জীবন যাপন করতেন। ঔরঙ্গজে ব্যতীত মুঘল সম্রাটদের প্রায় সকলেই মদ্যপায়ী ছিলেন। দোকানদা ব্যবসায়ী, বণিক, মহাজন প্রভৃতি ছিল মাধ্যম শ্রেণীর লোক। মধ্যবি শ্রেণীর লোক অভিজাত শ্রেণীর ন্যায় বিত্তশালী লোক অভিজাত শ্রেণী ন্যায় বিত্তশালী ছিল না। তাদের জীবনযাত্রা ছিল জাঁকজমক হীন সমাজের সর্বনিম্ন স্তরে ছিল সাধারণ শ্রেণীর লোক বা নিম্নশ্রেণীর লো বা নিম্নশ্রেণী ভুক্ত জনসাধারণ। বিদেশী পর্যটক পেলসার্টএর বিবর হতে জানা যায় যে, সাধারণ শ্রেণীর অবস্থা মোটেই সন্তোষজনক ছি না। তারা মাটির ঘরে বাস করত এবং তাদের ওপর নানা প্রকা জুলুম চলত। শাহ্‌জাহানের আমল হতে সাধারণ শ্রেণীর বিশেষত

কৃষকদের ওপর নানাপ্রকার অত্যাচার শুরু হয়। ফলে তাদের অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হয়ে পড়ে। প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ নানাভাবে কৃষক সম্প্রদায়ের নিকট হতে অর্থ আদায় করতেন। হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে আন্তরিক সম্পর্ক ছিল। হিন্দুদেরকে ধর্ম ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করবার পূর্ণ অধিকার দেওয়া হয়েছিল। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে পর্দাপ্রথা ও কৌলীন্য প্রথা প্রচলিত ছিল। সম্রাট আকবর সতীদাহ, বাল্যবিবাহ প্রথা ও কৌলীন্য প্রথা হিন্দু সমাজ হতে তুলে দেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু হিন্দু সমাজের গোঁড়ামীর জন্য তাঁর চেষ্টা ব্যর্থ হয়। মুঘল যুগে অবস্থা ও পদমর্যাদা অনুযায়ী পোশাক পরিচ্ছদের তারতম্য হত। পুরুষ ও নারী উভয়ে কাপড় ছাড়াও প্রচুর পরিমাণে স্বর্ণালঙ্কার ব্যবহার করত। আমোদ প্রমোদ, সঙ্গীত, চিত্র শিল্প, দাবা, পোলো প্রভৃতি খেলার ব্যবস্থা ছিল। সমাজে নারীদের সম্মান ছিল। সেই যুগে অনেক নারীই সাহিত্যানুরাগের পরিচয় দেন।

(৩) অর্থনৈতিক অবস্থা: বাবর ও হুমায়ুনের শাসনামলে জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। বাবর তাঁর আত্মজীবনীতে ভারতীয় জনগণের অবস্থার যে বিবরণ দিয়েছেন তা সঠিক ও তথ্য নির্ভর নয়। গুলবদন বেগমের 'হুমায়ুন নামাতে' ভারতের সস্তা দ্রব্যমূল্য সম্বন্ধে উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, আকবরের জন্মস্থান অমরকোটে একটাকায় চারটি ছাগল পাওয়া যেত। শেরশাহ ভারতের সম্রাট হবার পর তিনি মধ্যযুগীয় মুদ্রার বিলোপ সাধন করে তাম্রমুদ্রা প্রচলন করেন। এই মুদ্রাকে বলা হত 'ডাম'। শেরশাহের মৃত্যুর পর জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থায় এক বিরাট পরিবর্তন এল। আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরীতে এই পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। 'ডাম'জনগণ কর্তৃক সাধারণভাবে ব্যবহৃত হত এবং ঔরঙ্গজীবের আমল পর্যন্ত সাম্রাজ্যের রাজস্ব ডামের হিসাবেই ধরা হত। মজুরির পরিমাণ কম ছিল। একজন অদক্ষ শ্রমিক সাধারণতঃ দৈনিক দু ডাম বা একটাকার বিশ ভাগের এক ভাগ পেত। আর একজন

দক্ষ শ্রমিক পেত সাত 'ডাম' বা দৈনিক আধুনিক টাকায় প্রায় তিন আনা। দ্রব্যের মূল্য কম থাকায় এরূপ কম মজুরী পেয়েও তারা জীবনধারণ করতে পারত। ঐতিহাসিক আবুল ফজল দ্রব্যমূল্যের একটি বিস্তারিত তালিকা দিয়েছেন। এখানে যে কয়েকটি দ্রব্যের মূল্য উল্লেখ করা হল তা হতে আকবরের আমলে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা কিরূপ ছিল বুঝা যাবে।

দ্রব্যের নাম	ডামের প্রতি মণের মূল্য
একমণ গম—	১২ ” ”
বার্লি—	৮ ” ”
জোয়ার—	১০ ” ”
উন্নতমানের চাল—	১১০ ” ”
নিকৃষ্ট চাল—	২০ ” ”
মাষ—	১৬ ” ”
মথ—	১২ ” ”
যব—	৮ ” ”
মুং—	১৮ ” ”
গমের ময়দা—	২২ ” ”
মোটা ময়দা—	১৫ ” ”
বার্লি ময়দা—	১১ ” ”
ঘৃত—	১০৫ ” ”
তৈল—	৮০ ” ”
দুধ—	২৫ ” ”
দধি—	১৮ ” ”
সরু চিনি—	৬ প্রতি সের
সাদা চিনি—	১২৯ প্রতি মণ
বাদামী চিনি—	৫৫

শাক সবজী খুব সস্তায় বিক্রয় হত। জীবজন্তুর দামও খুব কম ছিল। একটি হিন্দুস্থানী ভেড়া দেড় টাকায় কেনা যেত এবং দিল্লী প্রদেশে একটি গরুর দাম ছিল দশ টাকা। খাসি-বকরীর মাংস প্রতি মণ ৬৫ ডামে পাওয়া যেত। বৈদেশিক ভ্রমণকারীদের বিবরণ হতে জানা যায় যে, মুঘল যুগে দেশের অর্থ নৈতিক অবস্থা খুব ভাল ছিল। লোকের কোন অভাব ছিল না। বৈদেশিক পর্যটকগণ মুঘল দরবারের ঐশ্বর্য দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন। বারাণসী, পাটনা, রাজমহল, বর্ধমান, হুগলী, ঢাকা ও চট্টগ্রাম সমৃদ্ধশালী শহর ছিল এবং দেশের অর্থ নৈতিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। কারখানায় উৎপাদন বৃদ্ধিতে রাষ্ট্র উৎসাহ প্রদান করত এবং এই সকল কারখানায় বিভিন্ন প্রকার মূল্যবান সামগ্রী প্রস্তুত হত। লাহোর, আগ্রা, ফতেপুর ও আহমদা-বাদের রাজকীয় কারাখানাগুলিতে উন্নতমানের পণ্য সামগ্রী প্রস্তুত হত। বে-সরকারী পর্যায়ে বস্ত্র তৈরী হত। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, লাহোরে শাল, ফতেপুর সিক্রীতে কার্পেট এবং গুজরাট, বোরহানপুর ও ঢাকার সূতীবস্ত্র।' মুঘল যুগে বঙ্গদেশের কুটীর শিল্প অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ছিল। ঢাকার মসলিন বস্ত্র পৃথিবীর সর্বত্র উচ্চদরে বিক্রয় হত। বৈদেশিক ব্যবসায়-বাণিজ্যে ভারত প্রচুর অর্থব্যয় করত। বাণিজ্য শুল্ক অধিক না থাকায় বিদেশী ব্যবসায়ীরা অত্যন্ত উৎসাহ বোধ করত। কিন্তু ব্যবসায়ীদেরকে স্বর্ণ-রৌপ্য দেশের বাইরে নিয়ে যেতে দেওয়া হত না। ভারতের প্রধান, রপ্তানী দ্রব্য ছিল নীল ও পশম। কৃষি ছিল প্রজাদের মূল উপজীবিকা। সম্রাট আকবর কৃষি উন্নয়নে যথেষ্ট পৃষ্ঠপোষকতা করতেন এবং রাজা টোডরমলের নির্দেশে অনেক পতিত জমি আবাদ করা হয়। কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে যথেষ্ট অর্থ নৈতিক উন্নতি সাধিত হয়। মুঘল আমলে জিনিসপত্রের দাম এত সস্তা ছিল যে, ঔরঙ্গজেবের সময় বঙ্গদেশে টাকায় ৮ মণ চাল বিক্রয় হত। দেশে প্রচুর অর্থ থাকায় সুন্দর সুন্দর প্রাসাদ ও অট্টালিকা নির্মাণ করা সম্ভব হয়েছিল।

(৪) ধর্মীয় অবস্থা : মুঘল সম্রাটগণ স্বীয় ধর্মে আস্থাবান হলেও অন্য ধর্মে হস্তক্ষেপ করতেন না। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলকে তাঁরা ধর্মীয় স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। এমনকি অনেক সময় কোন কোন সম্রাট অর্থ ও বিত্ত দিয়ে বিজিতদের ধর্মকে সাহায্য করতেন। সম্রাট আকবর সকল ধর্মকে একমুখী করতে যেয়ে, 'দীন-ই-ইলাহী' নামে এক নূতন ধর্ম প্রবর্তন করেন। তাঁর কার্যকলাপে অসন্তুষ্ট হয়ে ধর্মপরায়ণ মুসলমান আকবরের বিরুদ্ধে এক বিরাট আন্দোলন পরিচালনা করেন। এর নেতা ছিলেন মুজাদ্দিদ—আলফে সানী। শেখ আহমদ ইতিহাসে মুজাদ্দিদ-আলফে সানী নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। মুজাদ্দিদ-আলফে সানী অর্থ দ্বিতীয় সহস্র বর্ষের ধর্মের পুনঃ প্রচলনকারী। শেখ আহমদ একজন শ্রেষ্ঠ তত্ত্বদর্শনবাদী ছিলেন। সৃষ্টজগতের সঙ্গে স্রষ্টার যে সম্পর্ক, সে সম্বন্ধে তাঁর এক নূতন মতবাদ 'ওয়াদাহতুশ শহুদ' নামে পরিচিত। শেখ আহমদ 'শা'য়ার পালনের ওপর খুব গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি তৎকালীন প্রচলিত ধর্মবিরোধীদের বিরুদ্ধে এক বিরাট আন্দোলন পরিচালনা করেন। তাঁর আন্দোলনের ফলে উপমহাদেশে ইসলাম এক নবজীবন লাভ করে।

(৫) শিক্ষা ও সাহিত্য : মুঘল সম্রাটগণ শিক্ষা ও সাহিত্যের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁরা শিক্ষা বিস্তারের জন্য সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। তাঁরা মসজিদে, মঠে এবং পণ্ডিতদের অর্থদান করে শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। হুমায়ুন দিল্লীতে একটি মাদ্রাসা স্থাপন করেছিলেন। আকবরের রাজত্বকালে স্কুল ও কলেজের শিক্ষা পদ্ধতিতে এক নূতন যুগের সূচনা হয়। তিনি ফতেপুর সিক্রী, আগ্রা এবং অন্যান্য স্থানে কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। জাহাঙ্গীর এবং শাহজাহানও রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে মক্তব ও মাদ্রাসা স্থাপন করে শিক্ষার প্রতি অনুরাগ দেখিয়েছিলেন। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মেয়েরা ছেলেদের সঙ্গে প্রাইমারী স্কুলে লেখাপড়া করত। মুঘল যুগে যে সমস্ত মহিলা ফারসী সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে গুলবদন বেগম, সেলিনা, নূরজাহান, মমতাজ মহল, জাহানারা ও

জেবউন্নিসা প্রসিদ্ধ ছিলেন। মুঘল সম্রাটগণ সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সাহিত্যের ক্ষেত্রে এইযুগ ছিল বিশেষ গৌরবময়। সম্রাটদের মধ্যে বাবর ও জাহাঙ্গীর প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ছিলেন। ইতিহাস সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এইযুগ উল্লেখযোগ্য ছিল। ফারসী ভাষায় আবুল ফজল, আবদুল কাদের বাদাউনী, নিজামউদ্দীন আহমদ, আব্বাস সেরওয়ানী, আব্দুল হামিদ লাহোরী, মোহাম্মদ হাশিম, কাফী খাঁন প্রমুখ বিখ্যাত ঐতিহাসিক এই যুগে বহু ইতিহাস গ্রন্থ লিখে গিয়েছেন। মুঘল যুগে সাহিত্য সাধনায় অগ্রগতি শুধু ফারসী সাহিত্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। এই যুগকে হিন্দুস্থানী সাহিত্যের স্বর্ণযুগ বলা যায়। সম্রাট আকবর হিন্দী কবিতার পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। সম্রাটের সভাসদদের মধ্যে বীরবল, রাজা মানসিংহ এবং রাজা ভগবান দাস প্রখ্যাত কবি ছিলেন। আবদুর রহিম খান-ই-খানান আকবরের দরবারের হিন্দী কবিদের মধ্যে নামকরা কবি ছিলেন। তুলসীদাসও একজন উচ্চাঙ্গের কবি ছিলেন। তাঁর রচিত 'রামচরিত মানস' হিন্দী সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। সুরদাস এই যুগের আর একজন শ্রেষ্ঠ কবি। মুঘল যুগে বহু সংস্কৃত গ্রন্থ ফারসীতে অনূদিত হয়। বঙ্গদেশেও মুঘল যুগে সাহিত্যের ক্ষেত্রে যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল। সে সময় বৈষ্ণব সাহিত্যে বিশেষ উৎকর্ষতা পরিলক্ষিত হয়। চৈতন্য চরিতামৃত রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ, চৈতন্য ভাগবত রচয়িতা বৃন্দাবন দাস, চৈতন্য মঙ্গল রচয়িতা লোচনদাস ঠাকুর, ও জয়ানন্দ প্রমুখ বৈষ্ণব সাহিত্যিকের উদ্ভব এই যুগেই ঘটেছিল। কাশীরাম দাস রচিত 'মহাভারত', কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী রচিত 'চণ্ডীমঙ্গল' প্রভৃতিও এই যুগের সাহিত্য সমৃদ্ধির পরিচায়ক। বঙ্গের নবাব আলিবর্দী খান ও মুর্শিদকুলী খান এবং নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রমুখ বাংলা সাহিত্যের উদার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

(৬) স্থাপত্য শিল্প: মুঘল আমলে উপমহাদেশে স্থাপত্য ও শিল্পকলা বিকাশের জন্য বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য। মুঘলসম্রাটগণ শিল্পের উদার পৃষ্ঠপোষক ও সমঝদার ছিলেন। তাঁদের প্রায় তুশ

বছরের শাসনকালের মধ্যে এই উপমহাদেশের স্থাপত্য, চিত্রকলা, সঙ্গীত প্রভৃতি শিল্পের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিস্ময়কর উন্নতি সাধিত হয়। ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন অংশে তাঁরা যে সকল সুন্দর সুন্দর ভবন ও অট্টালিকা নির্মাণ করেন, তা তাঁদের সুরুচি ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতির চিরন্তন সাক্ষ্যরূপে আজও দণ্ডায়মান রয়েছে। মুঘল সম্রাটগণের নির্মিত বহু ভবন এখনও সৌন্দর্য ও গঠন বৈশিষ্ট্যের জন্য স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। মুঘল স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে এক এক জন এক এক রকম অভিমত প্রকাশ করেছেন। ফার্গুসন বলেন, মুঘল স্থাপত্য সম্পূর্ণ বিদেশী। কারো মতে উহা পাঠান ঐতিহ্যে ভরপুর; আবার কেউ কেউ উহাকে হিন্দু-মুসলিম রীতি, মুঘল রীতি বা দেশীয় রীতির স্থাপত্য বলেও অভিহিত করেছেন। প্রকৃত পক্ষে মুঘল স্থাপত্য রীতি বিভিন্ন রীতির সমন্বয়ে গড়ে ওঠেছে, উহার কিছুটা দেশী এবং কিছুটা বিদেশী। ভারতীয় স্থাপত্য সম্পর্কে মুঘল সম্রাটগণের আদি পুরুষ বাবরের মনোভাব মোটেই ভাল ছিল না। দিল্লী ও আগ্রার অট্টালিকা গুলি দেখে তিনি গভীর অসন্তোষ প্রকাশ করেন। বাবর ছিলেন স্থাপত্য ও শিল্প কলার একজন বড় সমঝদার। তাই তিনি নিজের পছন্দমত ভবন ও অট্টালিকা নির্মাণে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এইজন্য তিনি কনস্ট্যান্টিনোপাল হতে সিনানের শিক্ষার্থীদের আমন্ত্রণ করে আনেন এবং বিপুল সংখ্যক লোককে গৃহনির্মাণের কাজে নিয়োগ করেন। তিনি যে সকল ভবন নির্মাণ করেন তার অধিকাংশই পরবর্তীকালে ধ্বংস হয়ে যায়। বাবরের নির্মিত ভবন গুলির মধ্যে পানিপথের কাবুল বাগে অবস্থিত একটি মসজিদ এবং সম্বলের জামে মসজিদটি আজও টিকে আছে। হুমায়ুন তাঁর রাজত্বকালে নানা গোলযোগ চলতে থাকায় শিল্পকলা প্রসারের দিকে যথেষ্ট মনোযোগ দিতে পারেননি। তথাপি তিনি দিল্লীতে 'দীন-পানাহ ভবন' এবং পাঞ্জাবের ফাতেহাবাদে একটি মসজিদ সহ কয়েকটি ভবন নির্মাণ করেন। স্থাপত্য শিল্প বিকাশের দিকে শেরশাহের যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। তিনি বহু সুন্দর অট্টালিকা ও ভবন নির্মাণ করেন। নিজের জন্য সাসারামে তিনি যে সমাধি সৌধ

নির্মাণ করেন স্থাপত্য কর্মের জন্য তা সুবিখ্যাত ছিল। জীবিতাবস্থায় শেরশাহ এই মনোরম সৌধ নির্মাণ করে যান এবং মৃত্যুর পর এইখানেই সমাহিত করা হয়। এই সৌধ সম্পর্কে ডঃ ভি, এ, স্মিথ বলেন, সর্বোত্তম নকশা ও সৌন্দর্যের দিক হতে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ ভবনগুলির মধ্যে আর কোনটি গৌরব ও মর্যাদায় এর সমকক্ষ হতে পারেনি। শেরশাহের নির্মিত পুরোন কেল্লা এবং উহার অভ্যন্তরস্থ কিল্লা-ই-খান-মসজিদটিও উন্নতমানের স্থাপত্য কর্মের জন্য উল্লেখ যোগ্য। উত্তর ভারতে অবস্থিত ভবন সমূহের মধ্যে কিল্লা-ই-খান-খানন মসজিদ স্থাপত্য গুণের জন্য শ্রেষ্ঠ বলে প্রশংসিত হয়ে থাকে। ভারতে স্থাপত্য কলার সমঝদার ও ক্ষমতাবান সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে সম্রাট আকবরের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ যোগ্য। তাঁর নির্মিত ভবনগুলির মধ্যে হিন্দু ও মুসলিম স্থাপত্য রীতির মিলন ঘটেছে। দুটি স্থাপত্য রীতির মধ্যে মিলন ঘটাতে গিয়ে কোথাও মুসলিম রীতি এবং কোথাও হিন্দু রীতি প্রাধান্য পেয়েছে। ফতেপুর সিক্রী আকবরের এই মহৎ শিল্পপ্রীতির প্রতিফলন বলে পরিগণিত হয়ে থাকে। হিন্দু মুসলিম ঐক্যের জন্য তিনি যে রীতিনীতি অনুসরণ করে চলতেন, তাঁর স্থাপত্য কার্যের মধ্যেও উহার প্রতিচ্ছবি দেখতে পাওয়া যায়। মনোরম অট্টালিকা ও ভবনগুলির নির্মাণে তিনি উদার হস্তে শ্বেত পাথর ব্যবহার করেছেন এবং ফতেপুর সিক্রীর সর্বত্র উহার চিহ্ন বিদ্যমান রয়েছে। এই যুগের স্থাপত্য কীর্তির মধ্যে জামে মসজিদ, শেখ সেলিম চিশ্‌তীর সমাধি, দেওয়ান, সোনেলা মকান, অম্বরের রাজকুমারগণের প্রাসাদ, যোধবাঈ এর প্রাসাদ, তুর্কী সুলতানের প্রাসাদ এবং খাওয়াব গাহ্‌ ও ফতেপুর সিক্রীতে নির্মিত সুন্দর ভবনগুলি অন্যতম। সেকেন্দ্রায় অবস্থিত আকবরের সমাধি ভবন অপূর্ব স্থাপত্য কর্মের জন্য সমগ্র এশিয়ায় অতুলনীয়। এর নির্মাণকার্য আকবর শুরু করেন; কিন্তু শেষ করেন জাহাঙ্গীর আগ্রা নগরীতে তিনি দেওয়ান-ই-আম, দেওয়ান-ই-খাস, জাহাঙ্গীর মহল, প্রভৃতি সুন্দর অট্টালিকা গড়ে তোলেন। আগ্রার দুর্গটি তাঁর ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে নির্মিত হয়েছিল।

আকবরের নির্মিত লাহোরের দুর্গ আগ্রা দুর্গের তুলনায় বিশাল হলেও উহার প্রতিরোধ ক্ষমতা কম ছিল। পরে সম্রাট জাহাঙ্গীর, শাহজাহান ও ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে লাহোর দুর্গ সম্প্রসারিত হয়। জাহাঙ্গীর শিল্পরসিক ব্যক্তি হলেও তাঁর আগ্রহ প্রধানতঃ চিত্রকলা ও উদ্যান রচনার মধ্যে কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়েছিল। তথাপি তাঁর রাজত্বকালে স্থাপত্যকলার প্রসার যে একেবারে ঘটেনি, তা নয়। তিনি সেকেন্দ্রাতে আকবরের সমাধি সৌধের নির্মাণকার্য সমাপ্ত করেন। বেগম নূরজাহান আগ্রাতে তাঁর পিতা ইতিমাদ উদ-দৌলার সমাধির ওপর একটি সৌধ স্থাপন করেন। এটি জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ স্থাপত্য কীর্তি। এই সমাধি-সৌধ সম্পর্কে 'কেমব্রিজ হিস্টরী অব্ ইণ্ডিয়া' গ্রন্থে পার্সী ব্রাউন লিখেছেন, 'সমস্ত মুঘল স্থাপত্যে এর সমকক্ষ আর কোন অট্টালিকা নেই।' এই আমলের উল্লেখযোগ্য সৌধগুলির মধ্যে লাহোরে অবস্থিত জাহাঙ্গীরের সমাধি ভবন অন্যতম। শিখেরা তাদের শাসনকালে এই সমাধির যথেষ্ট ক্ষতি সাধন করে। মুঘল স্থাপত্যের চরম উৎকর্ষ সাধিত হয় সম্রাট শাহজাহানের সময়। তাঁর নির্মিত ভবন ও অট্টালিকাগুলিতে শ্বেতপাথর ব্যাপক ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। পার্সী ব্রাউন বলেন, 'সম্রাট শাহজাহান বেলে পাথরের নির্মিত মুঘল নগরীগুলি শ্বেতপাথরে মুড়ে দিয়ে গিয়েছেন।' স্থাপত্যকলা প্রসারে সম্রাট অতিমাত্রায় আগ্রহান্বিত ছিলেন। তিনি দিল্লী, আগ্রা, লাহোর, কাশ্মীর, কাবুল, কান্দাহার, আজমীর, আহমদাবাদ সহ ভারতের বিভিন্ন স্থানে বহু ভবন নির্মাণ করেন। শাহজাহানের নির্মিত ভবন গুলির মধ্যে কয়েকটি শুধু ভারত উপমহাদেশেই নয়, সারা পৃথিবীতেও অতুলনীয়। সম্রাট তাঁর স্ত্রী আর্জুমান্দ বানু বেগম ওরফে মমতাজ মহলের সমাধির ওপর এক অনিন্দ্য সুন্দর সৌধ নির্মাণ করেন। 'তাজমহল' নামে পরিচিত এই স্মৃতিসৌধ দাম্পত্য প্রেম ও ভালবাসার জলন্ত নিদর্শন হিসাবে চিরদিন অম্লান হয়ে থাকবে। এই ভবন নির্মাণের জন্য সম্রাট দেশ-বিদেশ হতে খ্যাত নামা শিল্পীদের আমন্ত্রণ

করে আনেন এবং তাঁদের সঙ্গে সুদীর্ঘকাল পরামর্শের পর শ্বেতপাথর দ্বারা এটি নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেন। তাজমহলের প্রধান স্থপতি ছিলেন ওস্তাদ ঈসা এবং তাঁর সহকারী হিসাবে কাজ করেন তাঁর পুত্র মোহাম্মদ শরীফ। তাজমহল নির্মাণ করতে ২০ হাজার শ্রমিকের ২২ বছর (১৯৩১-৫৩ খ্রীঃ) সময় লেগেছিল এবং তিনকোটি টাকা ব্যয় হয়েছিল। বিশ্বের সর্বাপেক্ষা সুন্দর ভবনরূপে তাজমহল সমগ্র পৃথিবীর শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের বস্তু। তাজের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে পার্সী ব্রাউন বলেন, "মনে হয় যেন মানুষ ও প্রকৃতি একত্রিত হয়ে অপরূপ এক সৌন্দর্যের সৃষ্টি করেছে।" তাজমহলকে অনেকে 'স্থাপত্যের রাণী', মর্যাদার মুদ্রিত স্বপ্ন' প্রভৃতি বলেও অভিহিত করেছেন। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দৃষ্টিতে তাজমহল কালের কপোল তলে সঞ্চিত অশ্রুবিন্দু। তাজমহল ব্যতীত সম্রাট শাহজাহানের নির্মিত অন্যান্য সুবিখ্যাত ভবন গুলির মধ্যে আগ্রার মতি মসজিদ, দিল্লীর জামে মসজিদ এবং দিল্লীর দুর্গে অবস্থিত 'দেওয়ান-ই-আম' ও দিওয়ান-ই খাস' বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। ময়ূর সিংহাসন শাহজাহানের আর একটি অপরূপ কীর্তি। মতি মসজিদ 'বিশ্বের পবিত্রতম ও সুন্দরতম প্রার্থনা গৃহ' বলে পরিগণিত হয়ে থাকে। জামে মসজিদও যথেষ্ট নয়নাভিরাম ও মনোমুগ্ধকর। সম্রাট শাহজাহানের নির্মিত ভবন সমূহের মধ্যে দেওয়ান-ই খাস সর্বাপেক্ষা অলংকারে বিভূষিত হয়েছে এবং বাদশাহ নিজে একে দুনিয়ার বেহেশত খানা বলে অভিহিত করে গেছেন। 'ময়ূর সিংহাসন অনুরাগী শাহজাহানের শাসনামলের অন্যতম শিল্পকীর্তি। এটি হীরা মণি মুক্তা ও মূল্যবান পাথরের দ্বারা নির্মিত হয়েছিল। শিল্পী বেবাদল খান সাত বছর পরিশ্রম করে (১৬২৮-১৬৩৫ খ্রীঃ) সিংহাসন খানি নির্মাণ করেন। শিল্প ও সৌন্দর্যের প্রতীক কারুকার্য খচিত এই ময়ূর সিংহাসন নির্মাণ করতে এক কোটি টাকা খরচ হয়েছিল। এই সিংহাসন খানি দৈর্ঘে ৩½ গজ, ২½ প্রস্থে গজ এবং উচ্চতায় ৫ গজ ছিল। মাসাম্মান বুরুজ, শিশমহল, নওলাখ খাওয়াব গাহ, মচ্ছিভবন প্রভৃতি অট্টালিকা গুলি নির্মাণের মধ্যে শাহজানের উন্নত স্থাপত্য-রুচির পরিচয়

পাওয়া যায়। ১৬৩১-৩৫ খ্রীষ্টাব্দে শাহজাহান শিশমহল (শাহবুরজ) নির্মাণ করেন। লাহোরে অবস্থান কালে সম্রাজ্ঞী এখানে বসবাস করতেন। এটি বিশ্বের সুশোভিত রাজকীয় বাসস্থানগুলির অন্যতম। শিশমহলের মধ্যে অবস্থিত একটি বাংলো কুঠিকে বলা হত নওলাখ। একখানি ক্ষুদ্র শ্বেত পাথরের মঞ্চরূপে গড়ে তোলা নওলাখ ভবন উহার অপরূপ মসৃন্যতা ও সূক্ষ্ম কারু কার্যের জন্য প্রসিদ্ধ। এটি ভারতে মুঘল স্থাপত্যের একটি উৎকৃষ্টতম নিদর্শন। শালিমার উদ্যান শাহজাহানের উন্নত স্থাপত্য রুচির আর একটি জ্বলন্ত নিদর্শন। শালিমার নামে তিনটি উদ্যান আছে—উহার একটি লাহোরে, একটি দিল্লীতে ও একটি কাশ্মীরের শ্রীনগরে অবস্থিত। লাহোরের শালিমার উদ্যান রাজকীয় প্রমোদ কেন্দ্ররূপে নির্মিত হয়েছিল। বাদশাহ লাহোর সফরকালে এই উদ্যানে অবস্থান করতেন। এইজন্য এখানে কতিপয় মঞ্চ ও গ্রীষ্মাবাস নির্মাণ করা হয়। শাহজাহানের মৃত্যুর পর মুঘল স্থাপত্য কলার পতন আরম্ভ হয়।......ঔরঙ্গজেব এই দিকে যথেষ্ট মনোযোগ না দিলেও স্থাপত্য কর্মের প্রতি যে তাঁর অনুরাগ ছিল না, তা নয়। তিনি যে কতিপয় অট্টালিকা নির্মাণ করেন, স্থাপত্য শিল্প হিসাবে তা গুরুত্ব পূর্ণ। ১৬৭৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি লাহোরের বাদশাহী মসজিদ নির্মাণ করেন। এটি বিশ্বের বর্তমান মসজিদ গুলির মধ্যে বৃহত্তম। এই মসজিদটি নির্মাণ করতে প্রায় তিন বছর সময় লেগেছিল এবং পাঁচ লক্ষাধিক টাকা খরচ হয়েছিল। সুজন রায়ের 'খুলাসাতুল তাওয়ারিখে' ব্যয়ের এই হিসাব প্রদান করা হয়েছে। ঔরঙ্গজেব দিল্লী দুর্গে একটি মর্মর পাথরের মসজিদ নির্মাণ করেন।

(৭) চিত্রকলা : পূর্ববর্তী মুসলিম শাসকগণের ন্যায় মুঘল বাদশাহ গণও চিত্রকলার প্রতি গভীর আগ্রহ প্রদর্শন করেন এবং তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় এর বিশেষ অগ্রগতি সাধিত হয়। মুঘল চিত্রকলায় দেশী ও বিদেশী প্রভাব সমান ভাবে বিদ্যমান রয়েছে। বাবর সৌন্দর্য ও শিল্পকলার উপাসক ছিলেন। তিনি চিত্রশিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় তাঁর সময়ের অঙ্কিত কোন চিত্র এখন

আর দেখতে পাওয়া যায় না। পারস্যে নির্বাসনকালে হুমায়ুনের মনে চিত্রকলার প্রতি অনুরাগ সঞ্চারিত হয়। ভারতে ফিরে আসবার সময় তিনি মীর সঈদ আলী ও খাজা আবছুস সামাদ নামক পারস্যের ছুজন খ্যাতনামা শিল্পীকে সঙ্গে নিয়ে আসেন। এই ছুটি শিল্পী বাদশাহ হুমায়ুন ও তাঁর পুত্র আকবরকে চিত্রাংকন সম্বন্ধে শিক্ষা দান করেন। তাঁরা 'দস্তান-ই-আমির হামজা' পুস্তকে চিত্রায়িত করেছিলেন। চিত্রকলার প্রসারে আকবরের যথেষ্ট দান রয়েছে। খাজা আবছুস সামাদের অধীনে তিনি চিত্রকলার জন্য একটি স্বতন্ত্র বিভাগ খুলে দেন। চিত্রের প্রতি তাঁর ব্যক্তিগত আগ্রহ ছিল বলে তাঁর পছন্দ মোতাবেক চিত্রাংকনের একটি রীতিও গড়ে ওঠে। একে চিত্রাংকনের জাতীয় রীতি বলে অভিহিত করা যায়। ভারতের বিভিন্ন স্থানে ; এমন কি বিদেশ হতে আকবর বহু শিল্পীকে তাঁর দরবারে আমন্ত্রণ করে আনেন। দরবারের এই সব শিল্পীদের মধ্যে সর্বাধিক খ্যাতনামা ছিলেন মীর সঈদ আলী, খাজা আবছুস সামাদ, ফারুক বেগ, দশবন্ত বসাওয়ান, সনওয়াল দাস, তাঁরা চাঁদ ও জগন্নাথ। শাহজাহানের আদেশে চেঙ্গিস নামা, জহর নামা, নলদময়ন্তী, কালিয়দমন, রামায়ণ প্রভৃতি খ্যাতনামা গ্রন্থ তখনকার দিনের অভিজ্ঞ শিল্পীদের দ্বারা চিত্রে শোভিত করা হয়। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে মুঘল চিত্রকলার চূড়ান্ত উন্নতি হয়। এই সময় স্যার টমাস রো তাঁর দরবারে আসেন। তিনি বাদশাহকে চিত্রকলার একজন বড় সমঝদার বলে অভিহিত করে গিয়েছেন। জাহাঙ্গীর চিত্র সমালোচক ছিলেন এবং তিনি ঐতিহাসিক চিত্রসমূহ সংগ্রহ করে রাখতেন। চিত্রকলা সম্পর্কে তাঁর অসাধারণ জ্ঞানের জন্য বাদশাহ গর্ব করে বলতেন, "চিত্রকলা সম্পর্কে আমার জ্ঞান ও চিত্র বিচারের ক্ষমতা এতদূর উন্নীত হয়েছে যে, মৃত বা জীবিত যে কোন শিল্পীর অঙ্কিত চিত্র আমার সম্মুখে এনে দেওয়া হলে আমি মুহূর্ত মাত্র দেখেই পূর্বে না জানা সত্ত্বেও এটি কোন শিল্পীর অঙ্কিত চিত্র তা সঠিক ভাবে বলে দিতে পারি। এমন কি, বিভিন্ন শিল্পী যদি আমার নিজের প্রতিকৃতি অঙ্কন করে আনের, তা হলেও আমি কোনটি কার অঙ্কিত

তা বলে দিতে পারব। আমার প্রতিকৃতি অঙ্কনের সময় যদি একজন শিল্পী মুখ, একজন চোখ ও একজন চোখের ভ্রূ অঙকন করেন তথাপি আমি পৃথক পৃথক ভাবে কোন শিল্পী কি অঙকন করেছেন তা বলে দিতে পারি।" যেকালে শিল্পীরা সাধারণতঃ গাছপালা, পশুপক্ষী ও প্রাকৃতিক দৃশ্য নিয়ে চিত্রাঙকন করতেন। জাহাঙ্গীরের সময়ে খ্যাতনামা শিল্পীদের মধ্যে ফারুক বেগ, মোহাম্মদ নাদির, মোহাম্মদ আগারিজা, ওস্তাদ মনসুর ও বিশন দাসের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর হতে মুঘল চিত্রকলার অবনতি আরম্ভ হয়। শাহজাহানের আগ্রহ স্থাপত্য শিল্পের প্রতি নিবদ্ধ থাকায় উপেক্ষিত হয়ে রইল। শাহীদরবারে চিত্রশিল্পীরা আমীর ওমরাহের নিকট গিয়া চাকরী গ্রহণ করতেন। ওমরাহগণের মধ্যে সামান্য যে কয়জন চিত্রকলার পৃষ্ঠপোষকতা করতেন, তাঁদের মধ্যে আসফ খানের নাম উল্লেখ যোগ্য। তাঁর লাহোরে অবস্থিত বাসভবন শিল্পীরা নানা চিত্রে সুশোভিত করে তোলেন। শাহজাহানের জৈষ্ঠ্য পুত্র শাহজাদা দারাশিকো চিত্রকলার যথেষ্ট সমাদর করতেন। পুনরায় শাহী পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি এটি প্রসারের জন্য চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর দুর্ভাগ্যের জন্য সেই চেষ্টা ফলবতী হয়নি। চিত্রকলার প্রতি ঔরঙ্গজেবের কোন আগ্রহ ছিলনা। বরং তিনি উহার প্রতি বিতৃষ্ণ ছিলেন। কথিত আছে, তিনি বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার প্রাসাদগুলিতে রক্ষিত চিত্রসমূহ বিকৃত করে ফেলেন। তাঁর অনুগ্রহ না পেলেও চিত্রশিল্প একেবারে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়নি। তাই ঔরঙ্গজেবের আমলের অনেকগুলি যুদ্ধের চিত্র আমরা আজও দেখতে পাই।

(৮) সঙ্গীত: কেবল ঔরঙ্গজেব ব্যতীত মুঘল বাদশাহ গণের সকলেই সঙ্গীতের সমঝদার ছিলেন। এই সময় সঙ্গীত বিদ্যা যথেষ্ট উন্নত হয়েছিল। সম্রাট বাবর ছিলেন একাধারে কবি ও শিল্প রসিক। তিনি সঙ্গীত ও যথেষ্ট ভাল বাসতেন। কণ্ঠ সঙ্গীত ও যন্ত্র সঙ্গীত উভয়ই তাঁর নিকট প্রিয় ছিল। তিনি খুব উচ্চমানের সঙ্গীত রচনা করতেন এবং কথিত আছে যে, সঙ্গীতের ওপর তিনি একখানি পুস্তক

রচনা করেছিলেন। হুমায়ুনও সঙ্গীতানুরাগী ছিলেন। তিনি প্রায়ই বাদকদের নিয়ে জলসা করতেন। সপ্তাহে দু-দিন সোমবার ও মঙ্গলবার তিনি গান শোনবার জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন। কথিত আছে, ১৫৩৫ খ্রীষ্টাব্দে মাণ্ডু দখল করবার পর তিনি বাচ্চু নামক জনৈক বন্দীর কণ্ঠে একটি গান শুনে এতখানি মুগ্ধ হন যে, তাকে মুক্তি দিয়ে নিজের দরবারে গায়কের পদে বহাল করেন। সম্রাট আকবরের আমলে সঙ্গীতের প্রভূত উন্নতি হয়। সম্রাট নিজে একজন সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন এবং তিনি সুরও সৃষ্টি করতেন। আবুল ফজলের উক্তি হতে জানা যায় যে, 'শাহানশাহ সঙ্গীতের দিকে খুব লক্ষ্য রাখতেন এবং এই আনন্দ দায়ক শিল্পচর্চার নিয়োজিত সকলেরই তিনি পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। সঙ্গীতে আকবরের অনুরাগ থাকায় নারী-পুরুষ নির্বিশেষে অগণিত ইরাণী, তুরাণী কাশ্মীরী ও হিন্দু সঙ্গীত শিল্পী তাঁর দরবারে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। মিয়া তানসেন ছিলেন আকবরের দরবারে সর্বাপেক্ষা খ্যাতিমান সঙ্গীতকার। মিয়া তানসেন ছিলেন হিন্দু; কিন্তু পরে তিনি ইসলাম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন গোয়ালিয়রের অধিবাসী এবং সেই খানেই তিনি সঙ্গীতের শিক্ষা লাভ করেন। তানসেন সম্পর্কে আবুল ফজল বলেন, ভারতে গত এক হাজার বছরের মধ্যে তাঁর ন্যায় কোন গায়ক জন্ম গ্রহণ করেননি। তৎকালীন বিখ্যাত সঙ্গীতকারদের মধ্যে রামদাস, বৈজুবাওরা ও সুরদাসের নামও উল্লেখ যোগ্য। সঙ্গীত শিল্পী হিসাবে তানসেনের নাম ও উল্লেখ যোগ্য। সঙ্গীত শিল্পী হিসাবে তানসেনের পরেই রামদাসের স্থান। তাঁর অপরূপ গীত বাদ্য পরিবেশনে মুগ্ধ হয়ে বৈরাম খাঁ তাঁকে এক লক্ষ টাকা দিয়ে পুরস্কৃত করেন। বাদশাহ জাহাঙ্গীর ও তাঁর পিতার ন্যায় সঙ্গীতানুরাগী ছিলেন। তিনি সঙ্গীত শিল্পীদের পৃষ্ঠপোষতা করার প্রচলিত রেওয়াজ চালু রাখেন। জাহাঙ্গীর সঙ্গীত শিল্পীদের সাতটি দলে বিভক্ত করে দিয়েছিলেন এবং সপ্তাহের এক একদিন উহার এক একটি দল এসে তাঁর সম্মুখে সঙ্গীত পরিবেশন করত। বাদশাহ নিজেও সুদক্ষ সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন এবং বহু সংখ্যক হিন্দী সঙ্গীত রচনা

করেছিলেন। শাহজাহান ও সঙ্গীতানুরাগী বাদশাহ ছিলেন। তিনি নিজে ভাল গাইতেও পারতেন। তাঁর গানগুলি প্রায়ই খুব আবেগ পূর্ণ হত। ঐতিহাসিক জে, এন, সরকার বলেন, 'শাহজাহানের সুমধুর কণ্ঠস্বর এতই আকর্ষণীয় ছিল যে বহু পুতঃচিত্ত সুফী দুনিয়ার সকল মোহমুক্ত হওয়া সত্বেও তাঁর সান্ধ্য আসরে এসে যোগদান করতেন এবং গান শুনতে শুনতে আবেগে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়তেন।" শাহজাহানের দরবারে প্রধান সঙ্গীতজ্ঞ হিসাবে লালখান (তানসেনের জামাতা), জগন্নার জনার্দন ভাট ও মহাপট্টয়ের নাম উল্লেখ যোগ্য। শাহজাহানের মৃত্যুর পর সঙ্গীত শিল্পের অবনতি আরম্ভ হয়। ঔরঙ্গজেব সঙ্গীত একেবারে পছন্দ করতেন না। তাই গায়ক ও বাদকদের দরবার ছেড়ে চলে যেতে হয়। কিন্তু তা হলেও সঙ্গীতের প্রসার ব্যাহত হয়নি। কারণ রাজপরিবারের লোকেরা, আমীর ওমরাহগণ এবং অমাত্যরা সকলেই সঙ্গীত প্রিয় ছিলেন এবং তাঁরা সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন।

মুঘল শাসনে বঙ্গদেশ

(১) মুঘল শাসনামলে বঙ্গদেশের অর্থনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতিতে এক সুদূর প্রসারী পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল এবং বঙ্গদেশ ও বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে এক নূতন রূপ দেখা দিয়েছিল। মুঘল যুগে বহির্জগতের সঙ্গে বঙ্গদেশের যে যোগাযোগ স্থাপিত হয় তার মাধ্যমে বঙ্গের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে এক নূতন ধারা প্রবাহিত হয়ে আধুনিক বঙ্গদেশ ও বাঙ্গালী জাতির উদ্ভব সম্ভব হয়েছে। সামুদ্রিক বাণিজ্য, বৈষ্ণব ধর্মের বিস্তৃতি, হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে সৌহার্দ বৃদ্ধি, মুসলমান সাহিত্যিক ও ধর্মজ্ঞানীদের উদ্ভব প্রভৃতি এই মুঘল আমলেরই অবদান।

(২) মুঘল আমলে বঙ্গদেশ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এক অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করেছিল এই সময় বঙ্গদেশের ব্যবসা বাণিজ্য বহির্দেশেও বিস্তার লাভ করে। মুঘলদের প্রচেষ্টায় সামুদ্রিক বাণিজ্যের সূচনা

হলে পর্তুগীজ ছাড়াও ওলন্দাজ, ইংরেজ ও ফরাসী বণিকদের সঙ্গে বঙ্গদেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ফলে বঙ্গদেশের উৎপন্ন দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে বিদেশে রপ্তানী হয়। রপ্তানী বাণিজ্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেশে উৎপাদনের ক্ষেত্রেও ব্যাপক উৎসাহ দেখা দেয়। এর ফলে বঙ্গদেশ বিদেশীদের নিকট হতে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে। সম্রাট ঔরঙ্গজেবের শাসনামলে বঙ্গদেশ ভারতের সর্বাপেক্ষা সম্পদশালী প্রদেশ হিসাবে খ্যাতি লাভ করে। বঙ্গদেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির মোটামুটি চারটি কারণ বিদ্যমান ছিল। (ক) কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যের প্রাচুর্য, (খ) নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যাদির স্বল্পমূল্য (গ) বৈদেশিক বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসার (ঘ) প্রচুর পরিমাণে সোনা রূপার আমদানী। মুঘল শাসনামলে বঙ্গদেশের সর্বত্র শান্তি ও শৃংখলা বিদ্যমান ছিল। ফলে বিদেশী বণিকগণ ব্যাপক হারে বঙ্গদেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী হয়। তারা এদেশের বিভিন্ন স্থানে বাণিজ্য কুঠী স্থাপন করে এবং বর্ণিত হারে বঙ্গদেশের পণ্য দ্রব্য বিদেশে রপ্তানী করে। রপ্তানীযোগ্য দ্রব্যের মধ্যে নীল, চিনি, সুতী ও রেশমবস্ত্র বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রপ্তানীর পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে দেশে উৎপাদনের পরিমাণও ব্যাপক বৃদ্ধি পায়। এই সময় উৎপন্ন দ্রব্যের মান বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও প্রতিযোগিতা পরিলক্ষিত হয়। বিদেশী বণিকগণ বঙ্গদেশে পণ্যদ্রব্য ক্রয়ের জন্য প্রচুর পরিমাণে কাঁচা সোনা ও রূপা আমদানি করত। এর ফলে বঙ্গদেশের অর্থনীতিতেও বিরাট পরিবর্তন সূচিত হয়। মুঘল আমলে ঢাকার মুসলিম ছিল জগদ্বিখ্যাত। বিদেশী বণিকরা প্রতি বছর এটা রপ্তানী করে প্রচুর অর্থোপার্জন করত। বঙ্গদেশের অর্থনীতির সংগঠনে ঢাকার মুসলিমের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এই সময় ঢাকা একটি সমৃদ্ধশালী নগরে পরিণত হয়। বঙ্গদেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মুঘল সম্রাটদের রাজস্বের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে বঙ্গদেশ হতে যেখানে ১০ লক্ষ টাকা রাজস্ব প্রদান কষ্টকর ছিল। ঔরঙ্গজেবের আমলে যেখানে বছরে গড়ে এক কোটি টাকা রাজস্ব দেওয়া হত।

(৩) মুঘল শাসনামলে বঙ্গদেশের সমাজ ও সংস্কৃতিতে এক বিরাট পরিবর্তন আসে। মুঘল সুবাদার ও অন্যান্য উচ্চ পদস্থ কর্মচারীদের মধ্যে অনেকেই উচ্চ শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান ছিলেন। এই সমস্ত সুবাদার ও কর্মচারী মুঘল কৃষ্টি ও রীতিনীতির সঙ্গে পরিচিত থাকায় তাঁরা বঙ্গে মুসলিম সভ্যতা বিস্তারে সচেষ্ট হয়েছিলেন। এতদ্ব্যতীত, মুঘল আমলে বহু মুসলমান সুফী, সাধক, আলেম ও ব্যবসায়ী বিভিন্ন মুসলিম সভ্যতার কেন্দ্র হতে বঙ্গদেশে আসেন। মুঘল আমলে বঙ্গদেশে সিয়া সম্প্রদায়ের আবির্ভাব বাঙ্গালী মুসলমানদের বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। বঙ্গদেশের অনেক সুবাদার সিয়া মতাবলম্বী ছিলেন এবং সিয়া সুবাদারদের সময়ে সিয়া মতাবলম্বী মুসলমানগণ দলে দলে এদেশে আসেন। এই সময় হতেই বাঙ্গালী মুসলমানদের সামাজিক জীবনে মহরমের মত উৎসবের সূচনা হয়। আজও শহর এলাকায় মহররম উৎসব অতি আগ্রহ সহকারে পালন করা হয়। বঙ্গদেশের মুসলিম শাসকগণ অত্যন্ত জাঁকজমকের সঙ্গে ঈদ, ফাতেহা-দোয়াজ-দাহাম, শবেবরাত প্রভৃতি ধর্মীয় উৎসব পালন করতেন। নবাব মুর্শিদকুলী খান রবিউল আওয়াল মাসের প্রথম বার দিন অত্যন্ত শান-শওকতের সঙ্গে হযরতের (দঃ) জন্মদিন উদযাপন করতেন। মুসলমানদের ধর্মীয় উন্নতির জন্য মুসলিম শাসকগণ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। বঙ্গদেশের সুবাদার ঢাকাতে একটি বিরাট মাদ্রাসা রক্ষণাবেক্ষণ করতেন। এই মাদ্রাসা লালবাগের শাহী মসজিদে বসত। শিক্ষকদের বেতনসহ মাদ্রাসার যাবতীয় খরচ সুবাদারের তহবিল হতে দেওয়া হত।

(৪) মুঘল যুগে বঙ্গে হিন্দুদের সমাজ জীবনেও কতকগুলি উল্লেখ-যোগ্য সংস্কারের সূচনা হয়। এই সময়ে বৈষ্ণববাদের বিশেষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। মুঘল আমলে কতকগুলি সাধারণ ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সূচনা বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়; যেমন সত্যপীর, দরবেশ, বাউল প্রভৃতি। হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই এইগুলির অনুসারী ছিল। হিন্দু প্রজাদের সামাজিক উৎসবে মুসলিম শাসকরা ও অংশগ্রহণ করতেন।

(৫) ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রেও মুঘল যুগ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তবে মুঘল শাসকগণ এই ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ কোন সহযোগিতা করেন নি। মুঘল পূর্ব যুগের শাসকগণ ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে উদার পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন, মুঘল যুগে বঙ্গের জমিদারগণ তাঁদের প্রচেষ্টার সেই ঐতিহ্য অক্ষুন্ন রেখেছিলেন। বঙ্গদেশে পার্সী ভাষার বিস্তার বাংলা সাহিত্যকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধশালী করেছিল। সুফীবাদ, অতীন্দ্রিয়বাদ এবং বিভিন্ন ধর্মীয় আন্দোলনে বাংলা সাহিত্য বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। মুঘল যুগে বঙ্গের শাসক ও উচ্চ পদস্থ কর্মচারীরা শিক্ষা ও শিক্ষিতদের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। এইদিক দিয়ে খ.ন-খানান মুনিম খান, খান জাহান, রাজা মানসিংহ, ইসলাম খান, কাসিম খান, ইব্রাহীম খান, ফতেহ জঙ্গ, শাহজাদা সুজা, মীরজুমলা, শায়েস্তা খান, শাহজাদা মোহাম্মদ আজম, আজিম-উস-শান ও আরও অনেকের নাম উল্লেখ করা যায়।

[৬] মীর মোহাম্মদ মাসুম একজন উচ্চশিক্ষিত লোক ছিলেন। তিনি শাহজাদা সুজার পৃষ্ঠপোগকতায় 'তারিখ-ই-শাহ সুজা' নামে একখানা ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনা করেন [১৬৬০ খ্রীঃ]। সম্রাট ঔরঙ্গজেবের সময় শিহাবউদ্দীন তালিস নামে বঙ্গের অন্য একজন খ্যাতনামা ঐতিহাসিক ছিলেন। তাঁর ফতিয়া-ই-ইব্রিয়া গ্রন্থখানি বঙ্গের একটি মূল্যবান ইতিহাস। বঙ্গের নবাবদের আমলে বহু প্রতিভাশালী ঐতিহাসিক ও লেখকের আবির্ভাব ঘটে। এই সময়কার ঐতিহাসিকদের মধ্যে ইউসুফ আলী, গোলাম হোসেন তাবাতাবাঈ, কারাম আলী, মোহাম্মদ ওয়াফ, আলী ইব্রাহীম খান ও আজাদ হোসেন বিলগ্রিমির নাম উল্লেখ যোগ্য।

[৭] মুঘল যুগে বঙ্গদেশের শাসকগণ শিল্পকলার ক্ষেত্রে এক বিস্ময় কর অবদান রেখে গিয়েছেন। আজও বঙ্গদেশের বহুস্থানে মুঘলশাসকগণের শিল্প প্রীতির পরিচয় বিদ্যমান রয়েছে জেলার শেরপুরে মুঘল শিল্পকলার অনেক ধ্বংসাবশেষ অদ্যাবধি পরিলক্ষিত হয়। বহু মসজিদ, অট্টালিকা, স্মৃতি সৌধ, মাজার ও দুর্গদ্বারা তাঁরা ঢাকা নগরীকে

গৌরবমণ্ডিত করেছিলেন। এই ক্ষেত্রে শাহ সুজার নাম বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। তিনি ঢাকার প্রথম নির্মাণ কার্য শুরু করেন। বড় কাটরা তাঁর শাসনামলেই নির্মিত হয়। এটি তাঁর বাসগৃহ ছিল। বড় কাটরার নির্মাণ শৈলীতে মুঘল যুগের উন্নত শিল্প রীতির পরিচয় সুপরিস্ফুট। একইভাবে জাহাঙ্গীর নগরে নির্মিত ইমারত গুলিতেও মুঘল নির্মাণ রীতির ঐতিহ্য লক্ষ্য করা যায়। বঙ্গদেশে মুঘল শিল্পকলার বিস্তারের ক্ষেত্রে শায়েস্তাখানের নাম সবিশেষ উল্লেখ যোগ্য। সাতগম্বুজ মসজিদ, পরি বিবির মাজার, চকবাজার মসজিদ, ছোট কাটরা প্রভৃতি তাঁর আমলে নির্মিত হয়। মুর্শিদকুলী খানের আমলে বেগম বাজার মসজিদ তৈরী হয়। বিনোদ বিবির মসজিদ, চুরি হাট্টার মসজিদ, আল্লাকুরি মসজিদ, লালবাগ মসজিদ প্রভৃতিও এই মুঘলযুগে নির্মিত হয়েছিল। মুঘলদের এই শিল্পকীর্তি বঙ্গদেশের সাংস্কৃতিক জীবনে এক সুদূর প্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছিল। মুঘল শাসনামলে বঙ্গদেশে বেশ কয়েকটি দুর্গ নির্মিত হয়েছিল। শাহজাদা আজম লালবাগ দুর্গের নির্মাণ কার্য শুরু করেছিলেন। কিন্তু এর নির্মাণকার্য পরবর্তীকালে আর সমাপ্ত করা হয়নি।

॥ সপ্তম অধ্যায় ॥

সংস্কৃতির আলোকে ধর্ম ও ধর্মশাস্ত্র

হিন্দুশাস্ত্র ও কোরআন সম্পর্কে আলোচনা

(১) ঈশ্বর বা আল্লাহ্ এক : 'এক মে বা দ্বিতীয়ং'। ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়। মোক্ষমূলার লিখেছেন, এই ভাব অতি প্রাচীন ঋগ্বেদেই আছে। মহাভারতে এই ভাষাই আছে। তা ছাড়া অতি প্রাচীন বহু উপনিষদ, বেদান্ত ও ভগবৎ গীতা প্রভৃতি সমুদয় হিন্দু শাস্ত্রই সমস্বরে বলেছেন, 'ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়'। পবিত্র কোর আন ও ঠিক তাই বলেন।

(২) ঈশ্বরের মহিমা : মহাভারত ও সমুদয় হিন্দু শাস্ত্রই এক বাক্যে কীর্তন করেছেন, 'ঈশ্বর অজ, অমর, অনাদি ও অনন্ত। তিনি নিরাকার, সর্বব্যাপী, সর্বশক্তিমান, অপার করুণা নিধান ও মহান্, তিনিই স্রষ্টা, পাতা ও বিলয়কর্তা।' কোরআন ও ঠিক সেই ভাবে আল্লাহ্র মহিমা প্রচার করেছেন।

(৩) উপাসনা : উপনিষদ, বেদান্ত ও মহাভারত প্রভৃতি বহু হিন্দু শাস্ত্র উপদেশ দিয়েছেন যে, 'এক ঈশ্বরের উপাসনা করবে। তাঁর মহিমা কীর্তন, শ্রবণ, মনন ও ধ্যানদ্বারা তাঁর আরাধনা করবে।' কোরআনও ঐরূপ উপদেশ দিয়েছেন।

(৪) 'ঈশ্বরে লীন হওয়াই মানব জীবনের লক্ষ্য।' কোরআন বলেন, 'সকলকেই আল্লাহ্র নিকট ফিরে যেতে হবে।

(৫) উপবাস : হিন্দু শাস্ত্র বলেন, উপবাসে পাপের লাঘব হয়। কোর আনও ঠিক তাই বলেন।

(৬) পৌত্তলিকতা : মহাভারত মঞ্জরীর লেখক বহু হিন্দু শাস্ত্র উদ্ধৃত করে প্রমাণ করেছেন যে হিন্দু ধর্ম পৌত্তলিকতা সমর্থন করে না।

ইসলাম ও বিশ্বনবীও বহু হিন্দু শাস্ত্র উদ্ধৃত করে সিদ্ধান্ত করেছেন, হিন্দু ধর্ম কখনই পৌত্তলিকতা সমর্থন করে না। তা হলে এ বিষয়েও হিন্দু শাস্ত্র ও কোর আনের মত এক।

(৭) প্রাতঃ স্নান: হিন্দুশাস্ত্রানুসারে প্রাতঃস্নান প্রশস্ত। মুসলমান শাস্ত্রানুসারেও মুসলমান বিবাহিত নরনারীর প্রাতঃস্নান কর্তব্য।

২। গীতা ও কোর আনের বহু বিষয় এক:

(১) ঈশ্বরের স্রষ্টা নেইঃ গীতা বলেন, ঈশ্বরের কেউ স্রষ্টা নেই। কোর আন্ ও ঠিক তাই বলেন।

(২) ঈশ্বর সর্বব্যাপী: ইসলাম ও বিশ্বনবী বলেন, 'ঈশ্বরের সর্বব্যাপকত্ব' গীতা ও কোরআন উভয় ধর্ম পুস্তকে সমভাবে বর্ণিত হয়েছে।

(৩) আত্মা: গীতা আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। কোর আনও করেছেন। গীতা বলেন, আত্মার জন্ম নেই, মৃত্যু নেই। কোরআন হতেও তাই অনুমিত হয়।

(৪) জ্ঞান, কর্ম, ভক্তিঃ গীতার বর্ণনীয় বিষয় জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি। কোরআনের ও বর্ণনীয় বিষয়ও তাই। গীতায় জ্ঞানের খুব প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। কোর আনেও দেওয়া হয়েছে।

(৫) কর্মযোগ: গীতার কর্মযোগের উদ্দেশ্য এই যে, মনুষ্যকে কর্ম করবার প্রণালী শিক্ষা দিয়ে সকল বিষয়ে কৃতকার্য করা। কোর আনেরও উদ্দেশ্য তাই।

(৬) কর্তব্য কর্ম: গীতা বলেন, 'কর্তব্য কর্ম করাই ধর্ম।' কোর আন অনুসারেও নৈতিক আদর্শ এই, 'কর্তব্য কর্ম করবে ও সকলকে ভালবাসবে।'

(৭) রিপু জয়: গীতা বলেন, 'রিপুগণকে জয় করবে। নতুবা কর্তব্য কর্ম নির্ণয় করতে পারবে না।' কোরআন বলেন, 'রিপু-গণের দাস হয়ো না। তা হলে সত্য নির্ণয় করতে পারবে না।'

(৮) নিষ্কাম কর্ম: গীতা সকল কর্মই নিষ্কামভাবে করতে উপদেশ দিয়েছেন। কোর আনও ঠিক সেইরূপ আদেশ করেছেন।

(৯) কর্মফল: গীতা বলেন, 'কর্মফল ঈশ্বরে অর্পণ করবে।' কোরআন বলেন, 'সকল কর্মই' আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে করবে। বস্তুতঃ গীতা ও কোরআন একই ভাবে মানবকে অনুপ্রাণীত করে কর্মে লিপ্ত হতে উৎসাহিত করছে।

(১০) কর্মত্যাগ: গীতা কর্মত্যাগ বিরোধী। কোরআনও কর্মত্যাগের পরিপন্থী।

(১১) অদৃষ্টবাদ: গীতা অদৃষ্টবাদ বিরোধী। 'অদৃষ্টবাদ মুসলমান ধর্মেরও অংশ নয়। কারণ, হযরত মোহাম্মদ পরিষ্কার রূপে শিক্ষা দিয়েছেন, 'তোমার যত দূর সাধ্য। ততদূর কার্য করবে। তারপরে অবশিষ্টের জন্য আল্লাহ্‌র ওপর নির্ভর করবে।' সুতরাং এ বিষয়েও গীতা ও কোরআন এক।

(১২) জাতিভেদ: গীতা জাতিভেদ ও আভিজাত্য বিরোধী। কোর আন ও সেইরূপ বিরোধী।

(১৩) মৌনাবলম্বন: গীতা মধ্যে মধ্যে মৌনাবলম্বনের প্রশংসা করেছেন। হযরত মোহাম্মদ ও মধ্যে মধ্যে মৌনাবলম্বন করতেন।

(১৪) আনন্দ: গীতা বলেন, 'যে আনন্দ বাইরের বস্তু সাপেক্ষ নয়, কিন্তু মনের দ্বারা মনের মধ্যেই উৎপন্ন হয়, তাই প্রকৃত আনন্দ। কোর আনও তাই বলেন।

(১৫) মধ্যপন্থা: গীতা মধ্যপন্থার পক্ষপাতী। কোর আন ও তাই। তা হলে গীতা ও কোরআন উভয়েই ধর্মের বাড়াবাড়ীর বিরোধী; গোঁড়ামির পরিপন্থী।

(১৬) মহাপুরুষ: গীতা বলেন, 'ধর্মের গ্লানি হলে ঈশ্বর সকল দেশেই, সকল জাতির মধ্যেই ধর্ম সংস্কারক মহাপুরুষ রূপে আবির্ভূত হয়ে থাকেন।' তা হলে এও স্বতঃসিদ্ধ যে তাঁদের প্রচারিত সকল ধর্ম ও সত্য; সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হিন্দুগণের কর্তব্য। কোর আন বলেন, আল্লাহ্‌ সকল দেশেই সকল জাতির মধ্যেই ধর্ম সংস্কারক মহাপুরুষগণকে প্রেরণ করে থাকেন। আর সেই সকল মহাপুরুষগণের মধ্যে পার্থক্য নেই। পৃথিবীর সমুদয় ধর্ম সংস্কারক ও তাঁদের ধর্ম ও

ধর্ম গ্রন্থকে শ্রদ্ধা করবে। এই জন্য মহাত্মা হযরত মোহাম্মদ খ্রীষ্টকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। এইজন্য কোর আন—ধর্মমন্দির, গীর্জা, মঠ ও ও মসজিদ প্রভৃতি সকল ধর্মের উপাসনা স্থান রক্ষার্থে যুদ্ধ করা কর্তব্য বলেছেন।

(১৭) বিশ্বপ্রেম: বিশ্বপ্রেম গীতা ও কোরআনে সমভাবে সমর্থিত হয়েছে। সর্বভূত হিত সাধন করতে গীতা যেমন পাতায় পাতায় উপদেশ দিয়েছেন, কোরআনও তেমনি কত প্রকার আদেশ করেছেন। গীতা বলেন, 'তোমার জন্য নয়, কিন্তু সকলের হিতের জন্য সতত কর্ম করবে।' কোরআন ও ঠিক তাই বলেছেন। হযরত মোহাম্মদ বলেছেন, 'লোক হিতার্থে কর্ম করবে। যদি আল্লাহ্‌কে ভালবাসতে চাও, আগে তাঁর সৃষ্ট জীবকে ভালবাস। যিনি আল্লাহ্‌র সৃষ্টি জীবকে ভালবাসেন না, আল্লাহ্ তাঁকে ভালবাসেন না।'

(১৮) জীবে দয়া: শুধু মানুষকে নয়। গীতা-জীব জন্তু সকলকেই ভালবাসতে বলেছেন। কোরআন ও সেইরূপ আদেশ করেছেন।

(১৯) সত্য ধর্ম: গীতা বলেন, "ঈশ্বর সকল দেশেই ধর্ম সংস্কারক মহাপুরুষ রূপে আবির্ভূত হয়ে থাকেন।" তা হলে এও স্বতঃসিদ্ধ যে, তাঁদের প্রচারিত সকল ধর্মও সত্য। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলতেন, 'সকল ধর্মেই সত্য আছে, সকল ধর্মই সত্য।' 'কোর আন বলেন, হযরত মোহাম্মদের পূর্বেও যে সকল ধর্ম সংস্কারক মহাপুরুষদের অভ্যুদয় হয়েছে, তাঁদেরকেও বিশ্বাস করবে। কোর আনের পূর্ববর্তী সমুদয় ধর্ম সংস্কারক মহাপুরুষদেরকে বিশ্বাস করবে। তাঁদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এটি পরিষ্কার রূপে প্রমাণ করছে যে, ইসলাম কোন ধর্মের সত্য অস্বীকার করেন না। উপরন্তু কোর আন দাবী করেন যে, তা হিন্দু ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, খ্রীষ্ট ধর্ম ও কোর আনের পূর্ববর্তী আর সমুদয় ধর্মের একত্র সমাবেশ। এ ছাড়া কোর আনের দ্বিতীয় সূরার প্রথম শ্লোক আমাদেরকে আদেশ করেছেন, যা হযরত মোহাম্মদের নিকট প্রকাশিত হয়েছিল, কেবল তাই বিশ্বাস করবে না,

কিন্তু তাঁর পূর্ববর্তীদের নিকটেও যা প্রকাশিত হয়েছিল, তাও বিশ্বাস করবে। এ পরিষ্কার রূপে প্রমাণ করছে যে, জগতে অনেক সত্য ধর্ম আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। আর সে সকলের মধ্যে মুসলমান ধর্ম ও একটি সত্যধর্ম। মহাভারত বলেন, 'যে ধর্মের সঙ্গে অন্য ধর্মের বিরোধ নেই তাই সত্য ধর্ম। গীতার ধর্মের সঙ্গে কোর আনের ধর্মের বিরোধ নেই। এজন্য উভয় ধর্মই সত্য।

(২০) মুক্তি: গীতা বলেন, 'যে যে-ভাবে ঈশ্বরের উপাসনা করে, সে তাতেই ফল পাবে।' কোর আনও তাই বলেন। মোহাম্মদ প্রচার করেছেন, 'যে কোন ব্যক্তি আল্লাহ্‌তে ও পরজীবনে বিশ্বাস করে ও ন্যায় অনুসারে কার্য করে; সে ইহুদী সেবিয়ান বা খ্রীষ্টান হোক, তার ভয় নেই।

(২১) কাপুরুষতা: এটি গীতা ও কোর আনে সমভাবে নিন্দিত হয়েছে।

(২২) সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা: গীতা মুক্ত কণ্ঠে সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার মহিমা কীর্তন করেছেন। কোর আন ও সে সকলের মহিমা প্রচার করেছেন। হিন্দু ধর্মের লক্ষ্যই মুক্তি অর্থাৎ সর্বপ্রকার স্বাধীনতা। হিন্দু রাজনীতিরও এ একটি মূল নীতি যে, গৃহ অপেক্ষা ও স্বাধীনতা অধিকতর মূল্যবান ও গৃহ বিসর্জন দিয়েও স্বাধীনতা রক্ষা করা উচিত। হযরত মোহাম্মদ বলেছেন, 'স্বাধীনতা মানব জীবনের জন্মগত অধিকার। অপরিবর্তনীয়, চিরস্থায়ী মুসলমান ধর্ম ব্যবস্থার নাম শরীয়ত। সেই শরীয়তে আছে 'স্বাধীনতা অর্জন মানব জীবনের সর্বপ্রধান আকাঙ্ক্ষার বস্তু, স্বাধীনতা ভিন্ন প্রকৃত সুখ, প্রকৃত শান্তি কখনও সম্ভব হয় না।'

(২৩) স্বদেশোদ্ধার: কৌরবেরা অতি অন্যায় ও অবৈধ উপায়ে পাণ্ডবদের দেশ অধিকার করেছিল। কৃষ্ণ স্বদেশ উদ্ধারের জন্য পাণ্ডবদেরকে উৎসাহিত করেছেন, আর ঐরূপ যুদ্ধ ধর্ম-যুদ্ধ বলে মত দিয়েছেন। কোরাইশরাও অন্যায় ও অবৈধরূপে হযরত মোহাম্মদ ও মুসলমানদেরকে তাঁদের জন্মভূমি মক্কা নগরী হতে বিতাড়িত ও বঞ্চিত

করেছিল। হযরত মোহাম্মদও স্বদেশ উদ্ধারের জন্য মুসলমানদেরকে উৎসাহিত করেছেন, আর ঐ রূপ যুদ্ধ ন্যায় সঙ্গত বলে মত প্রকাশ করেছেন। তা অপক্ষাও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কৃষ্ণ গীতায় যে যুক্তি দ্বারা অর্জুনকে ধর্ম-যুদ্ধে প্রবৃত্ত করেছিলেন, হযরত মোহাম্মদও ঠিক সেই যুক্তি দ্বারা মুসলমানকে যুদ্ধান্তে প্রবোধ দিয়েছিলেন, 'তুমি তাদের কে নিহত করনি, আল্লাহ্ই তাদের কে নিহত করেছেন। তুমি তাদের কে আঘাত করনি, আল্লাহ্ ই তাদেরকে আঘাত করেছেন।'

(২৪) চরিত্র: মহাভারত পুনঃ পুনঃ বলেছেন, 'যিনি রিপুগণকে সংযত করেছেন, তিনিই ধর্মের সার জেনেছেন।' গীতা বলেন, 'চরিত্র বিশুদ্ধ করে দেশহিত সাধন কর।' এটিই গীতার সর্বপ্রধান উদ্দেশ্য ও শিক্ষার সার। গীতার আর সমুদয় বিধি তার উপায় মাত্র। কোর আন বলেন, 'যে কোন ব্যক্তি আল্লাহ্র দিকে অগ্রসর হয় ও যা ন্যায়সঙ্গত তাই করে, সে আল্লাহ্র নিকট পুরস্কৃত হবে। বস্তুতঃ মানুষের ত্রিবিধ উন্নতি সাধনই পবিত্র কোরআনের সমুদয় লক্ষ্য ও শিক্ষার সার। কোরআনের আর সমুদয় আদেশ শুধু সেই উদ্দেশ্য সাধনের উপায় মাত্র। Islamic Review লিখেছেন, 'আল্লাহ্ প্রেরিত মোহাম্মদ বলেছেন, কোন ব্যক্তি নামায, রোযা, দারিদ্রে দান, মক্কার তীর্থে গমন ও আর সমুদয় সৎকার্য করলেও ভক্তির অনুপাত ব্যতীত পুরস্কৃত হবে না।' কোরআন বলেন, 'তোমার মুখ পূর্বদিকে বা পশ্চিমদিকে ফিরালে ধর্ম হয় না।' এই সমুদয় পরিষ্কার রূপে প্রমাণ করছে যে, মুসলমান ধর্ম ধর্মের বাহ্য অনুষ্ঠানকেই অত্যাবশ্যক বলে মনে করে না। কোরআনের বিভিন্ন জায়গায় এ বিষয়টির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে—(১) চরিত্রের উন্নতি হলে এই জীবনেই স্বর্গলাভ হয় (২) নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্র দৃষ্টিতে সর্বোত্তম মনুষ্য সেই, যে তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সৎ (৩) কোরআন আরও বলেন, 'যারা সৎ কর্ম করে, তাদেরকে আল্লাহ্ ভালবাসেন।' ইব্রাহীম নামাযাদি বা মুসলমান ধর্মের কোন বাহ্য অনুষ্ঠানই প্রতিপালন করেন নি। তথাপি কোরআন বলেছেন,

'তিনি বিশুদ্ধ মুসলমান ছিলেন। মহাত্মা গান্ধীও কখনও নামাযাদি করেন নি। তথাপি মুসলমান সমাজের জনৈক প্রধান নেতা আগা খাঁ লিখেছেন, 'মহাত্মা গান্ধী একজন মুসলমান।' কত পীর ও শাহ্‌সাহেব আছে, যাঁরা নামাযাদি বা ধর্মের বাহ্য অনুষ্ঠান প্রতিপালন করেন না, তথাপি তাঁরা চরিত্র বিশুদ্ধ করে দেশহিতে রত রয়েছেন বলে শ্রেষ্ঠ মুসলমানদের মধ্যে পরিগণিত ও অত্যন্ত সম্মানিত। আবার কোরআনের আদেশ এই, 'যদি কোন পুরুষ ব্যভিচার করে তবে তাকে ১০০ কোড়া (চাবুক বিশেষ) মারবে।' হাদীসের (মোহাম্মদের বাণী) আজ্ঞা এই, 'সে ব্যক্তি যদি বিবাহিত হয়, তবে তার ওপর প্রস্তর নিক্ষেপ করে তাকে নিহত করবে।' সে ব্যক্তি যদি নামায ও রোযা করে, তবে তাকে ক্ষমা করবে। এ কথা কোরআন বলেন নি, মোহাম্মদও বলেন নি। শুধু তাই নয়, হযরত মোহাম্মদের এক সহচর নামায, রোযা প্রভৃতি সকলই করত; কিন্তু ব্যভিচার করেছিল। হযরত মোহাম্মদের আদেশে তার ওপর প্রস্তর নিক্ষেপ করে তাকে নিহত করা হয়েছিল। দ্বিতীয় খলিফা মহাত্মা উমরের পুত্রও নামায রোযা প্রভৃতি করত, কিন্তু সেও ব্যভিচার করেছিল। তখন উমরের আদেশে তাকে কোড়া মারতে থাকলে, সে সেই যন্ত্রণায় প্রাণত্যাগ করেছিল। এই সকল দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পবিত্র কোরআন ও মহাত্মা মোহাম্মদ, উভয়ই নামায রোযা অপেক্ষা চরিত্রের বিশুদ্ধতাই শ্রেষ্ঠতর বলে ধার্য করেছিলেন। কোরআন বলেন, 'যদি আল্লাহ্‌কে ভালবাসতে চাও, আগে তাঁর সৃষ্ট জীবকে ভালবাস। যিনি আল্লাহ্‌র সৃষ্ট জীবকে ভালবাসেন না, আল্লাহ্ তাঁকে ভালবাসেন না।' চরিত্র বিশুদ্ধ না হলে কি এই মহোচ্চ আদর্শ জীবনে পরিণত করা যায়? যিনি ইন্দ্রিয়ের দাস, তিনি স্বার্থের দাস। তিনি কি প্রকারে পর প্রেমে পাগল হবেন? মোদ্দা কথা হল এই যে, 'মনুষ্যের ত্রিবিধ উন্নতি সাধনই পবিত্র কোরআনের সমুদয় লক্ষ্য ও শিক্ষার সার। কোরআনের আর সকল আদেশ শুধু সেই উদ্দেশ্য সাধনের উপায় মাত্র। তা হলে চরিত্র বিশুদ্ধ করাই কোরআনের উদ্দেশ্য। নামায

রোযা আদি সেই উদ্দেশ্য সাধনের উপায় মাত্র। গীতা ও কোরআন, উভয় ধর্মগ্রন্থেরই একই উদ্দেশ্য—চরিত্র বিশুদ্ধ করে দেশোপকার করা। তা যিনি করেন না, তিনি গীতা ও কোরআনের আর সকল বিধি প্রতিপালন করলেও সকলই বৃথা। মহাভারত বলেন, 'যিনি চতুর্বেদ অধ্যয়ন করেছেন, কিন্তু চরিত্র বিশুদ্ধ করেন নি, তাঁর সকল পরিশ্রম পণ্ড হয়েছে। হিন্দু ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, খ্রীষ্ট ধর্ম ও মুসলমান ধর্ম—সকল ধর্মই নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। সকল ধর্মই নীতি প্রধান। চরিত্র বিশুদ্ধ করে দেশোপকার করা বৌদ্ধ ধর্মের সার, গীতার ধর্মের সার, বাইবেলের ধর্মের সার, কোরআনের ধর্মের সার। জিজ্ঞাসা করি, এ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ধর্ম আর আছে কি? মহাভারত বলেন, 'যাঁর চরিত্র বিশুদ্ধ ও যিনি দেশহিতে রত তিনি যে জাতিরই হোন না কেন, তিনিই ব্রাহ্মণ। জিজ্ঞাসা করি, তাহলে চরিত্রবান ও দেশসেবক হিন্দু আর চরিত্রবান ও দেশসেবক মুসলমান, উভয়ের মধ্যে প্রভেদ কি? গীতা ও কোরআনে আরও কত বিস্ময়কর সৌসাদৃশ্য আছে, কত লিখব? এক কথায়, গীতা যেমন উদার, অসাম্প্রদায়িক, সার্বজনীন, সার্বভৌম ও বিশ্ব প্রেমের ধর্ম। কোরআনও সেইরূপ। গীতা যেমন সকল ধর্ম সমন্বয়ের, সকল জাতিকে এক করবার ধর্মশাস্ত্র, কোরআনও সেইরূপ।

৩। মহাভারত ও কোরআনের বহু বিষয় এক: মহাভারত বলেন, 'ধর্মের সংক্ষিপ্ত নিয়ম এই, 'আত্মবৎ সকলকে ভালবাসবে। অপরের নিকট যেরূপ ব্যবহার প্রত্যাশা কর, অপরের প্রতিও সেইরূপ ব্যবহার প্রদর্শন করবে।' কোরআনও ঠিক তাই বলেন, 'তুমি কি আল্লাহ্‌কে ভালবাস? তা হলে প্রথমে তাঁর সৃষ্ট জীবকে ভালবাস। তুমি কি আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী হতে চাও? তা হলে তাঁর জীবগণকে ভালবাস। তুমি তোমাকে যেরূপ ভালবাস, তাদেরকেও সেইরূপ ভালবাসবে। তুমি যে ব্যবহার ভালবাসনা, তা তাদের প্রতিও করো না। তাদের নিকট যেরূপ ব্যবহার প্রত্যাশা কর, তাদের প্রতিও সেইরূপ ব্যবহার প্রদর্শন করবে।' কি সুন্দর! কি

মনোহর ! মহাভারতে আছে, মানুষ প্রথমে স্বর্গে জন্মে, পরে উত্তর কুরুতে তাড়িত হয়। কোরআন বলেন, 'মানুষ প্রথমে স্বর্গে জন্মে, পরে পৃথিবীতে তাড়িত হয়।' মহাভারত অনুসারে স্বর্গ সাতটি, কোরআন অনুসারেও সাতটি। মহাভারত বলেন, স্বর্গে উদ্যান, নদী, বৃক্ষ, ফল, অট্টালিকা, খাদ্য, মণি, মুক্তা ও বেশ্যা (অপ্সরা) আছে। কোরআনও বলেন, স্বর্গে ঐ সকল আছে। মহাভারত বলেন, স্বর্গে সুখের সীমা নেই। কোরআনও তাই বলেন। মহাভারত বলেন, নরকে অগ্নি ও উষ্ণ জল আছে, আর পাপীরা তাতে দগ্ধ হয়। কোরআনও ঠিক তাই বলেন। মহাভারত যেমন সকলকে স্বর্গ-সুখের প্রলোভন দিয়ে সৎকার্য করতে প্রলুব্ধ করছেন, আর নরক যন্ত্রণার ভয় দেখিয়ে কুকার্য হতে বিরত করছেন, কোরআনও ঠিক সেইরূপ করছেন। মহাভারত বলেন, 'যুদ্ধে নিহত ব্যক্তি স্বর্গে যাবে, আর যুদ্ধে যে ব্যক্তি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে, সে নরকে যাবে।' কোরআনও ঠিক তাই বলেন। মহাভারতে আছে, পাপ করে মহাজনের নিকট প্রকাশ করলে ও অনুতাপ করলে পাপের লাঘব হয়। কোরআনেও ঠিক তাই আছে। মহাভারত বলেন, সকলেই স্বীয় স্বীয় কর্মফল ভোগ করবে। কোরআনও তাই বলেন। মহাভারতে হিন্দুগণের তীর্থযাত্রার বিধান আছে। কোরআনেও মুসলমানগণের তীর্থযাত্রার (মক্কায়) গমনের আদেশ আছে। মহাভারত দীন দুঃখীকে দান করতে আদেশ দিয়েছেন। কোরআনও মুসলমান-গণকে সেইরূপ করতে আদেশ করেছেন। মহাভারত হিন্দুগণকে ব্রাহ্মমূহূর্তে ওঠে ঈশ্বরের নামকীর্তন করে কর্তব্য কার্যে লিপ্ত হতে বলেছেন। কোরআনও মুসলমানগণকে সেই সময়ে উঠে নামাযাদি কার্য করতে উপদেশ দিয়েছেন। মহাভারত পিতৃ মাতৃভক্তির কতই উৎসাহ দিয়েছেন। কোরআনও সেইরূপ দিয়েছেন। মহাভারত নারী জাতিকে সম্মান করতে বলেছেন। কোরআনও সেইরূপ বলেছেন। মহাভারত উশীনর রাজার গল্প দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন, 'তোমার প্রাণ দিয়েও যে কোন জাতির বিপন্নের প্রাণ রক্ষা করবে।"

তেমনি কোরআনও শিক্ষা দিয়েছেন। তোমার প্রাণ তুচ্ছ করে স্বধর্মী কি বিধর্মী, শত্রু কি মিত্র, বিপন্ন মাত্রেরই প্রাণ রক্ষা করবে। মহাভারত বলেন, ধৈর্যই ধর্মের সহায়। কোরআন বলেন, আল্লাহ্ ধৈর্যশালীর সহায়। মহাভারত ক্ষমার অশেষ গুণকীর্তন করেছেন। কোরআনও ক্ষমার বহু গুণ বর্ণনা করে বলেছেন, 'ক্ষমাই মুসলমানগণের একমাত্র ভূষণ।' মহাভারত বলেন, অন্যায়ের দ্বারা অন্যায়ের প্রতিকার হয় না।' কোরআন বলেন, 'ভালর দ্বারা মন্দের প্রতিকার করবে।' মহাভারত রাত্রি-ভোজীর অর্থাৎ প্রত্যহ সমস্ত দিন উপবাস করে রাত্রিতে যে ভোজন করে, তার প্রশংসা করেছেন। কোরআনও বছরে একমাস রাত্রি ভোজীর (রোযার) ব্যবস্থা করেছেন। মহাভারত জাতিভেদ বিরোধী। কোরআনও জাতিভেদ বিরোধী। মহাভারত বলেন, 'হাতা ব্যঞ্জন পরিবেশন করে, কিন্তু তার স্বাদ জানেন না। সেইরূপ যারা শাস্ত্র আলোচনা করে, কিন্তু তার অর্থ বোঝে না তারা সেই হাতা বৈ আর কি?' সৈয়দ আমীর আলী লিখেছেন, 'মুসলমান ধর্মের সংস্কার তখন আরম্ভ হবে, যখন এ স্বীকৃত হবে যে, আল্লাহ্‌র বাক্য যে কোন ভাষায় অনুবাদিত হলেও তার ঐশ্বরিক ভাব থাকে এবং যে কোন ভাষায় উপাসনা করলেও, তা আল্লাহ্‌র নিকট গৃহীত হয়।' হযরত মোহাম্মদ তাঁর বিদেশী শিষ্যগণকে তাদের নিজের ভাষায় নামায করতে অনুমতি দিয়েছিলেন। মুসলমান ধর্মের প্রথম যুগে সকলেই একমত ছিলেন যে, না বুঝে উপাসনা করা বৃথা। ইমাম আবুহানিফার এইমত যে, 'যে কোন ভাষায় নামায ও খোৎবা পড়া বা ধর্ম সম্বন্ধীয় উপদেশ দেওয়া বিধি সম্মত ও সিদ্ধ।' মৌলানা হাসান বাসারী পারস্য ভাষায় নামায পড়তেন। হায়! কোরআন ও নামাযের স্বরূপ না বোঝেইত যত অনর্থের কারণ!

৪। হিন্দু ও মুসলমানের জাতি ও জন্মভূমি এক : হিন্দুদের যে জাতি, অধিকাংশ মুসলমানেরও জাতিত্ব হিসাবে সেই জাতি। মুখ দেখে কেউ বলতে পারে না, এটি হিন্দু, আর এটি মুসলমান।

অধিকাংশ মুসলমানই যে হিন্দু সন্তান! হিন্দুগণ দলে দলে মুসলমান হয়ে মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে। হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের শরীরে একই রক্ত প্রবাহিত। আমরা এই গ্রন্থে প্রমাণ করেছি যে, হিন্দুদের সঙ্গে মুসলমানদের আচার ব্যবহার প্রভৃতি অসংখ্য বিষয়ে মিল! তাতেও প্রমাণিত হচ্ছে যে, পনের আনা মুসলমানই হিন্দু সন্তান ও যে সকল হিন্দু পরে মুসলমান হয়েছিল, তারা তাদের হিন্দু আচার ব্যবহার প্রভৃতি অসংখ্য বিষয় মুসলমান সমাজেও দিয়েছিল। হিন্দু ও মুসলমান সকলেই সহোদর। তারপর, অসংখ্য হিন্দু ও মুসলমান পরস্পরের সঙ্গে ভাই, ভাই, কাকা, বাবা প্রভৃতি পবিত্র ধর্ম সম্পর্কে আবদ্ধ, পরস্পরের প্রগাঢ় প্রণয়ে জড়িত। আবার, মুসলমান ধর্মের অনুশাসনেও হিন্দু ও মুসলমান পরস্পর ভ্রাতৃভাবে আবদ্ধ। হিন্দুদের যে জন্মভূমি, মুসলমানদেরও সেই জন্মভূমি। হিন্দুদের যে দেশ, মুসলমানদের ও সেই দেশ। হিন্দুদের পিতা মাতা প্রভৃতি প্রিয়জনের দেহ যে দেশের লাটিতে মিশে রয়েছে, মুসলমানদেরও পিতা মাতা প্রভৃতি প্রিয়জনের দেহ সেই মাটিতে রয়েছে। নিশ্চয়ই হিন্দু ও মুসলমান রেলের যাত্রী নয়। পাঁচ মিনিটের জন্য দেখা সাক্ষাৎ, পাঁচ মিনিটের জন্য একত্র বাস। তার পরে এক একজন এক এক ষ্টেশনে নেমে যায়, জীবনে আর কখন ও 'দেখা সাক্ষাৎ হয় না। যে পর্যন্ত চন্দ্র সূর্য থাকবে, ভারতবর্ষ থাকবে, সে পর্যন্ত হিন্দু মুসলমান একত্রে বাস করবে, একত্র কার্য করবে। একের সুখে অপরে সুখী হবে, একের দুঃখে অপরে অশ্রু বর্ষণ করবে। কে তার অন্যথা করবে ?

৫। হিন্দু ও মুসলমানের সভ্যতা ও স্বার্থ এক: হিন্দুদের গীতা ও মহাভারতের সঙ্গে মুসলমানদের কোরআনের কত মিল! হিন্দু জাতির সামাজিক নিয়মের কত মিল! হিন্দুদের যেরূপ বেশভূষা, মুসলমানদেরও সেইরূপ বেশভূষা। হিন্দুগণ যেরূপ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, মুসলমানগণ ও সেইরূপ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কি কৃষিক্ষেত্রে, কি হাট বাজারে, কি স্কুল কলেজে, কি অপিস

আদালতে, কি খেলার মাঠে, সর্বত্র হিন্দু মুসলমান গলাগলি ধরে কার্য করে। একই শকটে গায়, বসে ভ্রমণ করে। একই স্থানে, একই আসনে গায়, বসে প্রাণ খুলে গল্প করে, হাস্য পরিহাস করে। হিন্দুদের যে মাতৃভাষা, মুসলমানেরও সেই মাতৃভাষা। হিন্দু জনসাধারণ যেরূপ শিক্ষিত, মুসলমান জনসাধারণ ও সেইরূপ শিক্ষিত। হিন্দুগণ যেরূপ উন্নত, মুসলমানগণও সেইরূপ উন্নত। হিন্দুদের যেরূপ সভ্যতা, মুসলমানদের ও সেইরূপ সভ্যতা। দেশে অর্থকষ্ট হলে হিন্দু মুসলমান সমভাবে দুঃখ পায়। কলেরা, বসন্ত, ম্যালেরিয়া, প্লেগ, ভূমিকম্প, জলপ্লাবন ও দুর্ভিক্ষ হলে হিন্দু মুসলমান সমভাবে মরে। তখন হিন্দুগণ মুসলমানের রক্ষার্থে ছুটে যায়, ধন প্রাণ দিয়ে সাহায্য করে। মুসলমানগণ ও হিন্দুগণের রক্ষার্থে ধাবিত হয়, যথাসাধ্য উপকার করে। হিন্দুগণ যেমন মুসলমানের সাহায্য ব্যতীত একদিনও কাটাতে পারে না, মুসলমানগণও হিন্দুর সাহায্য ব্যতিরেকে এক পদ ও অগ্রসর হতে পারে না। নিশ্চয়ই হিন্দু মুসলমানের স্বার্থ এক। নিশ্চয়ই হিন্দু ও মুসলমানের উত্থান ও পতন, পরস্পরের উত্থান ও পতনের ওপর নির্ভর করে।

৬। হিন্দু ও মুসলমানের আচার ব্যবহার এক : বাংলার সরকারী সেনসার্স রিপোর্ট বলেন, 'বাংলার বহু অংশের মুসলমান কৃষকগণ বাস্তবিকই হিন্দু আচার ব্যবহার মেনে চলে ও হিন্দুদের পূজা অর্চনায় কতক পরিমাণে যোগ দেয়। ঢাকার প্রসিদ্ধ জন্মাষ্টমীর যোগ যাত্রায় মুসলমানগণ যোগ দিত। এমন কি, দেশের অন্যান্য অংশেও বর্তমান সময়েও, মুসলমানরা হিন্দুদের কোন কোন আচার ব্যবহার প্রতিপালন করে। বাংলার একাধিক অংশে একই ব্যক্তিতে হিন্দু ও মুসলমান নামের সংমিশ্রণ বিরল নয়। যশোহর জেলার মুসলমানরা তুলসী ও বেলগাছের সম্মান করে ও হিন্দুদের জামাই ষষ্ঠী ও ভ্রাতৃদ্বিতীয়া পর্ব করে। বগুড়া জেলার কোন কোন অংশের মুসলমানগণ, তাদের পিতা মাতার মৃত্যু হলে হিন্দুদের ন্যায় অশৌচ পালন করে ও অশৌচান্তে দাড়ী ও মস্তক মুণ্ডন করে। মুসলমান স্ত্রী লোকেরা হিন্দু নারীদের

ন্যায় কপালে সিঁদুর পরে। বগুড়া জেলার মহাস্থানের মুসলমানগণ হিন্দুদের ন্যায় দশহরার দিন লোহার সিন্ধুকে সিঁদুর দেয়। বিবাহের পূর্বে গায়ে হলুদ দেওয়ার রীতিও মুসলমানরা হিন্দুদের নিকট হতে গ্রহণ করেছে। বাংলার বহু অংশে গোড়া হিন্দুরা ও পীর ও ফকীরের প্রতি ও তাঁদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে ও নানা দ্রব্য উৎসর্গ করে। তারা মুসলমানের মধ্যে পবিত্রতা দেখলে তাঁদেরকে সম্মান করে। রংপুর জেলার হিন্দুরা বৃদ্ধ মুসলমানদের চরণ স্পর্শ করে। এর সঙ্গে সৎস্বভাব অপেক্ষা ধর্মের সংশ্রবই বেশী। আবার বিহারে কালী পূজার পর হিন্দু সাধারণ 'সুখরাত' পর্ব করে, গো-সেবা করে। তেমনি মুসলমানগণও সেই পর্বকরে ও গো-সেবা করে। আবার হিন্দুরা যেমন সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে, কিছুদিন পরে তার মস্তক মুণ্ডন করে, মুসলমান রাও তেমনি করে। হিন্দুরা যেমন তাদের মাতা পিতার পাদস্পর্শ করে প্রণাম করে, মুসলমানরাও তেমনি করে। হিন্দুদের যেমন বিজয়ার সম্মিলন আছে, মুসলমানদের ও তেমনি ঈদ ও বকরিদের সম্মিলন আছে। হিন্দুদের মধ্যে যেমন কোলাকুলি প্রথা আছে, মুসলমানদের মধ্যেও তেমনি আছে। হিন্দুরা যেমন দুর্গোৎসবের সময় নূতন কাপড় পরে ও আত্মীয় স্বজনকে নূতন কাপড় উপহার দেয়, মুসলমানরাও তেমনি ঈদের সময় নূতন বস্ত্র পরিধান করে ও আত্মীয় স্বজনকে নূতন উপহার দেয়। হিন্দুগণ বিবাহাদি উৎসবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আঙ্গিনার মধ্যে চারকোণে চারটে কলাগাছ পুঁতে তার মধ্যে বিবাহাদি সম্পন্ন করে, মুসলমানেরাও তেমনি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আঙ্গিনার মধ্যে চারকোণে চারটি কলাগাছ পুঁতে তার মধ্যে মহরম করে। হিন্দুগণ পূজা অর্চনার সময় প্রদীপ ও ধূপ ধূনা জ্বালে, মুসলমানগণও তেমনি মহরমের সময় পূর্বোক্ত কলাগাছের মধ্যে দুটি মোমবাতী ও লোবান (এক প্রকার ধূপ ধূনো) জ্বালায়। হিন্দুরা অপবিত্র হলে স্নান করে শুদ্ধ হয়। মুসলমানরাও অপবিত্র হলে স্নান করে শুদ্ধ হয়। পুরাকালে হিন্দুরা মৃতদেহ মৃত্তিকা মধ্যে সমাধি দিত। পরে মৃতদেহ দাহ করে অস্থি সমাধি দিত। এখনও হিন্দুগণ শিশু, সিদ্ধ পুরুষ, সন্ন্যাসী, মোহান্ত

প্রভৃতির মৃতদেহ মৃত্তিকার মধ্যে সমাধি দেয়। মুসলমানরাও তেমনি সকলের মৃতদেহ সমাধি দেয়। হিন্দুরা যেমন মৃতদেহ স্নান করিয়ে, নূতন বস্ত্রদ্বারা আবৃত করে চিতায় তুলে দেয়, মুসলমানরাও তেমনি মৃতদেহ স্নান করিয়ে, নূতন বস্ত্র দ্বারা আবৃত করে কবর দেয়। মৃতদেহ দাহ করবার সময় হিন্দুরা চিতায় চন্দন কাষ্ঠ দেয়। মুসলমানরা কবর দেবার সময় মৃতদেহের কপালে চন্দন দেয়। যে ঘরে কোন হিন্দুর মৃত্যু হয়, সেই ঘরে হিন্দুগণ সকল অশৌচ কাল সমস্ত রাত্রি প্রদীপ ও ধূপ ধূনো জ্বালায়। তেমনি যে ঘরে, কোন মুসলমানের মৃত্যু হয়, সেই ঘরে মুসলমানগণও ৪০ দিন যাবৎ সমস্ত রাত্রি প্রদীপ ও লোবান জ্বালায়। হিন্দু স্ত্রীলোকেরা সাধারণতঃ স্থাবর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয় না। বিহারের বহু মুসলমান স্ত্রীলোকও কোরআন অনুমোদন করলেও সম্পত্তির অংশ গ্রহণ করে না। বিবাহাদি আনন্দোৎসবে হিন্দুদের বাড়ীতে হিন্দু কুলনারীরা সঙ্গীত করেন, মুসলমানদের বাড়ীতেও মুসলমান কুলনারীগণ সঙ্গীত করেন। বাংলার হিন্দুদের মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত নেই। তেমনি বাংলা ও বিহারে বহু সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবার মধ্যে ও বিধবা বিবাহ প্রচলিত নেই। আবার বাংলায় হিন্দু নারী একবার বিধবা হলে, আর বিবাহ করে না, সেইরূপ বিহারের মুসলমান জনসাধারণের মধ্যেও বহু স্ত্রীলোক, একবার বিধবা হলেই, তারা যুবতী, সুন্দরী ও সন্তান বিহীনা হলেও আর বিবাহ করে না। হিন্দুনারী বিধবা হলে যেমন সাদা বস্ত্র পরিধান করেন ও হাতে পায় কোন অলংকার পরিধান করেন না, তেমনি সম্ভ্রান্ত মুসলমান নারীও বিধবা হলে সাদাবস্ত্র পরিধান করেন ও হাতে পায় কোন অলংকার পরিধান করেন না। আবার হিন্দুদের মধ্যে জাতিভেদ আছে, মুসলমানদের মধ্যেও জাতিভেদ আছে। যথা, সিয়া, সুন্নী ও খারিজী। সেখ, সৈয়দ, মোগল ও পাঠান। হানাফী, ওহাবী, সাফী, মালেকী ও হাম্বেলী ইত্যাদি। যেমন হিন্দুশাস্ত্রে আছে যে; হিন্দুগণ যে কোন জাতির কন্যা বিবাহ করতে পারে। তথাপি দেশাচার অনুসারে একই হিন্দুজাতির একশ্রেণী অন্য শ্রেণীর ও কন্যার পানি গ্রহণ করে না।

তেমনি কোর আনে আছে যে, মুসলমানগণ একেশ্বরবাদী যে কোন জাতির কন্যা বিবাহ করতে পারে। তথাপি দেশাচার অনুসারে একই মুসলমান জাতির একশ্রেণী অন্য শ্রেণীরও কন্যার পানি গ্রহণ করে না। একই মুসলমান শ্রেণীর মধ্যে ও সম্ভ্রান্ত মুসলমানগণ সাধারণ মুসলমানের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দেন না। বাঙ্গালী ও বিহারী মুসলমানগণ পরস্পরের বৈবাহিক সম্বন্ধ করেন না। সাধারণ মুসলমান, ধুনীয়া, নট বাখখো ও যারা ঘোড়ার নাল বাঁধে, সেইরূপ বহু মুসলমান জাতি পরস্পরের মধ্যে বিবাহ করে না, আবার হিন্দু শাস্ত্র অনুসারে যেমন পাত্র ও পাত্রী বয়ঃ প্রাপ্ত না হলে বিবাহ হয় না, এবং উহাদের অমতে বিবাহ হতে পারে না। বিধবা বিবাহ প্রশস্ত ও হিন্দু বিবাহও ভঙ্গ হতে পারে। তেমনি মুসলমান সমাজেও এ সকল বিধি ও প্রথা প্রচলিত আছে। আবার, হিন্দু শাস্ত্র অনুমোদন করলেও বহু হিন্দুজাতি যেমন অপর বহু হিন্দু জাতির অন্ন জল গ্রহণ করে না। সেইরূপ পূর্বোক্ত মুসলমান জাতির মধ্যেও অনেক জাতি অনেক জাতির অন্নজল খায় না। এক কথায়, হিন্দুগণ যেমন হিন্দুশাস্ত্র অপেক্ষা দেশাচার অধিক মেনে চলে, মুসলমানগণও তেমনি মুসলমান শাস্ত্র অপেক্ষা দেশাচার অধিক মেনে চলে। পুরাকালে এক সম্ভ্রান্ত হিন্দু অপর সম্ভ্রান্ত হিন্দুর সঙ্গে সাক্ষাৎ সময়ে দণ্ডায়মান হয়ে করস্পর্শ করতেন, এখনও মুসলমানগণের মধ্যে ঐ রীতি প্রচলিত আছে। হিন্দুগণ মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হবার সময় পরস্পরের কর গ্রহণ করে পরস্পরকে বন্দনা করে, মুসলমানগণ ও সেইরূপ করে।

৭। হিন্দু ও মুসলমানের উপদেবতা এক : বেলুচীস্থানের মধ্যস্থিত হিংলাজের বিগ্রহ সকল হিন্দু মুসলমানের পূজার্জ। কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাটে শীতলা দেবীর যে প্রসিদ্ধ মন্দির আছে, তন্মধ্যস্থিত প্রস্তর নির্মিত শীতলা দেবীকে মুসলমানেরাও অর্চনা করছে। জীবন, কুক্কুট দেবীকে অর্পণ করছে, মন্দির মধ্যে ছেড়ে দিচ্ছে। এখন বিহারের কথা বলি, কিছুদিন পূর্বে পর্যন্ত কত সম্ভ্রান্ত মুসলমান দুর্গার প্রতিমা গড়ে পূজা করেছেন। এখনও পল্লীগ্রামে কত মুসলমান শীতলার

পূজা দিচ্ছে। কালীর প্রতিমার নিকট কামনা করছে, পূজা দিচ্ছে। বহু হিন্দু জল দেবতার পূজা করে থাকে, অন্নাদি ভোগ ও পাঁঠা বলি দিয়ে থাকে। বহু মুসলমানেও সেই দেবতাকে সাহজা নামে পূজা করে থাকে, পাঁঠা বলি ও অন্নাদি ভোগ দিয়ে থাকে। কত মুসলমান হিন্দুদের ন্যায় বিষহরীর (মনসা) পূজা করছে, পাঁঠা বলি দিচ্ছে। হিন্দুরা গাঁইয়া (গ্রাম্য) দেবতার পূজা করে। বহু মুসলমানেও সেই দেবতার পূজা করে। কারো কোন কঠিন পীড়া হলে বা বিপদ ঘটলে, বিহারের হিন্দু মুসলমান জনসাধারণ মন প্রাণে বিশ্বাস করে যে, তা ভূতের কার্য। এজন্য তারা তখন ওঝাকে ডেকে আনে, তা দ্বারা রোগীকে ঝাড়াশ পূজার মন্ত্র তন্ত্র পাঠ করায় ও ভূতের পূজা দেয়। এই সকল ওঝা সাধারণতঃ হাড়ী ডোম জাতীয়। আবার মুসলমান ওঝাও আছে। তারাও ভূতের ওঝা বলে আত্মপরিচয় দেয়, ভূতের পূজা করে ও সেজন্য দক্ষিণা নেয়। বাংলার হিন্দু মুসলমান জনসাধারণেরও পুর্বে ঐরূপ অবস্থা ছিল। এখন পাশ্চাত্য শিক্ষার পিণ্ডদানে বাংলার ভূত প্রেত উদ্ধার হয়ে গিয়েছে। বাংলা ও বিহারের এই ভূতের পূজা তথাকার অবনত বৌদ্ধধর্মের ধ্বংসাবশেষ। বাঙ্গালার সরকারী সেনসার্স রিপোর্ট বলেন, বাংলার পল্লী প্রদেশের মুসলমানগণ সাধারণতঃ খুব উদার। বহু মুসলমান দুর্গা পূজা করে। পাবনা জেলার মুসলমানরা মনসা বা বিষহরীর পূজা করে ও কালী পূজায় চাঁদা দেয়, বিশেষ সংক্রামক ব্যাধির সময় প্রায় সকল মুসলমানই শীতলার পূজা করে ও অনেক মুসলমান অপনাদেরকে বসন্ত রোগের বিশেষজ্ঞ বৈদ্য বলে পরিচয় দিয়ে বসন্ত রোগের চিকিৎসা করে ও তারা মুসলমান হলেও শীতলা দেবীকে প্রসন্ন করবে বলে দক্ষিণা নেয়। রংপুর জেলার মুসলমানগণ বুড়ী দেবীর পূজা করে, বিশেষ ক্রমাগত দুর্ঘটনা ঘটতে থাকলে বা কোন মোকর্দমায় পড়লে করে। জলপাইগুড়ি জেলার মুসলমানরা ফল ও চালের নৈবেদ্য নদীতে নিক্ষেপ করে বুড়ী দেবীকে প্রসন্ন করে। বহু মুসলমান বহুদূর হতে এসে (বগুড়া জেলার) গোপীনাথ পুরের গোপীনাথ বিগ্রহের নিকট ফল ও দুধ উৎসর্গ করে।

পীড়া হতে মুক্ত হবার জন্য একটি বিশিষ্ট ইঁদারায় স্নান করে। মহাস্থান নামক স্থানে মুসলমানগণ হিন্দুদের ন্যায় সত্যপীরের পূজা করে। বাংলার কত মুসলমান লক্ষীর পূজা করে। আবার কত মুসলমান পুস্তকে বৈষ্ণব ধর্মের প্রশংসা আছে।

৮। হিন্দু ও মুসলমানের পীর এক: চুনার দুর্গে মধ্যে ভর্তৃহরির যে সমাধি আছে তার নিকট হিন্দু মুসলমান সমভাবে পূজা দিচ্ছে। পশ্চিম প্রদেশের হিন্দুরা সৈয়দ সালারের পূজা করে। আগ্রার নিকটে সেকেন্দ্রাবাদে সম্রাট কুল-তিলক মুসলমান আকবরের প্রকাণ্ড ও মনোহর সমাধি মন্দির আছে। হিন্দু ও মুসলমান আজও সমভাবে সেই সমাধির আরাধনা করছে, কাম্য বস্তু প্রার্থনা করছে, কত মিষ্টান্ন ভোগ দিচ্ছে। সপ্তদশ শতকে হিন্দু মহারাজ শিবাজীর সাম্রাজ্য, মহারাষ্ট্র দেশে ব্রাহ্মণেরাও মুসলমান পীরের আরাধনা করেছে। এখনও উত্তর ভারতের জয়েশ্বর জাতি ও বিহারের কুর্মিরা মুসলমান পুরোহিত দ্বারা মুসলমান প্রথা অনুসারে মুসলমান পীরের পূজা করে। বাংলা ও বিহারের কত হিন্দু কত মুসলমান পীরের সমাধির নিকট কত মিষ্টান্ন ভোগ দিচ্ছে, কামনা পূর্ণ করবার জন্য কত প্রার্থনা করছে। আমরা বাল্যকালে বাংলায় দেখেছি, কোন কোন সন্ধ্যায় বৃদ্ধ মুসলমান ফকীর হাতে বৃহৎ মৃৎ-প্রদীপ নিয়ে উচ্চৈঃস্বরে 'মুস্কিল আসান' বলে হিন্দুদের গৃহদ্বারে উপস্থিত হতেন। অমনি সম্ভ্রান্ত হিন্দু রমণীরাও দ্রুত পদে তাঁর নিকট গমন করতেন, তাঁর সঙ্গে বিনাবগুণ্ঠনে কথা বলতেন, তাঁর প্রদীপে তেল ঢেলে দিতেন, পয়সা দিতেন। ফকীর সেই প্রদীপের শীষ ভেঙ্গে সমাগত বালক বালিকার কপালে টিপ দিতেন, আর আশীর্বাদ করতেন। পূর্বে পূর্ব বাংলার বহু হিন্দু বাদার জঙ্গলে কাঠ কাটতে যেত। তারা সর্ব প্রথমে বাদার মুসলমান ফকীরের দ্বারা পীরের পূজা দিত, পরে কাঠ কাটতে আরম্ভ করত। বাংলার বড় বড় নদীতে হিন্দু মাঝিরা এখনও আনন্দে ও উচ্চৈঃ স্বরে 'পাঁচ পীর গাজীর বদর' বলে, পীর ও গাজীর বন্দনা করে নৌকা ছেড়ে দেয়। গৌরাঙ্গ দেবের সময় মুসলমান

হরিদাস তাঁর হরিভক্তির জন্য হিন্দুগণ কর্তৃক পূজিত হয়েছেন। বর্তমান সময়েও মুসলমান সাহাদাৎ হোসেন বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করে, বৈষ্ণবের বেশ পরিধান করে, হরি নামে পাগল হয়ে, হিন্দুগণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করছেন। গৌড়ের অধিপতি সুলতান হোসেন শাহ হিন্দু ও মুসলমান মধ্যে একই সত্য পীরের পূজা প্রচলিত করেছিলেন। বিহার এখনও বহু হিন্দু ও মুসলমান সত্যপীরের পূজা করে। চট্টগ্রাম অঞ্চলে হিন্দু ও মুসলমান গণ একত্রিত হয়ে সত্যপীর ও ত্রৈলোক্যপীরের পূজা করে থাকে ও তাঁদের সিন্নী সকলের মধ্যে বিতরণ করে। সর্বোপরি বাংলা ও বিহারের হিন্দুরা মুসলমান সত্যপীরকে সত্য নারায়ণ রূপে ঘরে ঘরে পূজা করছে। প্রকৃতি বিবেক অভিধান বলেন, "সত্য পীর ও সত্যনারায়ণ এক।" দ্বিজ রামেশ্বরের সত্যনারায়ণ পাঁচালীতে আছে ঃ

কোরাণ কেতাব কিয়া কলিমে নংহতি।
সুপি খাঁ পীরের পায় প্রচুর প্রণতি॥
সাত শত আওলিয়া বন্দি যোড় করে।
ফণীন্দ্র নগেন্দ্র ইন্দ্র কাঁপে যার ডরে।
পরে সত্যপীর বন্দ, বলে দ্বিজ রাম।
সাকিম বরদা বাটি যত্নপুর গ্রাম।

ব্রাহ্মণ কর্তৃক কোর আন ও মুসলমান পীরের এত সম্মান! ব্রাহ্মণ বা মুসলমান হলে কি হয়? যারা সত্যই উর্ধ্বে ওঠেছেন, তাদের নিকট উচ্চ ও নাচ নেই, সবাই সমান। যাদের প্রাণে সত্যই ঈশ্বর ভক্তির উদয় হয়েছে, তাঁদের প্রাণ প্রেমেও পূর্ণ হয়েছে। তাঁরা বুঝেছেন, হিন্দু ও মুসলমান একই ঈশ্বরের সন্তান, সকলেই ভাই ভাই, তাঁদের নিকট বেদ, বাইবেল ও কোরআন সকলই শ্রদ্ধার বিষয়, উপহাসের বিষয় নয়।

(৯) **হিন্দু ও মুসলমানের সাধনা প্রণালী এক ঃ হিন্দুগণ বিশ্বাস করে যে,ঈশ্বর ধর্ম সংস্কারের জন্য মহামানব রূপে অবতীর্ণ হয়ে থাকেন। মুসলমানরাও বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ্‌র ধর্ম সংস্কারের জন্য মহামানবকে প্রেরণ করে থাকেন। হিন্দুদের মন্দির আছে, মুসলমানদের মসজিদ**

আছে। হিন্দুরা মন্দিরে গিয়ে অর্চনা করে, মুসলমানরা মসজিদে গিয়ে উপাসনা করে। হিন্দুরা প্রত্যহ তিনবার উপাসনা করে, মুসলমানরা প্রত্যহ পাঁচবার নামায পড়ে। হিন্দুরা প্রভাত, দ্বি প্রহর ও সন্ধ্যায় আরাধনা করে, মুসলমানগণও প্রায় সেই সময় নামায সম্পন্ন করে। হিন্দুরা পূজা করে কপালে চন্দনের তিলক দেয়, মুসলমানগণ নামায পড়ে কপালে মাটির চিহ্ন ধারণ করে। কোন হিন্দু মরণাপন্ন কাতর হলে, তার মাতা ঠাকুর ঘরে গিয়ে দীনতা প্রকাশের জন্য, কপাল মৃত্তিকায় পুনঃ পুনঃ লুণ্ঠন করে রক্ত বার করে ফেলেন ও কপালে স্থায়ী চিহ্ন ধারণ করেন। অনেক মুসলমান ও নামাযের সময়, দীনতা প্রকাশের জন্য, কপাল মৃত্তিকায় পুনঃ পুনঃ লুণ্ঠন করে ললাটে স্থায়ী চিহ্ন ধারণ করেন। কত হিন্দু মহরম করে, কত হিন্দু রোযার উপবাস করে। হিন্দুরা টিকী রাখে, মুসলমানরা দাড়ী রাখে। বহু হিন্দু প্রতি প্রভাতে গীতা পাঠ করেন, বহু মুসলমানও তেমনি প্রতি প্রভাতে কোরআন পাঠ করেন। বহু হিন্দু যেমন গীতা মুখস্থ রাখেন, বহু মুসলমানও তেমনি কোরআন কণ্ঠস্থ রাখেন। হিন্দুগণ মধ্যে মধ্যে উপবাস করে, মুসলমানরাও করে। যে সকল হিন্দু সমস্ত দিন উপবাস করে রাত্রিতে ভোজন করে। সেই রাত্রি ভোজীর প্রশংসা মহাভারতে আছে। মুসলমানরাও রোযার সময় মাসাধিককাল সমস্ত দিন উপবাস করে রাত্রিতে ভোজন করে। মধ্যে মধ্যে মৌনাবলম্বন যেমন হিন্দুদের পক্ষে প্রশস্ত, মুসলমানের পক্ষেও তেমনি প্রশংসার্হ। হিন্দুদের যেমন তীর্থ আছে। মুসলমানদেরও তেমনি মক্কা, মদীনা তীর্থ আছে। হিন্দুদের যেমন তীর্থ পর্যটন প্রশস্ত, মুসলমানদেরও তেমনি তীর্থ ভ্রমণ প্রশংসার্হ। হিন্দুরা বলিদান করে, মুসলমানগণও কোরবানী করে। আবার হিন্দুদের যেমন কোন কোন তীর্থে বলিদান নিষিদ্ধ, মুসলমানদেরও তেমনি মক্কার কাবা মন্দিরে ও তৎসংলগ্ন ক্ষেত্রে বলিদান নিষিদ্ধ। হিন্দুগণ যেমন তাদের মন্দির সাতবার প্রদক্ষিণ করে, মুসলমানগণও তেমনি কাবার মন্দির সাতবার প্রদক্ষিণ করে। হিন্দুরা যেমন কোন কোন তীর্থে মস্তক মুণ্ডন করে, মুসলমানরাও তেমনি মক্কার তীর্থে

মস্তক মুণ্ডন করে। হিন্দুরা যেমন সেলাই করা কাপড় পরে অর্চনা করে না, মুসলমানরাও তেমনি সেলাই করা কাপড় পরে মক্কার তীর্থ করে না। হিন্দুরা যেমন একখানি ধুতি পরিধান করে, আর একখানি উত্তরীয় বস্ত্র গায় দিয়ে দীন হীন বেশে অর্চনা করে, মুসলমানরাও তেমনি একখানি বস্ত্র পরিধান করে, আর একখানি উত্তরীয় গায়ে দীন হীন বেশে মক্কার তীর্থ করে। হিন্দুরা যেমন অভীষ্ট নাম মালার সাহায্যে জপ করে, মুসলমানগণও তেমনি আল্লাহ্‌র নাম মালার সাহায্যে জপ করে। কত হিন্দু যেমন ধর্মার্থে গলায় মালা পরে, কত মুসলমান ফকীরও তেমনি ধর্মার্থে গলায় মালা ধারণ করে। হিন্দুরা গঙ্গাজলকে পবিত্র মনে করে, মুসলমানরা কাবার এক ইঁদারার জলকে পবিত্র মনে করে। হিন্দুরা প্রভাতে ঈশ্বরের নাম নিয়ে গাত্রোত্থান করে, মুসলমানরাও সেই রূপ জপ করে। হিন্দুরা রাত্রিতে ঈশ্বরের নাম নিয়ে শয়ন করে, মুসলমানগণও তেমনি করে। হিন্দুরা প্রথমে অভীষ্ট নাম না লিখে কোন পত্র বা কোন প্রকার লেখা-পড়া আরম্ভ করেন না, মুসলমানগণও তেমনি প্রথমে আল্লাহ্‌র নাম না লিখে কোন পত্র বা কোন প্রকার লেখা পড়া আরম্ভ করে না। হিন্দুগণ অভীষ্ট নাম উচ্চারণ না করে কোন স্থানে যাত্রা করে না, মুসলমানগণও তেমনি আল্লাহ্‌র নাম না নিয়ে যাত্রা করে না। হিন্দু ভিখারী অভীষ্ট নাম উচ্চারণ না করে ভিক্ষা চায় না, মুসলমান ভিখারীও আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ না করে ভিক্ষা চায় না। হিন্দুরা যেমন অভীষ্ট নাম উচ্চারণ করে সকল কার্যে প্রবৃত্ত হয়। মুসলমানরাও তেমনি আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করে সকল কার্যে প্রবিষ্ট হয়। ঈশ্বরের নাম সতত নেবার শোনবার জন্য হিন্দুগণ যেমন ঈশ্বরের নাম অনুসারে পুত্র কন্যার নাম রাখে, মুসলমানগণও তেমনি রাখে। ঈশ্বরের নাম সতত নেবার ও শোনবার জন্য হিন্দুরা যেমন পোষা পাখীকেও ঈশ্বরের নাম শেখায়, মুসলমানরাও তেমন শেখায়। হিন্দু বৈদান্তিক 'সোহ্‌ হং' আমিই ঈশ্বর বলে সাধনা করেন, মুসলমান সুফী সম্প্রদায়ও তেমনি 'অনাল হক' আমিই আল্লাহ্‌ বলে সাধনা করে থাকেন। কত হিন্দু ধ্যান

করেন, কত হিন্দু যোগ করেন, কত মুসলমানও ধ্যান করেন, কত মুসলমানও যোগ করেন কত হিন্দু সাধক বাদ্য বাজিয়ে, কৃষ্ণলীলা গান করে সাধনা করে থাকেন। কত মুসলমান সাধকও বাদ্য বাজিয়ে কৃষ্ণলীলা গান করে সাধনা করে থাকেন। বহু হিন্দু সাধক, মাথায় দীন কেশ রেখে হাতে চুড়ী পরে, শাড়ী পরিধান করে, স্ত্রী বেশে, স্ত্রী ভাবে সাধনা করে থাকেন। বহু মুসলমান সাধকও ঐভাবে সাধনা করে থাকেন। হিন্দুগণ যেমন সিদ্ধ পুরুষের সমাধি মন্দিরের নিকট মিষ্টান্ন ভোগ দেয় ও কামনা পূর্ণ করতে প্রার্থনা করে, মুসলমানগণও তেমনি তাদের পীরের সমাধির নিকট মিষ্টান্ন ভোগ দেয় ও কামনা পূর্ণ করতে প্রার্থনা করে। বহু হিন্দু বহু দেবতার কল্পনা ক'রে, বহু মুসলমানও বহু ফেরেশ্‌তার কল্পনা করে। হিন্দুদের গুরু আছে, মুসলমানদের পীর আছে। হিন্দুদের পুরোহিত আছে, মুসলমানদের মোল্লা ও মৌলবী আছে। শাস্ত্র বিরুদ্ধ হলেও যেমন বহু হিন্দু পৌত্তলিক, তেমনি কোরআন বিরুদ্ধ হলেও বহু মুসলমান পৌত্তলিক। তার প্রমাণ পূর্বে দিয়েছি। আরও দিচ্ছি। অসংখ্য মুসলমান মহরম করে। পরিষ্কার আঙ্গিনার মধ্যে চার কোণে চারটি কলাগাছ গাড়ে। তাতে অনেক নিশান খাড়া করে দেয়। ঐ সকল কলাগাছের মধ্যে উচ্চ বেদী বাঁধে আর পরিষ্কার মাটির সঙ্গে দুগ্ধ ছেনে হাসেন হোসেনের দুটি প্রতিভূ প্রস্তুত করে, তারপরে তা রক্তবর্ণ ও সবুজ বর্ণের দুটি কাপড়ের মধ্যে রেখে পূর্বোক্ত বেদীর ওপর স্থাপন করে, সেখানে দুটি মোমবাতী ও লোবান জ্বেলে নানাবিধ খাদ্য হাসেন হোসেনের নামে উৎসর্গ করে। এইরূপে ন দিন অতিবাহিত করে দশ দিনে হাসেন হোসেনের ঐ প্রতিভূ তাজিয়ার মধ্যে স্থাপন করে ঢাক ঢোল বাজিয়ে, যুদ্ধের অভিনয় করতে করতে শোভাযাত্রা করে, সন্ধ্যার সময় কারবালার মাঠে গিয়ে ঐ দুই প্রতিভূর কবর দেয়। তারপরে তাজিয়া জলে বিসর্জন দেয়।

১০। হিন্দু ও মুসলমানের ধর্ম এক: কোরআনের মূলে আল্লাহ্‌র একত্ববাদ এবং তার সঙ্গে মানবের একত্ববাদ, হিন্দু ধর্মের

মূলে ও এই একত্ববাদ। আমরা পূর্বে প্রমাণ করেছি যে, হিন্দুরা এক-ঈশ্বরবাদী। এমন কি, বিদেশী মুসলমান আল বেরুনী খ্রীষ্টের একাদশ শতাব্দীতে ভারতে ভ্রমণ করে লিখেছেন, "কেবল মূর্খ জনসাধারণ বহু দেবতায় বিশ্বাস করে, শিক্ষিত হিন্দুরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে। তিনি এক, অদ্বিতীয়, অনাদি, অনন্ত সর্বশক্তিমান, স্রষ্টা, পাতা ও যা কিছু আছে সকলই তাঁর জন্য। আমরা আরও দেখেছি যে, উপনিষদ, বেদান্ত ও মহাভারত প্রভৃতি বহু হিন্দু শাস্ত্র উপদেশ দিয়েছেন, এক ঈশ্বরের আরাধনা করবে, তাঁর মহিমা কীর্তন, শ্রবণ, মনন ও ধ্যান দ্বারা তাঁর উপাসনা করবে। কখনও প্রস্তর বা মৃত্তিকা নির্মিত মূর্তির পূজা করবে না। উপনিষদ বলেন, "যারা এক ঈশ্বর ব্যতীত অন্য দেবতার আরাধনা করে, তারা দেবতাগণের পশু।" কোনআনও তাই বলেন। আরও প্রমাণ করেছি যে, হিন্দু ও মুসল মানের জাতি ও জন্মভূমি এক, সভ্যতা ও স্বার্থ এক, আচার ব্যবহার ও সামাজিক নিয়ম এক, হিন্দু ও মুসলমান এক, উভয়ের উপদেবতা এক, পীর এক, সাধনা প্রণালী এক, ধর্মশাস্ত্র এক, ধর্ম এক ও সকল ধর্মই আসলে এক। আরও প্রমাণ দিচ্ছি :—(১) অযূ: হিন্দুগণ হাত, পা, চোখ, মুখ ধুয়ে, পরিষ্কার বস্ত্র পরে, শরীর ও মন শুদ্ধ ও শীতল করে আরাধনা করে, মুসলমানগণও সেইরূপে শুদ্ধ ও শীতল হয়ে উপাসনা করে। হিন্দুগণ অপবিত্র হলে স্নান করে শুদ্ধ হয়, তার পরে অর্চনাদি করে। মুসলমানগণও অপবিত্র হলে স্নান করে শুদ্ধ হয়, তার পরে নামাযাদি করে (২) আজান: হিন্দুরা মন্দিরে আরাধনার সময় শঙ্খ ঘণ্টা বাজিয়ে হিন্দুগণকে আহ্বান করে, মুসলমানগণ ও নামাযের সময় মসজিদে আজান দিয়ে মুসলমানগণকে আহ্বান করে। আজান দেবার সময় পুনঃ পুনঃ ঘোষনা করা হয়, আল্লাহ্ এক, অদ্বিতীয় ও মহান্। আর মোহাম্মদ আল্লাহ্ প্রেরিত!" এটি কোন্ হিন্দুর অপ্রীতিকর? বরং ভক্তি ভরে ঈশ্বর এক অদ্বিতীয় ও মহান বলে ধ্বনিত হতে থাকলে, কোন্ ঈশ্বর প্রেমিকের প্রাণ না পুলকিত হয়? আবার প্রত্যুষের আজান কর্ম জীবনে হিন্দুকে জাগারিত করে

কর্মে লিপ্ত হতে সাহায্য করে। (৩) নামাযঃ ইন্দুরা প্রভাতে, দ্বি প্রহরে ও সন্ধ্যায় উপাসনা করে। মুসলমানগণ ও প্রায় সেই সময় ও আরও দুবার নামায পড়ে। অসংখ্য হিন্দু তাদের উপাস্য দেবতার সম্মুখে গলবস্ত্রে, জোড়হস্তে, দুপা এক করে দাঁড়িয়ে, পরে হাঁটু গেড়ে বসে, কপাল দ্বারা মৃত্তিকা পুনঃ পুনঃ স্পর্শ করে, পুনঃ পুনঃ প্রণাম করে অতিশয় দৈন্য প্রকাশ করে থাকে। মুসলমামগণও নামাযের সময় আল্লাহর উদ্দেশ্যে পুনঃ পুনঃ প্রায় সেইরূপ করে অতিশয় দীনতা প্রকাশ কবে থাকে। মনোযোগ দিয়ে দেখলে বেশ বোঝা যায় যে, আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে পুনঃ পুনঃ প্রণামই নামায। নিশ্চয় নমস (নমস্কার) হতে 'নামায' হয়েছে। আর নামাযের মন্ত্র ? হিন্দুরা তাদের ইষ্টদেবতার নিকট প্রণাম করবার সময় তাঁর মহিমা কীর্তন করে, তাঁর করুণা ভিক্ষা করে থাকে। মুসলমানগণও নামাযেব সময়, আল্লাহ্‌ "এক অদ্বিতীয় ও মহান" বলে তার গুণ কীর্তন করে তার করুণা প্রার্থনা করে থাকে। হিন্দু ও মুসলমান একই ঈশ্বরের উপাসনা কবে, একই ঈশ্বরের করুণা প্রার্থনা করে। তবে আজান ও নামায দেশী ভাষায় না হওয়ায় তার মধুর স্বাদ হিন্দু মুসলমান সমভাবে গ্রহণ করতে পারে না। কোরআন ও বিশ্বনবী বলেন, 'সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম রূপে পর্যালোচনা করলে স্পষ্ট প্রতীতি জন্মাবে, হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের মূল নীতি এক। আর আমরা পাতায় পাতায় প্রমাণ করেছি যে, হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের শুধু মূল নীতি এক নয়। উভয় ধর্ম আগাগোড়া এক, হিন্দু মুসলান এক।

হে বন্ধু পার্থক্য কোথায় ;

মহাত্মা কবীর বলেছেন,

> হিল মিল খেলা ব্রহ্মাসে, অন্তর রহিন রেখ
> সমঝেকা মত এক হ্যায়, ক্যা পাণ্ডিত ক্যা শেখ।

সতত ঈশ্বরের সঙ্গে বিহার করবে। মনে দাগ রেখো না, অর্থাৎ মন বিশুদ্ধ করবে। যারা বুঝতে পারে তারা কি হিন্দু, কি মুসলমান, সকলের মত এক। কিন্তু বোঝে কে ? বোঝাই কাকে ? গীতা যে হিন্দুর উদরে ! আর কোরআন যে মুসলমানের কণ্ঠে !

(১১) গরু জবাই: হিন্দু মুসলমান বিবাদের অন্যতম প্রধান কারণ মুসলমানগণের গরু জবাই? আর তা নিবারণে হিন্দুগণের প্রাণপণ চেষ্টা। আমি এই স্থানে হিন্দু ধর্ম শাস্ত্র মন্থন করে গো মাংসের উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তার উপরে কিঞ্চিৎ আলোচনা করব। মহাভারত বলেন, মাংস সত্যই বল বৃদ্ধি করে এবং উৎকৃষ্ট পুষ্টি বিধান করে। কারণ কোন খাদ্যই মাংস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নয়। কৃশ, ক্ষাণ, সন্তপ্ত শ্রান্ত সৈনিকের পক্ষে মাংস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ খাদ্য আর নেই। মাংসের বহু গুণ। (মহাভারত, অনুশাসন পর্ব ১১৬ অধ্যায়)। বৈদিক যুগে হিন্দু সমাজে মহিষ মাংস, অশ্ব মাংস ও গো মাংস প্রচলিত ছিল। ঋগ্বেদের সময় গো মাংস দ্বারা অতিথির সৎকার করা হত। (Civilization in Ancient India Ip. 41, 63, 130)। মনু সংহিতা বলেন ব্রাহ্মণগণকে মাংস আহার করাবে। শ্রাদ্ধে পিতৃগণ বরাহ মাংস ও মহিষ মাংস পেলে দশ মাস, শশক ও কচ্ছপের মাংস পেলে একাদশ মাস এবং গণ্ডারের মাংস পেলে অনন্তকাল তৃপ্ত থাকেন। সজারু, গো-সাপ, কচ্ছপ, খরগোস, উট ও গণ্ডারের মাংস আহার করা যায়। (মনু সংহিতা ৩—২২৭, ২৭০, ২৭২০ এবং ১৫-৮) মহাভারতে আছে, পূর্বে ব্রাহ্মণ ও ঋষিগণ বহু প্রকার মাংস আহার করতেন। (সভা পর্ব ৪ অধ্যায়)। মহাভারত বলেন, বরাহ মাংস দ্বারা শ্রাদ্ধ করলে পিতৃগণ সাত মাস ও মহিষ-মাংস দ্বারা শ্রাদ্ধ করলে একাদশ মাস পরিতৃপ্ত থাকেন (অনুশাসন পর্ব ১৮ অধ্যায়)। মহাভারতে আছে যে, তখন ব্রাহ্মণেরা শূকরাদির মাংস আহার করতেন। (সভা পর্ব—৪-১।২)। শূকর, মহিষ ও ভালুকের মাংসও প্রচলিত ছিল। (বন পর্ব—২৬৬-১৪।১৫)। হরিবংশ বলে কৃষ্ণ, বলরাম প্রভৃতি বহু যাদব ও দেবর্ষি নারদ একত্র আহারে বসলে, মহিষ মাংস পরিবেশন করা হয়েছিল। (হরি বংশ—বিষ্ণু-পর্ব ৮৯-৫৮)। মহাভারত বলেন, পূর্বে রন্তিদেব রাজার রন্ধনাগারে প্রতিদিন দু'হাজার পশু বধ হত এবং প্রত্যহ দু'হাজার গো-ধন নির্ধন প্রাপ্ত হত। নিত্য নিত্য সমাংস অন্নদান করায় রন্তিদেব ভূপালের অতুল

কীর্তি হয়েছিল। (বন পর্ব ২০৭—৮।৯।১০)। পূর্বে বিশিষ্ট অতিথি এলে তাঁকে মধুপর্ব দেওয়া হত। তাতে গো-মাংস অবশ্যই থাকত। এজন্য অতিথির এক নাম 'গো-ঘ্ন' অর্থাৎ গো হন্তা। শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণের জন্য বড় বড় ষাঁড় নিহত করা হত। (গীতার সমন্বয় ভাষ্য পৃঃ ৫৫১)। কৃষ্ণ, ভীম ও অর্জুন রাজা জরাসন্ধের সভায় উপস্থিত হলে রাজা জরাসন্ধ পাদ্য মধু পর্ব ও গো প্রদানের উপযুক্ত কৃষ্ণাদেব যথাবিধি সৎকার করেছিলেন। (সভা পর্ব—২১-৩১)। রাজা যুধিষ্ঠিরের পূর্ব পুরুষ নপুষ নৃপতিদেব বিধি অনুসারে অতিথির জন্য গো-হত্যা করতে প্রস্তুত হয়েছিলেন। (শান্তি পর্ব—২৬৭-৫।৬)। মহাভারতের এই শ্লোক দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, অতিথিকে আহার করাতে গো-হত্যার বিধি বেদে আছে। বস্তুতঃ ঋগ্বেদে আছে যে, অতিথির আহারের জন্য গো-মাংস প্রদত্ত হত। যজুর্বেদের শত পথ ব্রাহ্মণ বলেন যে, মহর্ষি যাজ্ঞ বলক গো-মাংসের পক্ষপাতী ছিলেন (ঋগ্বেদ ২।১১।১৫)। ভবভূতি ব্রাহ্মণ কবি ও মহাপণ্ডিত ছিলেন। তিনি সংস্কৃত ভাষায় বীরচরিত, মালতী মাধব, উত্তর চরিত্র প্রভৃতি নাটক রচনা করে অমর হয়ে ছিলেন। আমরা এখন ব্রাহ্মণ শিরোমণি, মহাপণ্ডিত গুরুনাথ বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য সম্পাদিত। কাব্য ব্যাকরণ তর্ক তীর্থ কালীপদ ভট্টাচার্য দ্বারা সংশোধিত ও জানকীনাথ কাব্যতীর্থ দ্বারা প্রকাশিত সেই সুপ্রসিদ্ধ 'উত্তর চরিতম' নামক নাটকের চতুর্থ অংকের বঙ্গানুবাদ তাদের গ্রন্থ হতে অবিকল উদ্ধৃত করছি। মহর্ষি বশিষ্ট রাম জননী রানী কৌশল্যা প্রভৃতি নিয়ে বাল্মীকির তপোবনে এসেছেন। সেখানে দু'জন তাপস এরূপ কথোপকন করছিলেন। সৌধাতকি। ওহে ভাণ্ডারণ, আজ এই বৃহৎ প্রাচীন দলের ধুরন্দর (মোড়ল) রূপে যে অতিথি এসেছেন, ওর নাম কি? ভাণ্ডারণ ছি! ছি! এরূপ পরিহাস বাক্য প্রয়োগ নিতান্তই অন্যায়। উনি ভাগ্যবান বশিষ্ট। অরুন্ধতীকে আগে করে মহারাজ দশরথের মহর্ষিগণের নেতৃত্ব গ্রহণ পূর্বক ঋষ্য শৃঙ্গের আশ্রম হতে আগমন করছেন। তুমি কেন এরূপ প্রলাপ বাক্য বলছ? সৌধাতকি। অ্যাঁ ইনি বশিষ্ট?

ভাণ্ডারণ। হ্যাঁ। সৌধাতকি। আমি মনে করেছিলাম এ একটা ব্যাঘ্র বা বৃক। ভাণ্ডারন। আঃ কি বলছ? সৌধাতকি। ইনি এ সেই হতভাগ্য বৎসতরীর অস্থি মাংস মড় মড় শব্দে চর্বন করে ফেললেন। ভাণ্ডারণ: মাংসের সঙ্গে মধুপর্ক দান কর্তব্য, এই বেদ বাকের গৌরব প্রদর্শন করে গৃহস্থগণ অতিথি রূপে সমাগত বেদাধ্যায়ী বিপ্র বা রাজন্যের অভ্যর্থনার জন্য বৎসতরী, বৃষ অথবা বৃহৎ ছাগ প্রদান করে থাকেন। ধর্মশাস্ত্রকারগণ একেই ধর্ম বলে নির্দেশ করেছেন। পাঠক স্মরণ রাখবেন, এরূপে প্রদত্ত গো-বৎসই রন্ধনের পর মহর্ষি বশিষ্টদেব চর্বন করেছিলেন। এই নাটক খ্রীষ্টের অষ্টম শতাব্দীতে রচিত হয়েছিল। (Civilization in Ancient India 1p. 18)। যদি তখন মুনি ঋষিরা গো মাংস ভক্ষণ না করতেন ও গো মাংস হিন্দু সমাজে নিষিদ্ধ হত, তাহলে ব্রাহ্মণ শিরোমণি কবিবর ভবভূতি তাঁর নাটকে ব্রাহ্মণাদি বহু হিন্দু দর্শকের সমক্ষে এরূপ দৃশ্য কখনও উপস্থিত করতেন না। রমেশচন্দ্র দত্ত লিখেছেন, এ নাটক রচিত হবার সময় পর্যন্ত গো-মাংস যে হিন্দু সমাজে প্রচলিত ছিল, তা নাটক দ্বারাই প্রমাণিত হচ্ছে। ঋগ্বেদে আছে যে পূর্বে বিবাহ উৎসবে গো-হত্যা করা হত। (ঋগ্বেদ ১০।৮৫।১৩)।

চরক-সংহিতার চিকিৎসিত স্থান নামক খণ্ডে নানা প্রকার পীড়ায় নানা প্রকার মাংসের ব্যবস্থা আছে। যথা কপোত, চটক, চকোর চক্রবাক, হংস, কুক্কুট, বাজ, কেঁচো, কাক, ময়ুর, সাপ, কচ্ছপ, সাজারু, ছাগ, মেষ, মৃগ, শশক, উষ্ট্র, গণ্ডার, মহিষ, শূকর, নকুল, সিংহ, ব্যাঘ্র, নেকড়ে, ভল্লুক, হস্তী, অশ্ব, গর্দভ, খেঁকশিয়ালী, ইঁদুর, বিড়াল, শৃগাল ও গরু। চরক মহর্ষি ছিলেন, তিনি মনুষ্য সমাজের হিতার্থে মহোপকারী আয়ুর্বেদ শাস্ত্র প্রণয়ন করেছিলেন। তিনিই এরূপ ব্যবস্থা দিয়ে গেছেন। জিজ্ঞাসা করি, তিনি কি গরু প্রভৃতি নিহত না করেই, তাদের মাংসের ফলাফল পরীক্ষা না করেই এরূপ ব্যবস্থা দিয়েছিলেন? আরও জিজ্ঞাসা করি, হিন্দু কবিরাজ মহাশয়গণ কি গো হত্যা না করেই ঐ ঔষুধ প্রস্তুত করতেন? আর হিন্দু রোগীগণকে কি তা খাওয়াতেন

না? এই চরক সংহিতার উপদেশ পেয়ে ডাক্তারগণ এখন গরু, শূকর ও কুক্কুট নিহত করে তাতে কত প্রকার ঔষধ প্রস্তুত করছেন। যথা oxbile, calf's foul jully, Raw meal juice Pen creatain Essence of chicken ইত্যাদি। হিন্দুগণ কি তা খাচ্ছেন না? তা ছাড়া দেখছি, মাট কুড়িয়ে সব প্রকার জীবজন্তুর হাড় ট্রেণ পূর্ণ করে চালান হচ্ছে। তা দ্বারা চিনি ও লবণ পরিষ্কৃত হচ্ছে! হায়! সেই চিনি ও লবণ কোন্ হিন্দু না খাচ্ছেন! সর্বোপরি, কত ইংরেজ ও গোরা সৈন্যের জন্য ও কত খ্রীষ্টানের আহারের জন্য প্রত্যহ কত গো বধ হচ্ছে। হিন্দুগণ কি তা বন্ধ করতে পারেন? তবে মুসলমান ভ্রাতাগণ আহারের জন্য গরু জবাই করলে কি হিন্দুগণের খড়্গ হস্ত হওয়া উচিত? যদি হিন্দুগণ তাদের মুসলমান ভাইদের বলে কয়ে বুঝিয়ে শুঝিয়ে গরু ছাড়া উট, ছাগল বা ভেড়া দ্বারা কুরবাণী করাতে সম্মত করায়, অথবা আবশ্যক হলে সেই সব পশু ক্রয় করতে মূল্য দিয়ে, আপোষে, সৌহার্দে গো হত্যা নিবারণ করতে পারেন, সে-ত অতি উত্তম। গে-রক্ষা ও গো জাতির উন্নতি সাধন কার না বাঞ্ছনীয়? আমাদের শুধু বক্তব্য এই, সামান্য গরুর জন্য হিন্দু মুসলমানে বিবাদ করে স্বর্গাদপি গরিয়সী জন্মভূমিকে নিয়ে রসাতলের গভীর গর্তে চির প্রোথিত করা একান্ত অকর্তব্য। সুতরাং এ তুচ্ছাতি তুচ্ছ ব্যাপার কে নিয়ে মাতামাতি করা বা বাড়াবাড়ির পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া কোন মতেই ঠিক নয়। সুখের বিষয় যে, এ প্রসঙ্গে হিন্দু-মুসলিম উভয়েই উদার মনোভাব গ্রহণ করেছেন, সেদিন খুব বেশী দূরে নেই, যেদিন সহজভাবে উভয়েই এ বিষয়টির মীমাংসা করে নেবেন। আধুনিক ভারতে হিন্দু মুসলিমের যে সম্পর্ক তা অতীব মধুর। উভয়েই মিলিত প্রচেষ্টায় সকল প্রকার সমস্যা সমাধানে বিশেষ ভাবে আগ্রহী। সংহতি ও সহিষ্ণুতার পরস্পরের মধ্যে যে ভাবের সৃষ্টি হয়েছে, তার মূল্যায়ণ হতেই থাকবে এবং এটি সাংস্কৃতিক মিলন ও অন্যান্য ভাবের আদান প্রদানের মাধ্যমে সহজতর হবে।

অষ্টম অধ্যায় ॥

কোরআনের সূরা—বেদের সূক্ত

আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, একদিকে হিন্দুর ঋগ্বেদ পরমেশ্বরের নিঃশ্বাস, "অস মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিত মেতদ্য দৃগ্‌বেদঃ" (বৃ-আ,৪-৫), অথবা ঋগ্বেদ স্বয়ং যেরূপ বলছে,—বৈদিক সূক্ত সফল, অভ্রাদ্বৃষ্টি রিবাজনি (৭-৯৪-৬) "মেঘ হতে বৃষ্টি ধারার ন্যায়, স্বর্গ হতে আবির্ভূত হয়েছে, অথবা যাস্কের নিরুক্ত যেরূপ বলছেঃ---"সাক্ষাৎকৃত ধর্বান ঋষয়. সম্বভূবুঃ। তেহ বরে ভ্যোহ সাক্ষাৎ কৃতধর্মভ) উপদেশেন মন্ত্রান সম্প্রাতুঃ" (১-৬-৫)। যাঁরা ধর্মকে সাক্ষাৎ ভাবে দেখেছিলেন (by their supra-in tell edual in fution Bergson), সেরূপ ঋষিগণ (ঋষিদর্শনাৎ) আবির্ভূত হয়েছিলেন। নিম্নস্তরের লোক, যারা ধর্মের সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করতে পারেনি। তাদের জন্য উপদেশরূপে তাঁরা বেদমন্ত্র সকল সম্প্রদান করেছিলেন। অপরদিকে কোরআন্ ও পরমেশ্বরের পক্ষ হতে পবিত্র আত্মা দ্বারা সত্যের সঙ্গে প্রকাশিত—"নাজ্জালাহো রুহুল্ কুদুসে মির রাব্বেকা বেল হাক্কে" (সূরা নাহাল-১৪)। পরমেশ্বর প্রত্যেক দলের মধ্যে রসুল (ঋষি) পাঠিয়েছেন "ও-য়া লাকাদ্ বা-আসনা ফী কুল্লে উম্মাতিন রা সূলান (সূরা নাহাল-৫)। বেদে ঈশ্বর বলছেন, "যং কাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমি তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধাং ("১০-১২৫-৫") আমি যাকে ইচ্ছাকরি, তাকে সর্বাপেক্ষা বলশালী (উগ্রং) করি, তাকে ঋত্বিকদের প্রধান (ব্রহ্মাণং) করি, তাকে ধর্মের সাক্ষাৎ দ্রষ্টা (ঋষিং) করি, তাকে সুবুদ্ধিশালী করি।" কোর আন বলছেনঃ "ওয়া-ল্লাহো ইয়ুয়াষ্বিৎদ্যো বে নাসরে হি ম্যাই ইয়্যাশা-উ (আল-ই-ইম্রাণ) "পরমেশ্বর যাকে ইচ্ছা করেন, আপন সাহায্যে বল দিয়ে থাকেন, "ইউলকি রুহা মিন্

আমরিহি আলা মাঁই ইয়াশাউ মিন্ এবাদিহি "(আলমোমেন-২) তিনি স্বীয় অজ্ঞামত আপন উপাসকদের যার প্রতি ইচ্ছা করেন আত্মা অবতরণ করেন।" কি আশ্চর্য? কোন্ দেশের, কোন কালের কোরআন, আর কোন্ দেশের, কোন কালের বেদ, এই দুইয়ের বাক্যের একতা কি সেই বাক্যের সত্যতার অকাট্য প্রমাণ নয়? কোরআন এবং বেদ উভয়কি হিন্দু মুসলমান উভয়ের বিশেষ সমাদরের বস্তু নয়? তবে বেদের বয়স কম পক্ষেও আট দশ হাজার বছরের কম হবে না। তখন ঈশ্বর অর্থে বর্তমান আল্লাহ্ কি পরমাত্মা শব্দের ন্যায় কোন শব্দ ক্রুটিপ্রাপ্ত হয় নি। তখন মানব জাতির শৈশব কাল। কেবল উপমিতি বলে ভৌতিক কাচ আগ্ন্যাদি শব্দ দ্বারাই ঐশ্বারিক অথবা আত্মিক তত্ত্ব প্রকাশ করা সম্ভব ছিল, ঋগ্বেদের সময় মুদ্রাংকন দূরে থাকুক, লিপি প্রচলনও ছিল না। ঋকমন্ত্র সকল মুখে মুখে রচিত হত—'মিসীহি শ্লোক মাস্যে' (১-৩৮-১৪)। বহুকাল কেবলমাত্র শ্রুতির সাহায্যে যে সকল মন্ত্র রক্ষিত এবং প্রচারিত হয়েছিল। এজন্যই বেদের নাম হয়েছে শ্রুতি। এই কারণে ইচ্ছায় হোক অথবা অনিচ্ছায় হোক, সময়ে সময়ে বেদের অন্তর্ধান হত। তখন যে সকল পণ্ডিতের ঘরে বেদ লুকোন ছিল, তারা অবাধে ইচ্ছামত শ্লোক রচনা করে বেদের মধ্যে যোগ করবার সুবিধা পেতেন। প্রকৃত যর্জুবেদ আজও নেই। তার পরিবর্তে দুটি পরস্পর বিরুদ্ধ যর্জুবেদ, একটি শুক্ল, অপরটিও কৃষ্ণ, তার স্থান অধিকার করেছে। অথচ তাদের অনেক মন্ত্র নীতি-বহির্গত এবং বেদ নামের অযোগ্য, কোরআন সম্বন্ধে সেরূপ নয়। কোরআনের বয়স মাত্র ১৪০০ বছর। তখন লিপি প্রচলন সুপ্রতিষ্ঠিত এবং আদি হতেই কোরআন লিপিবদ্ধ; শুধু তাই নয়—আমাদের বেদ রক্ষার ভার যেন ব্রাহ্মণদের ওপরে ন্যস্ত হয়েছিল, কোরআন রক্ষার ভার ও সেইরূপ হাফেজদের ওপরে ন্যস্ত হয়েছিল। কিন্তু বেদের ওপরে ব্রাহ্মণদের বংশগত অগ্রাধিকারের ন্যায় কোরআনের ওপর হাফেজদের কোন বংশগত অগ্রাধিকার ছিল না। আমাদের ব্রাহ্মণেরা ঈশ্বর সর্বভূতানাং ধর্ম কোষস্য গুপ্তয়ে (মনু-১-৯৯), আপনাদেরকে

ঈশ্বর বানিয়ে তুলেছিলেন। নিজেদের স্বার্থের সুবিধা হবেনা দেখে, আমাদের ব্রাহ্মণেরা সেই ধর্মকোষ, যার দৌলতে তাঁরা 'ঈশ্বর সর্বভূতানাং' হয়েছিলেন, সেই বেদই লোপ করে শূদ্রাদিকে, দেশের শতকরা নিরানব্বই জনকে—দাস্যায়ের হি সৃষ্টো সেই" বলে আপনাদের গোলাম করে রাখলেন। হাফিজেরা সেরূপ করেন নি। কোর আন দেশ বিদেশের হাফিজদের কণ্ঠে সর্বদা সুরক্ষিত ছিল। বেদ মন্ত্রের মত কোন পণ্ডিতের পক্ষে আয়াত রচনা করে তা কোরআনে যোগ করা সম্ভব হয়নি। এতদ্ভিন্ন আরও একটি কথা সকলেরই স্মরণ রাখতে হবে, বেদই বল আর কোর আনই বল, কোন একটি সময় বিশেষ এবং কোন একটি জাতি বা দেশ-বিশেষের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছিল। যদিও সাধারণ ভাবে বেদ এবং কোরআন উভয়ই 'পারমার্থিক' এবং 'বিশ্বজনীন'—যদি ও বেদ 'সর্বাষাসেমানং (১-১২৭-৮), 'সকল মানুষের পক্ষে সমান, যদিও সকল মানুষকেই তাদের ধর্ম বলে দেয়, ব্যব্রবীৎ বয়ুনা মতেভ্যঃ (১-১৪৫-৫), যদিও কোরআনও রহমাতাল লিল আলামিন (আম বিয়া-৭) "সমস্ত জগতের জন্য দয়ার স্বরূপ," অথবা জেকরুল লীন আলামীন "(সূরা ইউসুফ-১১), "সমস্ত জগতের জন্য উপদেশ," সমস্ত মানব জাতির মনের (রোগের ঔষধ শেফাউল্লে মা ফীস সুদূরে (সূরা ইউনূস—৬), তথাপি আমাদের এ কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, ঋগ্বেদেও কোন কোন কথা আছে, যা 'পারমার্থিক' নয়, 'ব্যবহারিক' এবং সাময়িক মাত্র, যা বৈদিক লোকেরই উপযোগী ছিল, অথবা মানব জাতির শৈশব কালের মাত্র উপযোগী ছিল, এ কালের উপযেগী নয়,—যথা অগ্নি মন্থন এবং যজ্ঞে অগ্নিতে যোসাদি হব্য প্রদান (ঋগ্বেদ পৃঃ ১৬৮), যা মানব সমাজের শৈশবকালে অথবা লিপি প্রচলনের পূর্বে প্রয়োজন ছিল। সেরূপ কোর আনেও কোন কোন কথা আছে, যা সাময়িক মাত্র, যা ঐ কালের আরবের আরবী ভাষী কোরায়েশদের উপযোগী মাত্র ছিল, বর্তমান কালের ভারতীয় বাংলা ভাষী মুসলমানের উপযোগী নয়, যথা নামাজাদিতে কেবলমাত্র আরবী ভাষার ব্যবহার, বহু বিবাহ, যুদ্ধে প্রাপ্ত দাসী বাঁদী বিবাহ, এবং

তালাকের ব্যবস্থাদি, যতদিন খাদিজা বিবি জীবিত ছিলেন, হযরত তাঁর বিবাহিত জীবনের অন্ততঃ ২৫।৩০ বছর কাল আনুমানিক ৫৬ বছর বয়ঃক্রম পর্যন্ত অর্থাৎ লোকান্তর গমনের মাত্র সাত বছর পূর্ব পর্যন্ত কোন অন্য দার পরিগ্রহ করেন নি। কোরআন নিজেও 'মুহকামাতুণ বা সিদ্ধান্ত, এবং মুতাসাবিহাতুন" বা সাময়িক কবি কল্পনা,। এই দুয়ের মধ্যে প্রভেদ করছেন (আল-ই-ইমরান-১)।

সে যাই হোক হিন্দু মুসলমান সকলকেই স্মরণ রাখতে হবে 'এক বিধাতা এক বিধান, এক মনুষ্য এক গম্যস্থান, এক সত্য।" সত্যের আলোকে সত্যের ওপরে দাঁড়িয়ে পূর্ণ কল্যাণ সাধনার জন্য আমরা বেদ এবং কোরআন উভয়কে গ্রহণ করব। সত্যের কষ্টি পাথরে পরীক্ষা করে, সত্য জেনেই মুসলমান কোরান এবং সেই সঙ্গে কোরআনকে গ্রহণ করবেন। সত্য সকলের নিকটেই সত্য। কল্যাণ সকলের পক্ষেই কল্যাণ। সত্য এক, কল্যাণ এক, মিথ্যা নানা। কোরআন মুসলমানের নিকট সত্য হলে, হিন্দুর নিকট ও সত্য হবে। কোরআন দ্বারা মুসলমানের কল্যাণ, অতএব হিন্দুরও কল্যাণ। ভালবস্তু সকলের জন্যই ভাল। বেদ ও হিন্দুর নিকটে সত্য হলে, মুসলমানের নিকটেও সত্য। বেদ দ্বারা হিন্দুরও কল্যাণ, মুসলমানেরও কল্যাণ। ফজলি আম হিন্দুর নিকট ও মিষ্টি, মুসলমানের নিকট ও মিষ্টি। সত্যের এবং ধর্মের ভিত্তিতেই মিলে। আমরা হিন্দু-মুসলমান এক হব। ঈশ্বর এবং ধর্মকে দূরে রেখে, শুধু একত্রে চা পান করে নয়। সেই আশায় আমরা হিন্দু-মুসলমান উভয় শ্রেণীর পাঠকের জন্য কোরআনের কতিপয় সূরার, এবং ঋগ্বেদের কতিপয় সূক্ত, তাঁদের উভয়ের সমক্ষে উপস্থিত করতে প্রয়াসী হয়েছি।

॥ ২ ॥

, হিন্দুর গায়ত্রী মন্ত্র—"তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ" (ঋগ্বেদ, ৩-৬২-১০),—'জগতের যিনি চালনকর্তা, তাঁর পূজনীয় তেজ (নূর) ধ্যান করি, যেন তিনি আমাদের বুদ্ধিকে মঙ্গলের দিকে প্রেরণ করেন (প্র-চোদায়াৎ),—এই গায়ত্রী মন্ত্র যেমন

হিন্দুর অমূল্য ধন। প্রভুর প্রার্থনা,—"হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা, তোমার নাম গৌরবান্বিত হোক" ইত্যাদি যেমন খ্রীষ্টানদের অমূল্য ধন, সেইরূপ মুসলমানের পক্ষে এই 'সুরা ফাতেহা' ও অতি অমূল্য ধন। এই সুরা দ্বারা কোরআনের আরম্ভ। এই সুরার উচ্চারণ ভিন্ন মুসলমানদের সামাজিক অথবা ব্যক্তিগত সকল ধর্মানুষ্ঠান অপূর্ণ থাকে। সুরা ফাতেহার নামান্তর 'উম্মুল কোরআন', কারণ এ কোরআনের সংক্ষিপ্ত সার স্বরূপ। মুসলমান ধর্ম কি? এই সুরা সংক্ষেপে সে পত্রের উত্তর দিচ্ছে। ঈশ্বর ভক্ত ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করছেন, আমাদের সরল সত্য পথে (সিরাতল-মুস্তাকীম) চালাও। গায়ত্রী মনে এ যেমন দ্রষ্টা ঋষি প্রার্থনা করছেন। "ধিযের যো নঃ প্রচোদয়াৎ"। সেই সিরাতল মুস্তাকীম' কি? সূরা আল-ই ইমরানে সংক্ষেপে সে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে—'ইন্না ল্লাহা রাব্বী ও আরব্ব্ুকুম ফা' বোহু হো হাজা সেরাতুম মুস্তাকীম" (৩-৫-৫০) 'নিশ্চয় পরমেশ্বর আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপাল'ক। অতএব তাঁকে পূজা কর, এটিই সত্য সরল পথ—"সেরাতুম মুস্তাকীম"। সূরা আনামে (৬-১৯) আরো বিস্তারিত রূপে সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে—(১) উপাসনাতে কাউকেও পরমেশ্বরের শরীক না করা (২) পিতা-মাতার প্রতি দয়া করা (৩) দারিদ্রতার ভয়ে সন্তান বধ না করা (৪) অশ্লীল আচারের নিকটবর্তী না হওয়া (৫) ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষার উদ্দেশ্যে ভিন্ন কাউকেও বধ না করা (৬) সদুদ্দেশ্য ভিন্ন পিতৃহীন বালকের সম্পত্তির নিকটে না যাওয়া (৭) সকলকে তাদের প্রাপ্য ঠিকমত দেওয়া (৮) আত্মীয় অনাত্মীয় নির্বিশেষে সর্বদা ন্যায় সঙ্গত কথা বলা, "এটিই সত্য সরল পথ"।—"ও-আ আন্না হাজা সেরাতী মুস্তাকীমান্"—অতএব এর অনুসরণ কর, বহু পথের অনুসরণ করো না। তবে তা তোমাদেরকে সেই পথ হতে বিচ্ছিন্ন করবে। এ দ্বারা তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দিয়েছেন। ভরসা যে তোমরা ধর্ম ভীরু হবে (৬-১৯-১৫৪ গিরীশ মৌলবী)। এই ত প্রকৃত মুসলমান ধর্ম। কোন চিন্তাশীল হিন্দু বলবে যে এটি প্রকৃত হিন্দু ধর্ম নয়।' বেদের

ঋষি বৃষ্টি বা অন্নদাতা পরমেশ্বরের নিকটে (ইন্দ্র=ইন্থ বা বৃষ্টি, বা ইরা বা অন্নর দাতা) প্রার্থনা করছেন—চয়মিন্দ্র ত্বায়ব সখিত্বমার ভাম হে ঋতস্য ন পথা নয়াতি বিশ্বানি দুরিতা" (১০-১৩৩-৬) "হে অন্নদাতা পরমেশ্বর ! আমরা তোমাকেই কামনা করি। আমরা যেন তোমর বন্ধুত্ব লাভ করি। সকল দুষ্কর্ম হতে উদ্ধার করে আমাদেরকে সত্যের পথে নিয়ে যাও।" বেদে এই ঋত বা সত্যের পথের বার বার উল্লেখ আছে। পরি চিন্মতো দ্রবিণং সমন্যাৎ ঋতস্য পথা (১০-৬১-২)। "মানুষ সর্বদা সত্যের পথে থেকে ধন কামনা করবে।" বেদেও সেই ঋতের বা সত্যের পথের বহু স্থানে বর্ণনা আছে : (১) একেশ্বরের আরাধনা—"নহি ত্বদন্যো গিবর্ণো গিরঃ সঘৎ" (১-৫৭-৪), হে স্তবনীয় পরমেশ্বর, তুমি ছাড়া কেউই আমাদের স্তুতি পাবে না।" (২) সৎকর্মশীল (সুকৃৎ প্রিয়ঃ হওয়া, (২) পরমেশ্বরের স্তব (এবাদৎ) করা (মনায়ুঃ), (৪) সদাচার পরায়ণ হওয়া (সু প্রাবাঃ)—"প্রিয় সুকৃৎ প্রিয় ইন্দ্রে মনায়ুঃ প্রিয় সুপ্রাবীঃ (৪-২৫-৫) এই সকল সদ্‌গুণ থাকলে লোক 'পরমেশ্বরের প্রিয় হয়।' (৫) পরের পরিশ্রমের ফল ভোগে আসক্ত না হওয়া, নাহং রাজন্নন্য কৃতেন ভোজর (২-২৮-৯), এবং (৬) অন্যে আহার করেছে, এ না জেনে, নিজে আহার না করা ;—'কেবলাঘো ভবতি কেবলাদ ? (১০-১১৭-৬) ইত্যাদি। এই সকল কথা ধীর ভাবে পর্যালোচনা করে, কোন হিন্দু বা মুসলমান বলবে যে হিন্দু ধর্ম আর মুসলমান ধর্ম এক নয় ? কোন হিন্দু কি মুসলমান, মহাত্মা গান্ধীর মত সমর্থন না করে বলবে, যে প্রকৃত হিন্দুই প্রকৃত মুসলমান।

॥ ৩ ॥

সূরা ইখ্‌লাস সম্বন্ধে আলোচনা : এই সূরা ইখলাস পরমেশ্বরের একত্ব ঘোষণা করছে। জিজ্ঞাসা হতে পারে যে কোরআনের কোরাইশদের বা কাফেরদেরই মতন হিন্দুদেরকে কি অসংখ্য দেব-দেবীর পূজা করতে দেখা যায় না ? তেল ও জল একত্রে মিশ্রিত করলে কি এক হয় ? তা হলে হিন্দু মুসলমান তবে কি করে এক হতে পারে ? ভাই আঁধার ঘরেই রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়। হিন্দু মুসলমানকে জানে না। মুসলমান হিন্দুকে

জানে না। বেদই হিন্দু ধর্মের মূল। প্রকৃত মুসলমান ধর্ম কি তা জানতে হলে যেমন কোরআনে যেতে হবে। প্রকৃত হিন্দু ধর্ম কি, তা জানতে হলেও সেইরূপ বেদ-বেদান্ত ও পরমেশ্বরের একত্বই ঘোষণা করতে হবে। সদৈব ও সৌম্যোদ মগ্র আমীদেক মেবা দ্বিতীয়ং (ছান্দোগ্য ৬-২-১), হে প্রিয় শিষ্য, এই দৃশ্যমান বস্তু সকলের পূর্বে সত্য স্বরূপ পরমেশ্বর ছিলেন, তিনি একমাত্র অদ্বিতীয়।" ঋগ্বেদ বলছে "একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি" (ঋগ্বেদ, ১-১৬৪-৪৬), "এক সত্য স্বরূপ (পরমেশ্বর) আছেন, ঋষিগণ তাঁকেই নানারূপে বর্ণনা করেন।" "যো নঃ পিতা জনিতা বিধাতা যে দেবানং নমেধা এক এর" (১০-৮২-৩) "পরমেশ্বর যিনি আমাদের প্রতিপালক, জন্মদাতা, বিশ্বের বিধান কর্তা, যিনি অগ্ন্যাদি দেবনাম ধারণ করেন, তিনি এক। "এতাবনিস্য মহিমাতো জ্যায়াস্ব হরুষ" (১০-৯০-৩), এই সমস্ত যাঁর মহিমা, সেই বিশ্ব পুরুষ এ সমস্ত হতেও মহত্তর।" কোরআন বলছে আল্লাহ্ জন্মদেন না, জন্ম গ্রহণও করেন না, বেদেও ঋষি বশিষ্ট বলছেন, "ন ত্বা বাঁ অন্যো দিব্যো। ন পার্থিবো ন জাতো ন জনিষ্যতে" (৭-৩২-২৩), "হে অন্নদাতা (ইন্দ্র), পৃথিবীতে অথবা স্বর্গে, তোমার মত কেউ জন্মে নি, কেউ জন্মাবে না।" বস্তুতঃ অবতারবাদ এবং পৌত্তলিকতা বেদ বিরুদ্ধ, বুদ্ধের পরবর্তী বৌদ্ধ নিরীশ্বরবাদের অথবা শূন্যবাদের ফল। বস্তুতঃ জগতে শূন্যের স্থান নেই। Nature after recaum। তর্ক করে যখন বৌদ্ধেরা ঈশ্বরকে উড়িয়ে দিল, তার শাস্তি স্বরূপে তাদের কল্পনাতে তাদের বুদ্ধাদিই ঈশ্বরাবতারের সামিল এবং কালে অবতার এবং অবতারের প্রতিমূর্তি সেই ঈশ্বরের শূন্যস্থান অধিকার করলে তাদের অধোগতির কারণ হয়। এজন্য অবতারবাদ এবং পৌত্তলিকতা প্রকৃত হিন্দুরও আদরের অযোগ্য।" কোরআন বলছে, যে "পরমেশ্বরের সমকক্ষ কেউ নেই।" হিন্দুর চিরন্তন আদর্শ ঋষি বামদেব (শাস্ত্র দৃষ্টা তুপ দেশো বামদেবৎ "—ব্রহ্মসূত্র ১-১-৩০। সেই ঋষি বামদেব তাঁর দৃষ্ট ঋগ্বেদীয় সুক্তে বলছেন—"ন কিরিন্দ্র তত্বুওরো ন জ্যার্ঙ অস্তি বৃত্র হন। নকিরে বা যথা ত্বং॥ সত্রা তে অনু কৃষ্টয়ো বিশ্বা চক্রের

বাবৃতুঃ। সত্রা মঁহা অসি শ্রুতঃ (৪-৩০-১, ২") "হে বিঘ্ন বিনাশন (বৃত্র হন) ইন্দ্র বা অন্নদাতা পরমেশ্বর, তোমা হতে উৎকৃষ্ট, তোমা হতে মহত্তর কেউ নেই। তুমি যেমন, তেমন আর কেউ নেই। মানবমণ্ডলী (কৃষ্টয়ঃ) সত্যই (সত্রা) তোমাকে আশ্রয় করতে অনুন্য জীবনধারণ করে (বাবৃতুঃ) গাড়ির চাকা যেমন গাড়ীরই অনুসরণ করে, সেইরূপ বিশ্বসংসার তোমার অনুসরণ করে। সত্যই তুমি মহান, লোক সকল তোমারই মহিমা কীর্তন করে। 'ঋষি ভরদ্বাজও বলছেন 'সত্য মিৎ তন্ন ত্বা বাঁ অন্যো অস্তীন্দ্র দেশে ন মর্ত্যা জ্যায়া' (৬-৩০-৪), 'হে অন্নদাতা পরমেশ্বর (ইন্দ্র), একথা সত্য যে তোমার মত (ত্বাবান) অন্য কেউ নেই, ফেরাস্তাদের মধ্যে (দেবঃ) ও নেই, মানুষের মধ্যেও নেই। তোমা হতে শ্রেষ্ঠ কেউ নেই। এই সকল পর্যালোচনা করে কি আমরা দেখছিনা, যে হিন্দুর বেদ-বেদান্তে সূরা এখলাসের প্রত্যেক বাক্যের প্রতিধ্বনি রয়েছে, এবং কে না জানে, যে বেদ বেদান্তই প্রকৃত হিন্দু ধর্মের মূল।

॥ ৪ ॥

সূরা কাফেরুন সম্বন্ধে আলোচনা : সূরা কাফেরুন এই সময়ের বিশেষ উপযোগী হিন্দু মুসলমান উভয়ের বিশেষ অনুধাবন যোগ্য। মহাত্মাগান্ধী বলেছেন, হিন্দু মুসলমান এক হও; কোরআন বলছে— "তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম, এবং আমার জন্য আমার ধর্ম—লা কুম দীনো কুম ও য়ালেয়াদীন; এবং কোরআন একথা শুধু মুসলমানকে বলছে না, সমস্ত মানব জাতিকে বলছে, যেহেতু কোরআনই সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, এই কোরআন সমস্ত মানব মণ্ডলীর জন্য "জেকরুণ লিল আলামিন' (সূরা ইউসুফ, ১২)। মুসলমানের ধর্মাদি মুসলমানের জন্য। হিন্দুর ধর্মাদি হিন্দুর রইল, তবে তারা এক হবে কি নিয়ে? তুমি কি বলবে, সাধারণ স্বার্থ নিয়ে এক হবে? সাধারণ স্বার্থ নিয়ে যেমন এক হবে, বিশেষ স্বার্থের বেলা, বিরুদ্ধ স্বার্থের বেলা তেমনি হিন্দু মুসলমানে বিবাদ বাধবে এবং গো-হাটের মত একে অন্যের মাথা ফাটাবে। হিন্দু মুসলমানকে এক হতে হবে, সত্যের ভিত্তিতে, ধর্মের

ভিত্তিতে। হিন্দু-মুসলমান উভয়ে যতক্ষন না বুঝবে, যে তারা উভয়ে এক ঈশ্বরের সেবক, যতদিন না তারা সেই সত্য ঈশ্বরের সেবায়, তারই নামে দেশের সেবায়, গান্ধী ও সৌকত আলীর মত পরস্পরকে হৃদয়ের সঙ্গে আলিঙ্গন করবে, ততদিন হিন্দুর সঙ্গে মুসলমানের একতা কতকগুলি অহিন্দু অথবা অ-মুসলমানের একত্র খানা খাওয়াতে, অথবা চা পানে পর্যবসিত হবে,—তেল আর জলের একতার মত কথার কথা মাত্র থাকবে, ততদিন ভণ্ডামীতে দেশ ছেয়ে যাবে, এবং হিন্দু-মুসলমান চিরদিন মেরুদণ্ডহীন থাকবে। যে জানে যে অস্পৃশ্যতা এবং হিন্দু মুসলমান ভেদ মিথ্যা এবং দেশের অকল্যাণকর, সে যদি অন্তরে বাইরে তা দূর করবার জন্য চেষ্টা না করে, বরং যারা অস্পৃশ্যতাদিতে বিশ্বাস করে, তাদের সঙ্গে আপোস করবার জন্য, অস্পৃশ্যতাদি মত মেনে চলবার ভান করে, তাদের সম্বন্ধে হিন্দু শাস্ত্র বলছে—"যে অন্যনা সন্তমাত্মান অন্য না প্রতি পদ্যতে কিং তেন ন কৃতং পাপং চৌরেনাত্ম পহারিনা॥ "যে এক প্রকার হয়ে আপনাকে অন্য প্রকার দেখায় সেই আত্মোপরহারী চোর দ্বারা কোন পাপ করা বাকি রইল।"

ইঞ্জিলও বলছে "দুটি প্রভুর সেবা কেউ করতে পারে না।" "তোমাদর জন্য তোমাদের ধর্ম, আমার জন্য ধর্ম আমার" মতই সর্বধর্মসম্মত। আচার্য কেশবচন্দ্রের একথা কেউ ভুলো না, যে "ঈশ্বর এক, সত্য এক, মানব প্রকৃতি এক, অতএব প্রকৃত ধর্মও এক। হিন্দুবেদ মাথায় করে সত্যের দিকে মুখ করে দাঁড়াও, এবং বেদ যখন নিজে বলছে যে বেদ "সর্বাসাং সমানং" মুসলমানকে বেদ অর্পণ কর; মুসলমানও কোরআন মাথায় করে সত্যের দিকে মুখ করে দাঁড়াও, এবং হিন্দুকে কোরআন অর্পণ কর! কোরআন সমস্ত মানব জাতির প্রতি ঈশ্বরের দয়া স্বরূপ রহমাতান্ লিল্ আলামীন (আনবিয়া ১০৭) হিন্দু প্রকৃত হিন্দু হও, মুসলমান প্রকৃত মুসলমান হও। জেনো সত্যের আলোকে, প্রকৃত ধর্মের আলোকে, তোমরা ঈশ্বরেতে নিশ্চয় এক হবে। সত্যকে বাদ দিয়ে মিথ্যার সঙ্গে আপোষ করে কখনো এক হতে পারবে না। জগতের অন্যদেশে, অন্যকালে যা হয়েছে,

এদেশে একালের সত্যের প্রভাবে তাই হবে। বর্তমান ইংরেজ জাতি এক সময়ে নানা জাতিতে বিভক্ত ছিল। তাদের একটি শাখা যাদের হতে ইংরাজ জাতির নামকরণ হয়েছে, রোমের বাজারে তারা দাসরূপে বিক্রী হত। তাদের দুর্গতি দেখে দয়ার্দ্র হয়ে কতিপয় সাধু মহাপুরুষ ইংলণ্ডে ঈসা পয়গাম্বর প্রাপ্ত ইঞ্জিল প্রচার করেন। তার ফলে সেই সমস্ত জাতি মিশে এক হয়ে যায়, ড্রয়িডাদি ধর্ম খ্রীষ্টধর্মের সঙ্গে এক হয়ে যায়। ড্রুয়িড ধর্মের 'ইয়ুল টাইড' খ্রীষ্টবাদীর খ্রীষ্টমাসে রূপান্তরিত হয়। আজও বিলাতে খ্রীষ্টমাসে ড্রুয়িডদের মিসল্‌টোর বিশেষ সমাদর। এই জাতিগত এবং ধর্মগত সংমিশ্রণের ফলে তারা এক সময়ে অতি দুর্বল ছিল, সেই জাতি আজ জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ। ভারতেও যদি মুসলমান আগমনের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুর মধ্যে কোরআন প্রচার হত এবং মুসলমানদের মধ্যে বেদ প্রচার হত, তবে এতদিনে হিন্দু এবং মুসলমান মিশে এক জাতি হত। সেই জাতির মধ্যে একাধারে হিন্দুর বুদ্ধি এবং ধৈর্য, এবং মুসলমানের তেজ এবং কর্মঠতা প্রকাশ পেত। সেই সম্মিলিত হিন্দু-মুসলমান জাতি আজ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করত। আজও যদি ঈশ্বর এক, সত্য এক, প্রকৃত ধর্ম এক জেনে সত্যের প্রতি দৃষ্টি স্থির রেখে হিন্দু মুসলমানের আল্লাহ্‌কে পরমেশ্বর এবং কোরআনকে পঞ্চম বেদ জ্ঞানে আপনার বলে গ্রহণ করে এবং মুসলমানও অপরদিকে হিন্দুর পরমেশ্বরকে এবং বেদকে আপনার বলে গ্রহণ করে, আজও তাই হবে। একদিন হিন্দু মুসলমান এক হয়ে গিয়ে মহাত্মা গান্ধীর প্রাণের আশা পূর্ণ করবে। বস্তুতঃ হিন্দু অনুদার নয়। আদিতে হিন্দুর তিন বেদ ছিল (ত্রয়ী)। অপূর্বে বেদের প্রচারের পর, বেদের সংখ্যা চার হল, সেইরূপ কোরআন প্রচার হলে হিন্দুর বেদের সংখ্যা পাঁচ হত। হিন্দু সেদিনও খ্রীষ্টান হতে চলেছিল। রামমোহন রায় এবং কেশব চন্দ্র সেন ত্রিত্ববাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন, তাই দেশ খ্রীষ্টান হলো না। কোরআন সম্বন্ধে সেরূপ কোন বাধা নেই। বরং রামমোহন এবং কেশব বিশেষতঃ কোরআনের প্রথম বঙ্গানুবাদকারী স্বনামধন্য মৌলবী গিরীশচন্দ্র

কোরআন প্রচারের পথ অতি প্রশস্ত করে রেখে গেছেন। তাঁরা স্বর্গ হতে ঘোষণা করছেন, 'ঈশ্বর এক, সত্য এক, প্রকৃত ধর্ম এক, বেদ কোরআন এক, হিন্দু মুসলমান হোক এক, এবং হিন্দু মুসলমান উভয়কে 'আগে চল, আগে চল' বলে তারা আহ্বান করছেন।

॥ ৫ ॥

সূরা আসর সম্বন্ধে আলোচনা : এই সূরাতে প্রকাশিত হচ্ছে যে,

(১) যাঁরা ঈশ্বরে এবং পরকালে বিশ্বাস করে,

(২) যাঁরা সৎকর্ম করে,

(৩) যাঁরা সত্যের সম্বন্ধে এবং ধৈর্যাবলম্বন সম্বন্ধে পরস্পরকে উপদেশ দিয়ে থাকে, ইহকালে এবং পরকালে তাদের কোন ক্ষতি হয় না। প্রকৃত মুসলমান ধর্ম তবে কি ?

(১) ঈশ্বর এবং পরকালে বিশ্বাস,

(২) সৎকর্ম বা লোকের হিতকর কর্মের অনুষ্ঠান,

(৩) লোককে সত্যের সম্বন্ধে উপদেশ দান করা, এবং

(৪) ধৈর্যের সঙ্গে অসত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা।

কোন্ হিন্দু বলবে, তাই প্রকৃত বেদ-সিদ্ধ হিন্দু ধর্ম নয় ? ধর্মে এবং সত্যে বিশ্বাস এবং অসত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামাদি সম্বন্ধে ঋগ্বেদ সাক্ষ্য দিচ্ছে :—শতংতে রাজনভিষজঃ সহস্র মুধা গভীরা সুমতিষ্টে অস্তু। বাধস্ব দূরে নির্ঋতিং পরাচিঃ কৃতং চিদেনঃ এ মুগ্ধ্যস্মৎ। ১-২৪-৯। 'হে বিশ্বরাজ, বিপন্ন নিবারণকারী বরুণ শত সহস্র প্রকার ঔষধ তোমার হাতে আছে, তোমার বিশ্বজনীন এবং গভীর অনুগ্রহ বুদ্ধি (সুমতিঃ) আমাদের প্রতি হোক। মিথ্যা অথবা পাপের দেবতাকে অথবা শয়তানকে (নির্ঋতিং) দূরে থাকতেই পরাংমুখ করে (পরাচিঃ) তাড়িয়ে দিয়ে বাধা দাও। আমরা যে পাপ করেছি আমাদের হতে তাও দূর কর। সৎকর্মাদি সম্বন্ধেও ঋগ্বেদ বলছে : "ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্য জত্রাঃ। স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টু বা সস্তানুভির্ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ। (১-৮৯-৮ ॥) 'হে

ঈশ্বর মহিমার প্রকাশক দেবগণ, কর্ণ দ্বারা যেন আমরা সকলের মঙ্গলের কথা শ্রবণ করি। হে পূজনীয়গণ, চক্ষু দ্বারা যেন আমরা লোকের মঙ্গলই দর্শন করি,—সুস্থ অঙ্গযুক্ত শরীর ধারণ করে তোমাদের মহিমা কীর্তন কার্যে নিযুক্ত থেকে, যতদিন বেঁচে থাকি, যেন দেব প্রদর্শিত কার্যই সম্পাদন করি (ব্যশেম)'।' পর ঋণী সাবী রধ মৎ কৃতানি মাহং রাজন্নন্য কৃতেন ভোজং (২-২৮-৯)। হে বিশ্বরাজ বরুণ ত্রি পিত্রাদিকৃত ঋণ আমা হতে দূর কর, (পরা সাবীঃ), আমার স্বকৃত ঋণও দূর কর—আমি যেন পরের উৎপাদিত অন্ন অথবা ধন সম্ভোগ না করি। কোরআনও বলছেঃ "আহাল্লা ল্লা হোল বাইয়া ওয়া হ। র্রা মো রের্বা' (২-২৭-৪)। পরমেশ্বর শিল্প বাণিজ্যকে বৈধ এবং সুদ গ্রহণকে অবৈধ করেছেন। হায় আজকাল আমাদের শ্রম ভীরু তথাকথিত ভদ্র লোকেরা গরীবের উৎপাদিত অন্ন সম্ভোগ করে বা সুদখুরী করে তাদের অন্তর কলুষিত করছে। আবার ঋষি বলছেন "পরিচিন্মর্তো দ্রবিণং মমন্যাদৃতস্য পথা নমস বিবাসেৎ (১০-৩১-২)। "মানুষ সত্য এবং ন্যায়ের পথে থেকে সর্বদা ধনোপার্জন করতে ইচ্ছা করবে, এবং সেই উপার্জিত ধন দ্বারা বিনীতভাবে সকলের সেবা করবে। একালেও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মধর্মের সাররূপে যে ব্রাহ্মধর্ম বীজ উপদেশ করেছেন, তা এই তস্মিন প্রীতিস্তস্য প্রিয় কার্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।" এই সকল কথা পর্যালোচনা করে কে না বলবে, ঈশ্বর এক, মানব প্রকৃতি এক, ধর্ম এক, মুসলমান ধর্ম এবং হিন্দু ধর্মও এক। কে না বলবে যে প্রকৃত হিন্দুই প্রকৃত মুসলমান, প্রকৃত মুসলমানই প্রকৃত হিন্দু।

॥ ৬ ॥

সূরা ইনশিরাহ্ সম্বন্ধে আলোচনাঃ পরমেশ্বর হযরত মোহাম্মদের হৃদয় প্রসারিত করেছিলেন, তার কাঁধের বোঝা নামিয়ে ছিলেন। পাঠক এই বাক্যের ধর্ম গ্রহণ করুন। কোরআন বলছে যে কোরআনের কোন কোন আয়াত "মুতাশাবেহাতুন" রূপক মাত্র—

(আল-ই-ইমরান ৬)। এই বক্ষ প্রসারণ এবং বোঝা নামানও কি রূপক নয়? অন্য সূরায় দেখা যায় হযরত মুসা ও ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করছেন, "যে আমার প্রতিপালক, তুমি আমার জন্য আমার হৃদয়কে প্রশস্ত কর, এবং আমার জন্য আমার কার্য সহজ কর" "বোঝা নামান, আর কার্য সহজ করা" একই। আবার সূরা এনামে বলা হচ্ছে, যে "পরমেশ্বর যাকে সত্য পথে চালনা করতে ইচ্ছা করেন, তিনি তাঁর হৃদয় ইসলামের প্রতি প্রশস্ত করেন ("সাদরাহ" পারা আম—১২৬)। এই সকল কথা পর্যালোচনা করে কে না বলবে—যে মুণ্ডকোপনিষদে যে হৃদয়গ্রন্থি ভেদ সংশয় চ্ছেদ; এবং কর্মসূত্রের কথা বলা হয়েছে—"ভিদ্যতে হৃদয় গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন দৃষ্টে পরাবরে" (২-২-৮) কোরআনও কি তাই প্রকাশ করছে? কোরআনের মুসলমান ধর্ম এবং বেদোপনিষদের হিন্দু ধর্ম কি তবে একই ছাঁচে ঢালাই করা নয়? অবশ্য একথা সত্য, যে হযরত মোহাম্মদ একাধারে উপদেষ্টা ঋষি, বিধিব্যবস্থা প্রণেতা, বিচারক, যুদ্ধ বিগ্রহে সেনাপতি, এবং দলপতিরূপে রাজ্য শাসন কর্তা। সে সম্বন্ধে জগতে তাঁর সঙ্গে কারো তুলনা হয় না। তদনুপাতে তার বক্ষ প্রসারণ এবং বোঝা নামান ব্যাপারের সঙ্গে অন্য কারো তুলনা হতে পারে না সত্য। তবে একথা সর্বদাই সত্য—যে পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ দর্শন যে যতটুকু লাভ করে, সেই পরিমাণে সকলেরই হৃদয় পাপ এবং সঙ্কীর্ণতার বন্ধন হতে মুক্ত হয়; এবং ঈশ্বর সেবার কার্য সহজ হয়। ঋগ্বেদেও ঋষি পাপের বন্ধন মোচন অথবা বোঝা নামানর জন্য এইরূপে প্রার্থনা করছেন—"অগ্নে নয় সু পথা—ত্বযোধ্যস্মজ্জহুরান মেনো—অগ্নে ত্বম স্মৎ যুযোধ্যমীবাঃ (১-১৮৯—১, ৩)" সরল পথে নিয়ে যাও, কুটিল পাপের বন্ধন হতে আমাদেরকে মুক্ত কর, আমাদেরকে রোগমুক্ত কর। ঋগ্বেদের ঋষি বশিষ্ট ও পূজনীয় পরমেশ্বরের (বরুণের) নিকটে প্রার্থনা করছেন:—"অব দ্রুগ্ধানি পিত্র্যা সৃজা নো অব যাবয়ং চাকৃমা তনূভিঃ। অব রাজন পশুতৃপং

ন তায়ুং স্বূজা বৎসং ন দাম্নো বশিষ্ঠং। (৭-৮৬-৫) হে বিশ্বরাজ বরুণ, পিতৃতঃ প্রাপ্ত দোষসকল হতে আমাদেরকে মুক্ত কর, আমরা নিজের শরীর দ্বারা যে সকল দোষ করেছি, তা হতেও আমাদেরকে মুক্ত কর। হে বিশ্বরাজ পশুকে ঘাসাদি দিয়ে তৃপ্ত করে পশুচোর যেমন রাজদণ্ড হতে মুক্ত হয়, লোকে গোবৎসকে যেমন বন্ধন মুক্ত করে, সেইরূপ এই বশিষ্ঠকে পাপ বন্ধন হতে মুক্ত কর। এই সকল পাঠ করে কে বলবে, যে বেদের সঙ্গে কোরআনের তিলার্দ্ধ পরিমাণও বিরোধ আছে, অথবা হিন্দু ধর্মের সঙ্গে মুসলমান ধর্মের বিরোধ আছে? বস্তুতঃ মূলতঃ হিন্দু ধর্ম এবং মুসলমান ধর্ম এক। একে অন্যের অভাব পূরণকারী, উভয়ে উভয়ের সত্যতার অকাট্য প্রমাণ। বস্তুতঃ যেদিন হিন্দু ও মুসলমান মিলে এক জাতি হবে, যেদিন হিন্দুর ধৈর্য এবং চিন্তাশীলতার সঙ্গে মুসলমানের কর্মঠতা এবং ওজস্বিতার যোগ হবে, সেইদিনই ভারত তার প্রকৃত রূপ নিয়ে বিশ্ব দরবারে হাজির হবে। আবার কোরআন বলছে "ইন্না মা আল উসরে ইয়ুসরান'— নিশ্চয় কষ্টের সঙ্গে সুখ সর্বদা জড়িত।" বেদ কি বলে? নধাতে শ্রান্তস্য সংখ্যায় দেবঃ" (ঋগ্বেদ ৪-৩৩-১১)। ঈশ্বরের দূতগণ বা ফেরেস্তাগণ (দেবাঃ) শ্রান্ত ব্যক্তি ভিন্ন কারো সঙ্গে বন্ধুত্ব করেন না। হায়! কত লোক দেশের অর্থ বৃদ্ধির জন্য অথবা সভ্যদেশ সকলের মত শিল্পবাণিজ্যের বিকাশ দ্বারা দরিদ্র নারায়ণের সেবার জন্য কোন পরিশ্রম না করে, জমিদারি-তালুকদারি-মহাজনি ইত্যাদি করে পায়ের ওপরে পা তুলে কোরআনকে অথবা বেদকে উপেক্ষা করে বিনা পরিশ্রমে শুধু দীনদরিদ্র শ্রমজীবিদের রক্তশোষণ দ্বারা জীবন ধারণ করছে। দীনহীন শ্রমজীবি কি তার পরিবার কি খেয়ে বাঁচবে আমরা একবারও ভাবছি না। "ও-য়ালা তালবেসুল হাক্কা বিল বাতেলে ও-য়া তাকতুমুল হাক্কা ও-য়া আনতুম তা' লামুন" ২-৪২। এই কোরআন বচন উপেক্ষা করে, এই সকল লোক আবার সত্য-মিথ্যা মিশিয়ে, মকদ্দমা করে গরীবের সর্বনাশ করে, এবং নিরর্থক মকদ্দমা জীবিদের উদর পূরণ করে। প্রকৃতপক্ষে সুদখোর অথবা

খাজনাখোর বা মকদ্দমাজীবি না হিন্দু না মুসলমান। তারা না মানে কোরআন না মানে বেদ। কোরআন যেমন বলছে "আহাল্লা হো ল বাইয়া" (২-২৭৪)। ঈশ্বর শিল্পবাণিজ্য ধর্ম সংগত করেছেন। আবার লা-তা'কুলু রেব্বা (৩-১২৯)। সুদখুরী করো না।—ঋগ্বেদও বলছেঃ "মোঘমন্নং বিন্দুতে তাম্রচেতাঃ সত্যং ব্রবীমি বধ ইৎস তস্য। নার্যমনং পুষ্যতি নো সখয়ং কেবলাঘো ভবতি কেবলাদী।" (১০-১১৭-৬)। 'বৃথাই সেই মূর্খ অন্ন লাভ করে' সত্যই বলছি—সেটাই তার মৃত্যুর অস্ত্র, যদি সেই অন্নদ্বারা সে ঈশ্বরের অথবা তার প্রতিবেশীর সেবা না করে। যে একাকী অন্ন গ্রহণ করে, সে কেবলই পাপ সঞ্চয় করে।" হায় বেদ ও কোরআনের এই সকল কথা কে বা শোনে কেইবা বলে! "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী।" আজও কি লোকে সুদখোরী প্রভৃতি দ্বারা দরিদ্রের রক্ত শোষণ পরিত্যাগ করে, সেই অর্থদ্বারা সভ্যদেশ সকলের মত শিল্প-বাণিজ্যের বিকাশ সাধন করে, দেশের অর্থ বৃদ্ধি এবং দরিদ্র অন্নলাভের উপায় করবে না। তা না করলে প্রকৃত সুখের আস্বাদন আমাদের পক্ষে সুদূর পরাহত।

॥ ৭ ॥

সূরা বালাদ সম্বন্ধে আলোচনাঃ হিন্দু ঋষি বলছেন—"মুকং করোতি বাচালং পুংঙ্গু সজ্ঘয়তে গিরিং যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবং, যে রসস্বরূপ পরমানন্দময় পরমেশ্বরের কৃপায় বোবা ও কথা কয়, পঙ্গুও গিরি লংখন করে। আমি তারই বন্দনা করি। কোরআনও পরমেশ্বরের সর্ব শক্তি মত্বেরই সাক্ষ্য দিয়ে বলছেন, যে পরমেশ্বরের কৃপায় পিতৃ পরিত্যক্ত অসহায় ইসমাইল এক মহাজাতির উৎপত্তির বীজ স্বরূপ হয়েছিল। সেই পরমেশ্বরের কৃপায় আবার মক্কা হতে বিতাড়িত পলায়িত অসহায় মোহাম্মদও মক্কা জয় করে, তথায় অবাধে বিরাজ করেছেন। কোরআন বলছে, যে আল্লাহ্ মানুষকে ক্লেশরাশির মধ্যে সৃষ্টি করছেন। ক্লেশ এবং অবস্থার প্রতিকূলতা জয় করাতেই প্রকৃত

মনুষ্যত্ব। একালের বৈজ্ঞানিক বলছেন যে, জীবন সংগ্রামে যোগ্যতমেরই জয় হয়। ঐ কথাই ভিন্ন আকারে কোরআন বলছেন "নিশ্চয় আমি মানুষকে ক্লেশ রাশির মধ্যে সৃষ্টি করেছি" (লাকাদ খালাক নাল ইনসানা ফীকাবাদ)। সেই সকল ক্লেশকে জয় করে মানুষ আপনার শক্তি বৃদ্ধি করবে, এবং প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করবে। কবি বলছেন— "বিপদ কি সুমধুর ফল প্রসব করে" ইত্যাদি। আমাদের ঋগ্বেদে ও ইন্দ্র বা অন্নদাতা পরমেশ্বরকে সম্বোধন করে ঋষি বলছেন ; "শুষ্মিন্তমো হে শুষ্মিভির্বধেরু গ্রেভি রীয়সে। অপুরুষঘ্নো অপ্রতীত শূর" (১৩৩-৬), "হে ইন্দ্র! তোমার বল অতুলনীয়। তুমি শূর, তোমার প্রতিপক্ষ কেউ নেই ; যারা পুরুষত্বহীন তাদেরকে বধকরবার জন্য উগ্র অস্ত্র ধারণ করে, তুমি সর্বত্র বিচরণ কর।" বেদ কোরআন এক বাক্যে বলছে যে আল্লাহ্‌র রাজ্যে অযোগ্য অপুরুষের স্থান হবে না। কোরআন বলছে, সুদখোর ভাবে যে তাদের ওপর ক্ষমতাবান কেউ নেই, তারা টাকা খরচ করে সবই করতে পারে। তারা ভাবে যে, তাদেরকে দেখছে এমন কেউ নেই (৫, ৬, ৭)। ঠিক এই অর্থেই আমাদের উপনিষদ ও বলছে ;

"অবিদ্যায়ামন্তরে বর্তমানাঃ
স্বয়ং ধীরা ঃ পণ্ডিতং মন্যমানা
দন্ত্রম্যমানা ঃ পরিয়ন্তি মূঢ়া অন্ধে
নৈব নীয়মানাঃ যথান্ধশঃ "ন
সাংপরায়ঃ প্রতিভাতি বালং
প্রমাদ্যন্তং বিত্তমোহন মূঢ়ং
অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতিমানী।

পুনঃ পুনর্বশমাপদ্যতে মে"। (পর্ব ১-২-৫, ৬) শ্রীমদ ভাগবত ও বলছে, ধনৈশ্বর্য শ্রুত শ্রীভিরেধ মানমদঃ পুমান নিবার্হত্য ভিধাতুং বৈ ত্বামকিঞ্চন গোচরং" যার কিছু নেই, পরমেশ্বর তারই ; যারা মনে করে যে তাদের ধন আছে ঐশ্বর্য বা শক্তি আছে বিদ্যা আছে, রূপ আছে, তারা পরমেশ্বরকে ডাকবার অযোগ্য।" আবার কোরআন ভাল মন্দ

ছুটি পথের কথা বলছেন—"ও-হাদায়না হোন্নাজ দাইনে" আমি কি মানুষকে ভাল এবং মন্দ—উভয় পথ দেখায় নি?" ভালর পথটি কষ্টকর (আকাবাতা), ঈশ্বরের কৃপার ওপর নির্ভর করে বাধা বিঘ্ন জয় করে, সেই ভালর পথেই চলতে হয়। "ফালাক-তাহামাল আকাবাতা" লোকে সেই কষ্টসাধ্য পথেরই সন্ধান করে। উপনিষদ ও কি ঐ কথাই বলছে না; শ্রেয় এবং প্রেয় নামে ভাল এবং মন্দের ছুটি পথের বর্ণনা উপনিষদ ও দিতেছে। তা এ স্থলে উপস্থিত করছি :—"অন্যচ্ছেয়োহন্য দূতের প্রেয় সেত উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ। তয়োঃ শ্রেয় আদ দানস্য সাধু র্ভবতি হীয়তে অর্থাদ্য ও প্রেয়ো বৃণীতে। শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্য মেত স্তে? সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ শ্রেয়ঃ "(ভাল) এবং প্রেয় (মন্দ) ছুটি ভিন্ন রাস্তা। তারা ভিন্ন ভিন্ন লক্ষ্যে মানুষকে বদ্ধ করে। এই দু এর মধ্যে যে শ্রেয়কে গ্রহণ করে তার মঙ্গল হয়; আর যে প্রেয়কে গ্রহণ করে, সে মানব জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য হতে ভ্রষ্ট হয়। শ্রেয় এবং প্রেয় উভয়ই মানুষের সমক্ষে উপস্থিত হয়। ধীর ব্যক্তি বিশেষ আলোচনা করে এই ছুটিকে পৃথক করবে। কোরআন বলছে "পরমেশ্বর মানুষের ছুটি চক্ষু (আই নাইন) দিয়েছেন। এবং পরমেশ্বরকে উপদেশ দেবার জন্য জিহ্বা (লেসান) ও ছুটি ওষ্ঠ (সাফা তাইন) দিয়েছেন। কোরআন অতি সংক্ষেপে, অতি সহজ ভাষায় সেই কষ্টকর শ্রেয়ের (খয়ের) পথের কি সুন্দর বর্ণনাটি দিয়েছেন? হিন্দু শাস্ত্র অথবা খ্রীষ্টান শাস্ত্র তার সঙ্গে তুলনা হতে পারে, স্বরূপ বর্ণনা অতি দুর্লভ। হায় ধর্মশাস্ত্র নামে পরিচিত আমাদের মনুসংহিতা লোকদেরকে বলছে—"ন স্বামিনা নিসৃষ্টো হপি শূদ্রো দাস্যাধি মুচ্যতে। নিসর্গ নং হিতৎ তস্য কস্তমাৎ তদপোহতি (৮-৪-১৪)। "শূদ্র দাসত্ব মুক্ত হয় না। যেহেতু দাসত্বই তার পক্ষে স্বাভাবিক। কে তা হতে তাকে মুক্ত করতে পারে? কাক কাল, সাবান দিয়ে ধুলেও কাক সাদা হবে না। 'শূদ্রং তু কারয়েদ্দাস্যং ক্রীতম ক্রীতমেব বা, "অতএব খরিদ করা হোক, অথবা খরিদ না করাই হোক, শূদ্রকে দিয়ে দাসত্ব করাবে। —"ফাক্কু রাকাবাতিন" দাসের ঘাড় বন্ধন মুক্ত কর, কারণ দাসকে মুক্তি

দান করাই প্রকৃত শ্রেয়ের পথ। হায়, কোরআন হিন্দুর পক্ষে কি অমূল্য ধন ; হিন্দু আজও বুঝল না ফাক্কু রাকা—বাতিন "(বালাদ) এবং "লা ইয়াত্তা খেজা বা জুনা বাজান আর-বাবান মিন দুনেল্লাহে" (আল-ই-ইমরান) "তোমরা একে অন্যকে প্রভু করো না। পরমেশ্বর আমাদের সকলের একমাত্র প্রভু"। হায় হিন্দুর শতকরা ৯৯ জনই শূদ্র, একজন মাত্র ব্রাহ্মণ। আর এই ৯৯ জন সেই একজনের পদধুলি গ্রহণে, চরণামৃত বান, উচ্ছিষ্ট ভোজনাদি করে আপনাদেরকে স্বাধীনতা মমতা এবং ভ্রাতৃত্ব-মূলক স্বরাজ্যের অনধিকারীই প্রমাণ করেছেন, একদিকে হিন্দুর গীতা শিক্ষা দিচ্ছে, "পণ্ডিতা সমদর্শন।" অপরদিকে কোরআন বলছে, "ইন্নামাল মূমেনুনা এখওয়াতুন "(সুরা হুজরাৎ), "একেশ্বর বিশ্বাসীরা পরস্পর ভাই" এবং স্বরাজের এটিই মূল মন্ত্র। হিন্দুর বর্তমান জাতিভেদ বিষের কোরআনই অব্যর্থ মহৌষধ। আমাদের মমূর্ষ হিন্দু জাতি কি সেই মহৌষধ সেবন করবে না? যতদিন না আমরা হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে কোরআনের এই দাসত্ব মোচনের মন্ত্র গ্রহণ করছি, ততদিন দেশের কল্যাণ সাধন অলীক স্বপ্ন ভিন্ন কিছুই হতে পারে না। এ কথা কারো বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়, কোরআন সমস্ত মানব জাতির জন্য অবতীর্ণ, শুধু নামধারী মুসলমানদের জন্য নয়। কোরআন স্বয়ং বলছেন, "ইয়া-আ ই য়ুহান্নাসো কাদ জা আৎকুম মাও এজাতুন মিন রব্বেকুম ও য়া শেফাউন ল্লে মাফী সুদূর "(সূরা ইয়ুনুস) সে যা হোক, সেই "আল আকা বাতে," সেই কষ্টসাধ্য শ্রেয়ের পথের দ্বিতীয় কথা কি?" দুর্ভিক্ষে পিতৃহীনদেরকে এবং দরিদ্রদেরকে অন্নদান করা। ঋগ্বেদও বলছে, "ন বা উদেবাঃ ক্ষুধমিৎ বধং দপুরু তাশিতমুপ গচ্ছন্তি মৃত্যবঃ। উতো রয়িঃ পৃণতো মোপ দস্যত্যুতাপৃণন মর্ডিতারং ন বিন্দুতে॥ য আধ্যায় চকমানায় পিত্বোন্নবান সন্ রফিতায় উপজন্মুষে। স্থিরং মনঃ কৃনুতে সেবতে পুরোতো চিৎ স মর্ডিতারং ন বিন্দুতে। স ইদ্ভোজো যো গৃহবে দদাত্যন্ন কামায় চরতে কৃপায়। মেঘিমন্নং বিন্দুতে অপ্রচেতাঃ সত্যং ব্রবীধম বধ ইৎ স তস্য। নার্যমনং পুষ্যতি নো সখায়ং কেবলাঘো ভবতি কেবলাদী। (১০-১১৭-১,

২, ৩, ৬) ভগবৎ-শক্তি (দেবাঃ) লোকের যে ক্ষুধা দিয়েছেন, তা শুধু ক্ষুধা নয়, লোকের বধের কারণ। যে প্রচুর আহার করে মৃত্যু তারও নিকট গমন করে। যে ব্যক্তি দানশীল হয়, তার ধনের ক্ষয় হয় না। যে অদাতা হয়, তাকে সুখী করে, এমন কেউ থাকে না। যে স্বয়ং অন্নবান হয়ে, দুর্বল দারিদ্র-পীড়িত অন্ন-ভিক্ষুক তার নিকট উপস্থিত হলে, তার প্রতি মন কঠিন করে, তারই সমক্ষে অন্ন গ্রহণ করে, সেই ব্যক্তিকে সুখী করে, এমন কেউ থাকে না। সেই ব্যক্তিই যথার্থ দাতা, যে গৃহাগত ক্ষুধাক্লিষ্ট অন্নকামী ব্যক্তি যখন অন্ন প্রার্থনা করে, তাকে অন্নদান করে। সেই মূর্খ বৃথাই অন্নলাভ করে, সত্যই বলছি,—সেই অন্নলাভ তার ক্ষতির কারণ হয়, যদি তদ্দারা সে প্রভু পরমেশ্বরের সেবা অথবা তার প্রতিবেশীর সেবা না করে। যে একাকী অন্নগ্রহণ করে, সে কেবল পাপ সঞ্চয় করে। হিন্দুর উপনিষদ যেমন বলছে, 'যথাকারী যথাচারী তথা ভবতি (বৃহ-৪-৪-৫), কোরআনেও আল্লাহ্ বলছেন: ও-য়া-নাবলুয়াকুম বিশশারে ও আল খায়রে ফেৎ নাতান" (সূরা ২১-৩৫)। "আমি ভাল এবং মন্দ দ্বারা তোমাদেরকে পরীক্ষা করি। গীতাও বলছে "ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ। এমন কি মনুও বলছেন: অঘং স কেবলং ভূঙক্তে যঃ পচত্যাত্মকারণাৎ (৩-১১৮)। মহাভারত যুধিষ্ঠীরকে উপদেশ করছে: "দরিদ্রান ভরকৌন্তেয়, মা প্রথচ্ছেশ্বরে ধনং। ব্যাধিত সৌষধং পথাং নিরুজস্য কিমৌষধৈঃ।" "হে যুধিষ্ঠির! দরিদ্রদেরকে আহার দাও, যার ধন আছে, তাকে ধন দিও না। ঔষধ রোগীরই পথ্য, যার রোগ নেই, তাকে ঔষধ দিয়ে কি করবে? কিন্তু হায়, বর্তমানে দেশময় নিত্য দুর্ভিক্ষ। কে কাকে অন্নদান করবে! আমরা গরীবের অন্ন খেতে জানি, কিন্তু গরীবকে অন্ন দিতে জানি না। কোরআনও বলছে: শিল্পবাণিজ্য বৈধ (হালাল), সুদখরী অবৈধ (হারাম)। হিন্দুশাস্ত্র যেমন বলছে, 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী'। কোরআনও বলছে: "রর্বু ইয়ুজজীলাকুমুল ফুলকা ফীল বাহরে লে তাবতাগু

মিনফজলেহি (১৭-৬৬) 'যিনি তোমাদের জন্য সাগরে নৌকা সকল সঞ্চালিত করেন। যেন তোমরা তাঁর প্রসাদে (জীবিকা) অন্বেষণ কর, যিনি তোমাদের প্রতিপালক।' বেদ বলছেঃ কৃষিমিৎ কৃষস্ব্য (ঋ ১০-২৪-১৩) কৃষিকর। "সিরীস্তন্ত্রং তন্বতে" (১০-৭১-৭) তাঁত চালাও। হায়, বেদ ও কোরআনকে উপেক্ষা করে, দেশের লোক আজকাল সুদখুরী করে, অথবা অন্য উপায়ে দরিদ্রের রক্ত শোষণ করেই আপনাদের জীবন কলুষিত করছে। দেশীয় শিল্প বাণিজ্যের বিকাশই দেশের অর্থবৃদ্ধির একমাত্র পথ। সেদিকে লোকের মতি, গতি নেই। আবার এই সূরা বালাদে কোরআন বলছে "তৎপর (সুম্মা) সে তাদের মধ্যে (মিন) হয় (কানা), যারা (ল্লাজিনা) আল্লাহ্ বিশ্বাসী (আমানু)" ইত্যাদি। হিন্দু-মুসলমান সকলে সমান ভাবে এই বাক্যের মর্মও পরিগ্রহ করুন। বিশ্বাস, ধৈর্য ও দয়াকে যেমন এই আয়াতে জীবনের ভিত্তিরূপে নির্ধারিত করা হচ্ছে, সেই সঙ্গে বলা হচ্ছে, যে ঈশ্বর বিশ্বাসী "বিশ্বাসীদের মধ্যে একজন হয়"—অর্থাৎ এই কষ্টকর (আকাবাতে) বা শ্রেয়ের পথে কেউ একাকী চলতে পারে না। 'ও-য়া' তাসেমু বে হাবলে ল্লাহে জমীয়ান ও-য়া লা তাফার্রাকু (আল-ই-ইমরান, ৩-১০২), "সকলে মিলে দৃঢ়ভাবে আল্লাহ্র দড়ি ধারণ কর, এবং পরস্পর পৃথক হয়ো না।" একাকী যাইলে পথে নাহি পরিত্রাণ রে" (ব্রহ্ম সংগীত)। ঋগ্বেদও বলছে "সংগচ্ছধ্বং বদধ্বং সং বো মনাং সি জানতাং" ইত্যাদি (১০-১৯১-১)। "তোমরা সকলে সম্মিলিত ভাবে গমন কর। সম্মিলিত ভাবে কথা বল, সম্মিলিত ভাবে জ্ঞান লাভ কর" ইত্যাদি। অথর্ব বেদও বলছে ঃ—"অন্যোন্যং অভিহর্ষত বৎসং জাতমিবাঘ্ন্যা" (৩-৩০-১) ইত্যাদি। "নবজাত বৎস দেখে গাভী যেমন আনন্দিত হয়, তোমরাও পরস্পরকে দেখে সেইরূপ আনন্দিত হও।" "সংহতিঃ কর্মসাধকাঃ।" আবার এই সূরা বালাদ আমাদেরকে উপদেশ করছে যে আল্লাহ্ বিশ্বাসীগণ পরস্পরকে ধৈর্য ধারণ করতে এবং দয়াবান হতে শিক্ষা দেবেন। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলেই এই উপদেশ পালন

করলে, কিরূপ সুফল লাভ হতে পারে, তা আমরা বিলাতবাসীর জীবনে বিলাতের ধর্ম মন্দির সকলের সাধুকার্যের ফলের মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছি। বস্তুতঃ বিলাতের বর্তমান সর্বোতোমুখী শক্তির মূলে বিলাতবাসীর ধর্ম মন্দির। তথায় প্রতি রবিবারে সমবিশ্বাসীরা মিলে মুসার দশ আজ্ঞা, তৌরাত, সোলেইমানের উপদেশ, দাউদের গীত (জব্বুর), ঈসার পার্বত্য উপদেশ বা শিষ্যদের পাদধারণের বর্ণনা ইত্যাদি উপদেশ (ইঞ্জিল) তাদের নিজ ভাষায় তাদের কানে নিত্য ধ্বনিত হচ্ছে, অন্ততঃ তাদের শতকরা ২।৫ জনের মনে তা দৃঢ়ভাবে মুদ্রিত হয়ই হয়। অন্ততঃ দুপাঁচজন সেই সকল উপদেশ কিঞ্চিৎ পরিমাণে হলেও কার্যতঃ পালন করতে যত্ন করে। এর ফলে স্বাধীনতা-সমতা-ভ্রাতৃত্বের মালমশলা দ্বারা বিলাতবাসীর জাতীয় চরিত্র গঠিত হয় এবং সেই কারণে তারা স্বরাজের যোগ্যতা লাভ করে। মাতৃস্তন্য পানের সঙ্গে সঙ্গে তারা অন্ততঃ স্বদেশসেবা এবং ব্যবসা বাণিজ্যের উপযোগী ধর্মনীতি লাভ করে। কে না লক্ষ্য করছে যে, হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে আমাদের মধ্যে দেশের প্রতি কর্তব্যবোধের অভাব। ব্যবসা বাণিজ্যের উপযোগী নীতির অভাব। হায়, কবে আমরা হিন্দু মুসলমান মিলে সেই কষ্টকর (আকাবাতে) শ্রেয়ের পথের আলোচনা করব। হায়, কবে আমরা হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে, সেই কষ্টকর (আকাবাতে) শ্রেয়ের পথে গমনের যোগ্য হব। কবে হিন্দু-অহিন্দু, মুসলমান-অমুসলমান, সকল একেশ্বর বিশ্বাসী মিলে, গ্রামে গ্রামে ঈশ্বর বিশ্বাস ও সচ্চরিত্রতার প্রতিষ্ঠা এবং বিস্তারের জন্য, বড় ছোট সকলে, ভ্রাতৃভাবে সমভাবে এবং নির্মুক্তভাবে মিলে সপ্তাহে অন্ততঃ একদিন পরমেশ্বরের পূজা বা এবাদত করব, এবং কোরআন বেদ ইঞ্জিলও সদাসৎ গ্রন্থপাঠও আলোচনা করব। বেদ যেমন বলছে যে "মনুষো নহুযো বি জাতাঃ" সকল জাতীয় মানুষ এক নহুষের সন্তান, কোরআনও সাক্ষ্য দিচ্ছে "কানা ন্নাসো উম্মাতান ও-আহেদাতান্" (২।২১৩)। "সমস্ত মানুষ একজাতি এবং 'লা একরাহা ফীদদীনে"

(২।২৫৬)" ধর্ম সম্বন্ধে বলপ্রয়োগের কোন স্থান নেই। হিন্দু-মুসলমান ভুলবে না, মানুষ মাত্রেরই জন্য ঈশ্বর এক,—সত্য এক, মঙ্গল এক, মানব প্রকৃতি এক, অতএব প্রকৃত ধর্মও এক। কোরআন বলছে: লাউকানা ফীহিমা আলেহাতুন এল্লাল্লাহো লা ফাসাদাতা" (২১।২২)—"আল্লাহ্ ব্যতীত যদি পৃথিবীতে অন্য ঈশ্বর থাকত, তবে ভীষণ গোলযোগ হত। বেদান্ত সূত্রের ভাষ্য লিখতে গিয়ে, শংকরাচার্য যেন এই কোরআন বচনেরই ব্যাখ্যা করে বলছেন: "সমনস্ক ত্বাদেব চৈষা মনিক মত্যে কস্যচিৎ স্থিত্যভি প্রায়ঃ কস্যচিৎ সংহারাভি প্রায় ইত্যেবং বিরোধোপি কদাচিৎ স্যাৎ। অর্থ কস্যচিৎ সঙ্কল্প মম্বন্যস্য সংকল্প ইত্য বিরোধঃ সমর্থেত। ততঃ পরমেশ্বরাকুত, তন্ত্রমেবেত তবেষ্যাং ইতি ব্যবতিষ্টতে" (ব্রহ্ম সূত্র ৪।৪।১৭)। সেই সকল বহু ঈশ্বরের প্রত্যেকের যখন স্ব স্ব মন আছে, তখন সময়ে সময়ে তাদের মধ্যে মতভেদ হবে। তখন কেউ ইচ্ছা করবে স্থিতি, কেউ ইচ্ছা করবে সংহার, অতএব কোন একজন ঈশ্বরের সঙ্কল্পের অধীন অন্যদের সঙ্কল্প হবে। এই বললেই বিরোধ পরিহার করা যায়। অতএব অন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা পরমেশ্বরের ইচ্ছার অধীন দাঁড়াচ্ছে। "জগত ব্যাপারস্তু নিত্য সিদ্ধসৈৎ-বেশ্বরস্য" জগতের কার্য এক অদ্বিতীয় নিত্য সিদ্ধ পরমেশ্বরের"। শংকরাচার্য মোহম্মদের শতাধিক বছর পূর্ববর্তী। যিনি বেদান্ত হতে এত আগুন বার করছেন, তিনি যদি এই কোরআন-এই পঞ্চম বেদ পেতেন, নিশ্চয় তা হতে তিনি দিব্য অগ্নি বার করতেন, যার জ্যোতিতে এই ভারতবর্ষ রূপান্তরিত হত! কিন্তু ভারত, আজ 'তুমি যে তিমিরে, তুমি সে তিমিরে"। উল্লিখিত কথা সকল পর্যালোচনা করে আমরা হিন্দু-মুসলমান সকলে কি কোরআনের অপর একটি অমূল্য উপদেশ স্ব স্ব হৃদয়ে লিখে রাখব না-"কুলু আমান্না বিল্লাহে ও-য়া-মা উনজেলা এলায়না, ও-য়ামা উনজেলা এলা এব্রাহিম ***ও য়াল আসবাতে ও-আমাউতিয়া মূসা ও-য়াঈমা ও-আমাউতিয়া ন্নাবিয়্যুনা মিনারা বেবেহিম লানুফার্রেকু বাইনা আহাদিন মিন হুম্ ও-য়া নাহনু লাহু মুসলেমুন" "তোমরা বল, আমরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করি, এবং যা আমাদের

নিকট প্রকাশিত হয়েছে ও যা ইব্রাহীমের নিকট এবং নানা জাতীয় লোকের নিকট প্রকাশিত হয়েছে, এবং যা মুসাকে ও ঈসাকে প্রদত্ত হয়েছে, এবং যা ঋষিগণ তাদের প্রভুর নিকট প্রাপ্ত হয়েছেন, সেই সমুদয় বিশ্বাস করি। তাদের কারো মধ্যে কোন প্রকার প্রভেদ করি না, এবং আমরা এক মাত্র ঈশ্বরেরই অনুগত" (বকর ১৩৬)। হায়, কবে আমরা হিন্দু-মুসলমান খ্রীষ্টান কোরআনের এই অমূল্য উপদেশ স্বর্ণাক্ষরে স্ব স্ব হৃদয়ে লিখে রাখব, এবং প্রাণপণে পালন করতে যত্ন করব। হিন্দু মনে রাখবেন যে, আমাদের ঋগ্বেদেও আমরা এই উপদেশেরই প্রতিধ্বনী পাচ্ছি : ইদং নম ঋষিভ্য পূর্ব জেভ্যঃ পূর্বেভ্যঃ পৃথি কৃদ্ভ্যা" (১০।১৪।১৫)। আমাদের পূর্ববর্তী এবং সৃষ্টির আদিতে জাত (পূর্বজেভ্যঃ) ধর্ম পথের আবিষ্কার কারী ঋষিদের প্রতি এই নমস্কার হিন্দু মুসলমান পৃথিবীর অন্যান্য উন্নতিশীল জাতি সকলের সমকক্ষ হতে আশা করতে পারি। "নান্য পন্থা বিদ্যাতেহ নায়।

॥ ৮ ॥

ঋগ্বেদ : (বেদের সূক্ত। ১ম মণ্ডল। সূক্ত ১৪৫ দীর্ঘতমা ঋষি অগ্নিদেবতা।

এখন জিজ্ঞাস্য বেদের দেবতা কি, এবং বেদের অগ্নিই বা কি ! "যার বাক্য তিনি ঋষি, সেই বাক্য দ্বারা যে বস্তু বর্ণিত হয়, সেটাই দেবতা।" এখন বৈদিক অগ্নি কি ? বৈদিক অগ্নি কি, বুঝতে হলে, যাস্ক তার নিরুক্তে যা বলেছেন, পাঠককে তার মর্ম সর্বাগ্রে গ্রহণ করতে হবে। তা এই 'এক আত্মা বহুধা স্তয়তে, একম্যাত্মনো অন্যে দেবতাঃ প্রত্যঙ্গানি, "(বেদ) "এক আত্মা বা পরমাত্মা বহুরূপে স্তুত হচ্ছে। অপর সকল দেবতা এক পরমাত্মার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্বরূপ।" সেই পরমাত্মারই এক নাম অগ্নি। নিরুক্তকার বলেন, যে এক অর্থে অগ্নি শব্দে 'অগ্রণী' শব্দেরই রূপান্তর, "অগ্রাত্ম্য পদাৎ নয়তেঃ"। আবার "অজ্ঞন মডি ব্যক্তং বস্থু প্রকাশ স্বাত্ম কত্বেন বা নয়তীত্যাগ্নিঃ। ভৌতিক অগ্নি আলোক দ্বারা প্রকাশ করে, বাহ্য বস্তু ব্যক্ত করে, এজন্য ভৌতিক

অগ্নির নাম 'অগ্নি'। আবার আত্ম চৈতন্য রূপে নকল বস্তু প্রকাশ করে, এজন্য পরমাত্মারও নাম অগ্নি। 'বয়া ইদগ্নে অগ্নেবস্তে অন্যেত্বে বিশ্বে অমৃতা মাদায়ন্তে। বৈশ্বানব নাভির সিক্ষিতী স্থূলের জনা উপমিত্থয়ন (১।৫৯।১)।হে পরমাত্মন (অগ্নে) অপর যা কিছু উন্নতির পথে নিয়ে যায় (অগ্নয়ঃ)। সে সকল তোমার শাখা স্বরূপ। অমরণ ধর্ম দেবগণ (বা ফেরেস্তা) সকলে তোমাতেই আনন্দিত। হে লোক হিতকারী, (বিশ্বানব), তুমি মানব মণ্ডলীর (ক্ষিতীনাং) স্থিতির কারণ (নাভিঃ) তুমি স্তম্ভের ন্যায় হয়ে (স্থূলেব) নিকটে থেকে ভুবন সকল ধারণ করছ"। এই 'অগ্নি পরমাত্মা পরমেশ্বর বা আল্লাহ্ ভিন্ন কে হতে পারে ? কোরআনও সূরা রাদে বলছেন, আল্লাহো ল্লাজী রাফাআস সামাওয়াতে বে গাইরে আমাদিন'। (১৩।২) "তিনিই আল্লাহ্ যিনি বিনা স্তম্ভে ভূবন সকলকে স্থির করে রেখেছেন। বেদ বলছে, অগ্নি বিনা স্তম্ভে ভুবন সকলকে ধারণ করছেন, কোরআন বলছে, আল্লাহ্ ধারণ করছেন। যিনি বিনা স্তম্ভে ভুবন সকল ধারণ করছেন, তিনি অগ্নি, তিনিই আল্লাহ্ যিনি আল্লাহ্ তিনি অগ্নি। আবার ঋষি বিশ্বামিত্র বলছেন—শ্রীশ্রীশতা ত্রীসহস্রণ্যগ্নিং ত্রিংশচ্চ দেবা নব চাস পর্যান (৩-৯-৯) তিন হাজার তিনশ উনচল্লিশ অর্থাৎ অসংখ্য দেবগণ (ফেরেস্তাগণ) জ্যোতির্ময় পরমেশ্বরের (অগ্নিং) পূজা করেন। একালে যে হিন্দু ত্রেত্রিশ কোটী দেবতাতে বিশ্বাস করেন, এই ঋক মন্ত্রই সেই বিশ্বাসের একমাত্র বৈদিক মূল। এই মন্ত্রেই আমরা দেখছি যে সেই তেত্রিশ কোটী দেবতাগণ জিব্রিল এস্রাফিলাদি ফেরাস্তার ন্যায়, এক পরম অগ্নি পরমেশ্বরের উপাসক। কোরআন যেমন বলছে, যে যারা এক আল্লাহ ভিন্ন অন্য দেবতার পূজা করে, তারা পশুর তুল্য,—"ইনহুম এল্লাকাল আন আমে, ২৫।৪৪। সেইরূপ উপনিষদও বলছে, যে যারা এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বর বা অগ্নিকে ছেড়ে ভিন্ন ভিন্ন ত্রেত্রিশ কোটী দেবতার পূজা করে, তারা সেই সকল ভিন্ন ভিন্ন দেবতাদের গরু ভেড়া আদি পশু তুল্য ; যথা পশুরে বং স দেবানাং" (বৃহদারন্যক (১-৪-১০) আবার বেদের প্রকৃত মর্ম গ্রহণ করতে হলে আমাদেরকে বৈদিক ভাষার

বিকাশের ইতিহাসকে চক্ষুর সম্মুখে রাখতে হবে। শব্দ সকল ধাতু, মূলক। ধাতু মাত্রই আদিতে ভৌতিক বা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বাচী এবং বহু অর্থ বাচী। বেদের সময় শব্দের উৎপত্তি না হোক বিশেষ বিকাশের সময়। তখন অগ্নি বায়ু প্রভৃতি অনেক শব্দ কোন অর্থ বিশেষে রূঢ় প্রাপ্ত হয় নি, এমন কি আত্মা শব্দেও বেদে নিঃশ্বাস বায়ুর প্রতি প্রযুক্ত হত—কারণ আত্মা শব্দের ধাতুগত অর্থ সতত গমনশীল। অগ্নি শব্দের ধাতুগত অর্থ আমরা পূর্বেই বলেছি, প্রকাশকারী অথবা অগ্রনয়নশীল। উপমিতি বলেই আত্মাশব্দ যেমন আদিতে পরমাত্মাতে প্রযুক্ত হয়েছিল সেইরূপ অগ্নিশব্দও উপমিতি বলে পরমাত্মা বা পরমেশ্বরে প্রযুক্ত হয়েছিল। তাই পণ্ডিত দয়ানন্দ স্বরস্বতী তাঁর ঋগ্বেদ ভাষ্যে বলছেন 'অত্র শ্লেষালঙ্কা রেণেশ্বর ভৌতি কাবেথৌ গৃহ্যেতে। (১।৩৭) উচ্চারিত শব্দের ন্যায় লিখিত শব্দ ভিন্ন ও মানুষের চলে না। কারণ দূরবর্তী দেবকে কোন কথা বোঝাতে হলে, লিখিত শব্দের ব্যবহার ভিন্ন উপায়ন্তর নেই। সভ্যতার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মুদ্রাংকনও আমাদের পক্ষে অপরিহার্য হয়েছে। আমরা অবতারণাতে বলেছি যে, ঋগ্বেদের সময়ে অথবা শ্রুতি রচনা কালে মুদ্রাংকন ত দূরের কথা, লেখবার অক্ষরও আবিষ্কৃত হয় নি। বেদের মন্ত্র সকল মুখে মুখে রচিত এবং প্রচারিত হয়েছিল। "মিমীহি শ্লোক মাস্যে"—১।৩৮।১৪)। সেই সুদূর অতীতকালে ঋষিগণ বাধ্য হয়েই ভৌতিক অগ্নি, কি নৈশ আকাশ (বরুণ), এক দিনের আকাশ (মিত্র), সূর্য (অর্যমা) প্রভৃতিকেই পরমেশ্বরের সংকেত রূপে (দৈব্যঃ কেতুঃ শৃণ্যোতুনঃ ১।২৭।১২) ব্যবহার করতেন। বেদমাতা ১।১৯ হতে ২৭ পৃঃ এবং ঋগ্বেদ ১।১৪৭ হতে ১৫৭, ১৬৪ হতে ১৮৭ পৃঃ। শুধু তাই নয়, অক্ষর এবং লিপি প্রচলনের পূর্বে মিশরবাসীগণ যেমন নানা প্রকার ছবি অংকন করে মনের ভাব প্রকাশ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। বৈদিক ঋষিগণ ও অধ্যাস বা এক বস্তুতে অন্য বস্তু আরোপের পন্থা "অতস্মি স্তদ্বুদ্ধিঃ" আরোপের পথ অবলম্বন করে জড় বা বাহ্য যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান দ্বারা অথবা দ্রব্য গত প্রতীক এবং অভিনয় সঙ্গীত দ্বারা, পরমেশ্বরের পূজা বা উপাসনা করতেন। ঋগ্বেদ,

১ম ভাগ রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, নানা প্রকার বাহ্যানুষ্ঠানের ভিতর দিয়ে মানুষ আধ্যাত্মিক খাদ্য এমন আকার লাভ করে, যা সে সহজে পরিপাক করতে পারে। একেই আমরা বৈদিক কিণ্ডার গাটেন নামে অভিহিত করেছি। ভৌতিক অগ্নির সাংকেতিক অর্থ সম্বন্ধে এটা বলাই যথেষ্ট। ইঞ্জিলের পাঠককে আমরা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে, মুসা পরমেশ্বরকে অগ্নিরূপে দর্শন করেছিলেন। একথাও স্মরণ রাখতে হবে যে, কোরআনে সূরা তাহা এবং 'নামলে' দেখা যায় যে মুসা পরমেশ্বরকে অগ্নিরূপেই দর্শন করেছিলেন। 'রা-আ নারান' এবং সেই অগ্নি বলেছিল ইন্নি আনা রাব্ব্‌কা ইখলানালাইক (২০-২২)। *** নিশ্চয় আমি তোমার প্রভু, অতএব পাদুকা খুলে ফেল, ইত্যাদি। আবার আন বুরেকা মান ফীন্নারে (২৭—৮), 'সে ধন্য যে অগ্নির অনুসন্ধানে গমন করে, "পরমেশ্বর বিশ্বাসীদের বন্ধু, তিনি তাদের কে অন্ধকার হতে জ্যোতিতে নিয়ে যান"। আল্লাহো ও য়ালী উল্লাজিনা আমানু ইয়ুখ রেজু হুম মিনা জ্জুলুমাতে এলান্নূরে" (২—২৫৭)। উপনিষদও বলছে যে, পরমেশ্বর 'জ্যেতিষাং জ্যোতি যতদাত্মবিদো বিদুঃ", এবং ঋষি প্রার্থনা করছেনঃ—"তমসো মা জ্যেতির্গময়" কলেমা তমজিদে বলা হচ্ছেঃ লা এলাহা এল্লা আন্তা নূরাই ইয়াদেল্লাহো লে নূরেহি মাই ইয়াশাও তুমি ভিন্ন উপাস্য নেই। তুমি জ্যেতির্ময় পরমেশ্বর। তুমি যাকে ইচ্ছাকর তোমর জ্যোতি দেখাও।" কোরআন ও স্বয়ং বলছে 'আল্লাহো নূরোস সামাও য়াতে" ইত্যাদি (২৪—৩৫) "পরমেশ্বর দ্যুলোক ও ভূলোকের জ্যোতি ইত্যাদি। কোরআন বলছে যে, পরমেশ্বর 'নূরুন্ আলা নুরিন" "অগ্নির উপরিস্থ অগ্নি, উপনিষদ যাকে বলছে 'জ্যোতিসাংজ্যোতি' বাইবেল ও বলছে 'পরমেশ্বর জ্যোতিঃস্বরূপ তাতে কোন অন্ধকার নেই'। সেই পরমেশ্বরই বেদেরও প্রকৃত অগ্নি, ব্রহ্মাগ্নি। দৃশ্য অগ্নি তাঁর সংকেত মাত্র। যে মোক্ষমূলারাদি এক দিকে যেমন বৈদিক ঋষিদের জ্ঞানের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন, আর এক দিকে আবার তাঁরা (না বুঝে) ঋষিদেরকে জড় অগ্ন্যাদির উপাসক মনে করে, তাদেরকে বালক হতেও মূর্খ কল্পনা করেছেন, কেননা

ঋষিগণ অগ্নির নিকটে যে সকল প্রার্থনা করেছেন, নিতান্ত বালক ও জড়ের নিকটে তা করতে পারেনা। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অনেক সময়ে আত্মাভিমানেই অন্ধ। কোরআনের প্রতি যে কারণে তাঁরা সুবিচার করতে পারেননি, সেই কারণেই তারা বেদের প্রতি ও সুবিচার করতে পারেননি। বস্তুতঃ ঋগ্বেদের ধর্মের মধ্যে কোনরূপ বালকত্ব ও ছিল না, অথবা এ কালের সাধারণ ধর্মাভিমানীদের কপটতাও ছিল না। বেদের অগ্নি দেবগণ এবং মনুষ্যগণ উভয়েরই শাসন কর্তা। তিনি পরমেশ্বর বা আল্লাহ ভিন্ন কে হতে পারেন? অস্য শাসুরু ভয়াসঃ সচন্তে হবিষ্মন্ত উশিজো যে চমর্তাঃ। দিবশ্চিৎ পূর্বো ন্যধাদি হোতা পৃচ্ছ্যো বিশপতি বিক্ষুধোঃ। (১-৬০-২)। হবিভোজি দেবগণ (বা ফেরেস্তাগণ) এবং মনুষ্যগণ উভয়ে এই শাসন কর্তা অগ্নির সেবা করে। তিনি দ্যুলোকের পূর্ব হতেই বর্তমান। তিনি সকলের অস্তিত্বে আহ্বান কর্তা (হোতা), তিনিই সকলের জিজ্ঞাস্য। তিনি সকলের প্রতিপালক (বিশপতিঃ—রব্বুল আলামিন)। তিনি মানবমণ্ডলীর মধ্যে (বিক্ষু) বিধাতারূপে প্রকাশিত।" তিনি একদিকে যেমন "বৈশ্বনির" বা সকল মানুষের হিতকারী, জগতের নাভি বা বন্ধনরজ্জুস্বরূপ, এবং স্তম্ভের মত হয়ে নিকটে থেকে ভুবন সকল ধারণ করছেন, বৈশ্বানর নাভিরসি ক্ষিতীনাং· ·ইত্যাদি (১-৫৯-২) অপরদিকে তিনি জাতবেদা বা যা কিছু জন্ম গ্রহণ করে সকলই জানেন এবং মহাব্রত বা মহৎ কর্মকারী জাতবোদো মহিব্রত শ্রুধী হবম "(১-৪৫-৩) আবার অগ্নি পিতার ন্যায় হয়ে সকল লোককে সৎকর্মে আদেশ করেন, "পিতুন পুত্রাঃ ক্রতুং জুষন্ত শ্রোষণ্যে অস্য শাসং তুরাসঃ (১-৬৮-৫) "পুত্র যেমন পিতার আদেশ পালন করে, সেইরূপ যে ব্যক্তি সত্বর হয়ে অগ্নির আদেশ শ্রবণ করে এবং পালন করে, তার সেই সৎকর্মের শুভফল সে সম্ভোগ করে। এ অগ্নি পরমেশ্বর ভিন্ন কে হতে পারে? বেদের অগ্নি "সুপথ্যের নেতা—তত্ত্বজ্ঞানীর উপদেশের ন্যায় তার উপদেশঃ—সুপ্রণীতি শ্চিকিতুষো ন শাসুঃ"। (১-৭৩-১) বেদের অগ্নি পরম সত্য বা বস্তু তন্ত্র সত্য, কল্পনার অতীত। তিনি আত্মা এবং আত্মার ন্যায় সুখদায়ক।

তিনি সকলের ধ্যানের বিষয় হয়ে আছেন। অমতির্ন সত্য আত্মেব শেবো দিধিষায়্যোভূৎ। ১-৭৩-২। বেদের ঋষি সেই পরম অগ্নি পরমেশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করছেনঃ—"হে অগ্নে, তুমি যাদেরকে কল্যাণের পথে চালনা কর, আমরা যেন তাদের মধ্যে হই। আমরাও যেন সৌভাগ্যশালী হই"। "তুমি আকাশ পৃথিবী এবং অন্তরীক্ষ পূর্ণ করে আছ। তোমার ছায়ার ন্যায়, তুমি বিশ্বভুবন রক্ষা. করছ" (১-৭৩।৮) "যা গ্রায়ে মর্তান্ সুসূদো অগ্নেতে শ্যাম মঘবানো বয়ং চ। ছায়েব বিশ্বং ভুবনং সিসক্ষ্যাপপ্রিবাগ্রেদসী অন্তরিক্ষম। এই অগ্নি পরমেশ্বর বা আল্লাহ্ ভিন্ন কে হতে পারে? ঋগ্বেদে কখনও বলা হচ্ছে, অগ্নি মাতার মত। প্রত্যেক মানুষকে রক্ষ করেন—"মাতেব যন্তরসে পপ্রখানো জনং জনং ধায়সে চক্ষসে চ" ৫।১৫।৪"। 'সর্বত্র প্রকাশিত হয়ে তুমি প্রত্যেক মানুষকে জননীর ন্যায় রক্ষা কর। তারা তোমার রক্ষা এবং দর্শন করে"। কখনও বলা হচ্ছে, অগ্নি পিতার মত। সনঃ পিতেব সুনবেগ্নে সুপায় নো ভব সচস্ব পিতার ন্যায় তুমি আমাদের পক্ষে সহজলভ্য হও। তুমি সর্বদা আমাদের সঙ্গে থাক, যেন আমাদের মঙ্গল হয়। উল্লিখিত কথা সকল পর্যালোচনা করে, কেনা বলবে যে বেদের অগ্নি পরমেশ্বর ভিন্ন, কোরআনের আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কেউ হতে পারে না? সেই পরমেশ্বরেরই সংকেতরূপে. লিপি প্রচলনের পূর্বে যজ্ঞাদি সাংকেতিক পূজাতে (কিণ্ডার গার্টেন) লিখিত নাম আদির স্থলে পরমেশ্বরের সংকেত রূপে ভৌতিক অগ্নি ব্যবহৃত হত। এর ফলে বৈদিক কালে অধ্যাস দ্বারা ঐশ্বরিক অগ্নি বা ব্রহ্মাগ্নির গুণভৌতিক অগ্নিতে আরোপিত হয়েছিল। এর ফলে অধুনাতন পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বেদের প্রতি ভৌতিক অগ্ন্যাদি পূজার দোষারোপ করেছেন। এবং বয়ঃ প্রাপ্তের বাল্য খেলার ন্যায় একালের প্রচলিত যজ্ঞাদি দৃষ্টে সে দোষারোপকে অমূলক বলা যায় না। আবার এ কথাও সত্য, যে বঙ্গদেশে একালে যেমন মানুষের নাম থাকে 'পরমেশ্বর' 'জগন্নাথ' ইত্যাদি, বৈদিক সময়ে ও মানুষের নাম থাকত 'অগ্নি, 'ইন্দ্র' ইত্যাদি, এই কারণেই নানা প্রকার উপকথার সৃষ্টি হয়েছে, এবং এই নামের

ভ্রমই পরবর্তীকালে প্রচলিত নরপূজা অথবা অবতার পূজার কারণ হয়েছে।

। ৯। সূক্ত—১-১১৫

দীর্ঘতমা ঋষিঃ অগ্নিদেবতাঃ ১। তং পৃচ্ছত সজগামা স বেদ স চিকি ত্বাঁ ঈয়তে সা ন্বীয়তে। তস্মিন সন্তি প্রশিষস্তস্মিন্নিষ্টয়ঃ স বাজস্য শবসঃ শুস্মিনস্পতিঃ। হে লোক সকল, তোমাদের যা জিজ্ঞাস্য সেই জ্যোতির্ময় পরমেশ্বরকে জিজ্ঞাসা কর। তিনি সর্বত্র গমনাগমন করেন। তাই তিনি সব জানেন (বেদ) তিনি বিশেষ ভাবে জানেন (চিকিত্বাণ) তিনিই তোমার জ্ঞাতব্যের নিকট গমন করেন (ঈয়তে), তিনি তৎক্ষণাৎ (নু) গমন করেন (ঈয়তে)। সকল ধর্মোপদেশ (প্রশিষঃ) তাঁর মধ্যে আছে। (সন্তি)। সকল ভোগ্য বস্তু (ইষ্টয়ঃ) তাঁরই মধ্যে। তিনি অন্নের (রাজস্য)। তিনি বলের (শবসঃ) এবং বলবানের (শুস্মিণঃ) প্রতি পালক (পতিঃ)।

২। তমিৎ পৃচ্ছান্তি ন সিমো পৃচ্ছাতি স্বেনেব ধীরো মনসা যদ গ্রভীৎ। ন মৃষ্যতে প্রথমং নাপরং বচোহস্য ক্রত্বা সচতে অপ্রদৃপিতঃ। যারা তাঁকে (অগ্নিকে বা জ্যোতিঃ স্বরূপ পরমেশ্বরকে) জিজ্ঞাসা করে (পৃচ্ছন্তি) তারা চতুর্দিকস্থ লোক সকলকে (সিমঃ) আর সে সম্বন্ধে নানা প্রকার প্রশ্ন করেনা (ন বিপৃচ্ছতি)। যখন সেই ধীর ব্যক্তি নিজের মনদ্বারা নিজের কর্তব্য স্থির করেছেন, তখন আর সে কারোপরামর্শ (বচঃ) গ্রহণ করে না (ন মৃষ্যতে), সকলের প্রধান ব্যক্তিরও না, অন্যেরও না (প্রাধংনমপরং)। নিরহঙ্কার হয়ে (অপ্রদৃপিতঃ) সেই জ্যোতি স্বরূপ পরমেশ্বরের বলকেই আশ্রয় করে (অস্য ক্রত্বা সচতে)।

৩। তমিৎ গচ্ছন্তি জুহস্তমর্বতী র্বিশ্বান্যেকঃ শৃণবদ্বাচাংসি মে। পুরুপ্রেষ স্তুতুরি র্যজ্ঞসাধনোচ্ছি দ্রোতিঃ শিশুরাদত্ত সংরভ ঃ॥ আহুতির ঘৃতাদি (জুহ্বঃ) তাঁর নিকটেই যায় (বৈদিক কিণ্ডার গার্টেন), স্তুতি সকলও (অবতী) তাঁর নিকটেই যায়। তিনি একাকী আমার সকল কথা শ্রবণ করেন। তিনি সকলের প্রভু, অসংখ্য তাঁর দাস (পুরু প্রৈষঃ)।

তিনি সকলের ত্রাণকর্তা (ততুরিঃ)। তাঁর কৃপাতেই পূজা সিদ্ধ হয় (যজ্ঞসাধনঃ) তাঁর প্রদত্ত রক্ষার বিরাম নেই (আচ্চদ্রোতিঃ)। তিনি স্তুতির পাত্র (শিশুঃ শংসুস্তুতৌ, পানিনি)। তিনি সকল লোকের সেবা গ্রহণ করেন (আ-অদত্ত সংরভঃ) শুষ্ক কাষ্ঠ নিহিত নিরাকার শক্তিরূপী অগ্নি হতে বলের সঙ্গে সংঘর্ষণ দ্বারা সাকার শিখাযুক্ত অগ্নির উৎপত্তিই নিরাকার জ্ঞান প্রেম-শক্তিরূপী পরমেশ্বর হতে সাকার চরাচর জগতের উৎপত্তির প্রকৃষ্ট উপমা। তাই লিপি প্রচলনের পূর্বে মন্থন দ্বারা অগ্নি উৎপন্ন করে তাতে ঘৃতাদি আহুতি দিয়ে বৈদিক ঋষিগণ কিণ্ডার গার্টেন প্রণালীতে পরমেশ্বরের পূজা করতেন। এইরূপে অধ্যাস বলে বাহ্য অগ্নি দৃষ্টে ঈশ্বর—জ্যোতি স্মরণ করে ঋষি বলছেনঃ—উপস্থায়ং চরতি" ইত্যাদি।

৪। উপস্থায়ং চরতি যৎ সমারত সদ্যো জাতস্তৎসার যু্জ্যেভিঃ। অভি শ্বান্তং মৃশতে নান্দ্যে মুদে যদীং গচ্ছন্ত্যশতীরপিষ্ঠিতং যখন (যৎ) অগ্নি উৎপাদনের অনুকুল কার্য করা হয়। (উপস্থায়ং চরতি) এবং মন্থন দ্বারা অগ্নি প্রকাশিত হয় (সমারত); তখন জাত মাত্রই (সদ্যঃ) অগ্নি তার উপযুক্ত তেজ (যুজ্যেভিঃ) প্রকাশ করে সকল বস্তুর দিকে গমন করে (তৎসার)। এইরূপে প্রবুদ্ধ হয়ে উৎসব কালে (নান্দেৎ) পরিক্রান্ত (স্বন্তিং) উপাসকের আনন্দ বর্ধন করে (মুদে অভি মৃশতে), যখন সে সেই সর্বত্র স্থিত (অপষ্ঠিতং) ঈশ্বর-জ্যোতির (তৎ) নিকটে আগ্রহের সঙ্গে (উশতী :) উপস্থিত হয় (গচ্ছতি)।

স ঈং মৃগো অপ্যো বনর্গুরু পত্বচ্যপমস্যাং
নিধায়ি। বব্রবাহ্বযুনা মর্ত্যোভোহগ্নির্বিদ্বখন

—তচিদ্ধি সত্যঃ। সেই অগ্নি বা ঈশ্বর জোতিই (স ঈং) অনুসন্ধান করতে হয়। তাঁকেই পেতে হয় (অপঃ)। তাঁর মহিমা কীর্তন দ্বারা তাঁর নিকট যাওয়া যায় (বনর্গু :)। ঔষধি প্রভৃতি দ্বারা আচ্ছাদিত পৃথিবীর উপমা স্বরূপ যজ্ঞবেদির ওপরে (উপমস্যাংত্বচি), পরমেশ্বরের চিহ্নরূপে দৃশ্য অগ্নি স্থাপিত হয় (উপনি ধায়ি)। জ্যোতি

স্বরূপ পরমেশ্বর সর্বজ্ঞ (অগ্নি বিদ্বান)। তিনি মানুষকে তাদের বিশেষ বিশেষ কর্তব্য বলেদেন [বি-অব্রবীৎ বয়ুনা মর্তেভ্যঃ) তিনি সত্য গ্রহণ করেন। (ঋতচিৎ), যেহেতু তিনি সত্যস্বরূপ (হিসত্যঃ)।

। ১০। সূক্ত—১-১৮৯

অগস্ত্য—ঋষি

অগ্নি—দেবতা

১। অগ্নে নয় সুপথা রায়ে আস্মান বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান। যুযোধ্যস্মজ্জহুরাণ মেনো ভূযিষ্ঠাং তে নম উক্তিং যিধেম। হে অগ্নে, হে জ্যোতির্ময় পরমেশ্বর (দেব), তুমি সমস্ত ধর্মাধর্ম (বয়ুনানি) জান। অতএব তুমি আমাদেরকে শোভন পথে বাঞ্ছনীয় কল্যাণের দিকে (রায়ে) নিয়ে যাও। সে জন্য কুটিল পথগামী (জহুরাণং) পাপকে (এনঃ) আমাদের হতে (অস্মৎ) পৃথক কর (যুযোধি)। আমরা বার বার (ভূয়িষ্ঠাং) তোমার স্তব (নম উক্তিং) করি (বিধেম)।

২। অগ্নে ত্বং পারয়া নব্যো আমন স্বস্তিভিরতি
দুর্গাণি বিশ্বা। পূশ্চ পৃথ্বি বহুলা ন উর্বী ভবা

তোকায় তনয়ায় শং যোঃ। হে অগ্নে তুমি স্তবনীয় (নব্যো)। মঙ্গল বিধান দ্বারা (শ্বস্তিভিঃ) আমাদেরকে সকল (বিশ্বা) সংকট (দুঃগানি) হতে উত্তীর্ণ কর (অতি পারয়) আমাদের পুরি সকল বিস্তীর্ণ (পৃথ্বী) হোক, বিচিত্র সস্যাদি শালিনী (বহুলা) এবং বিস্তীর্ণ (উর্বী) হোক তুমি আমাদের সন্তানদের জন্য (তোকায়) আমাদের পুত্রদের জন্য (তনয়ায়) রোগ বিপদ বিনাশকারী (শং) এবং ভয়দূর কারী হও।

৩। অগ্নে ত্বমস্মৎ যুযোধ্যমীবা অনগ্নিত্রা অভ্যমন্তকৃষ্টীঃ।
পুনরস্মভ্যং সুবিতায় দেব বিশ্বেভিরমৃতেভির্যজত্র।

অগ্নে, আমাদের হতে রোগ সকল (অমীবাঃ) দূর কর। যারা অগ্নির রক্ষা লাভ করেনি (অনগ্নিত্রাঃ) যারা আমাদেরকে হিংসা করে

(অভিঅমন্ত) সেইসকল লোকদেরকেও (কৃষ্টীয়ঃ) পুনঃ পুনঃ আমাদের নিকট হতে দূর কর (যুযোধি)। হে জ্যোতির্ময় (দেব), হে পূজনীয় (যজত্র) অগ্নি, আমাদের সুফল লাভার্থ (স্বাবতায়) সকল অমরণ ধর্মাদের (অমৃতেভিঃ-ফেরেস্তাদের সঙ্গে) পৃথিবীতে (ক্ষাং) প্রকাশিত হয়।

৪। পাহি নো অগ্নে পায়ুভিরজস্রৈরত প্রিয়েসদন আ শুশুক্কান।
মা তে ভয়ং জরিতারং যবেষ্ঠ নূনং বিদন্মাপং সহস্বঃ।

হে অগ্নে, অবিচ্ছিন্ন পালন দ্বারা (পায়ুভিঃ) আমাদেরকে রক্ষা কর। আর (উত) তোমার প্রিয় পূজা স্থানে (সদনে) সর্বত্র জ্যোতি বিস্তার কর (আশু শুক্কান)। হে নিত্য তরুণ, (যবিষ্ঠ) তোমার স্তব কর্তা (জরিতারং) এই আমাকে যেন এখন (নূনং) ভয় অধিকার না করে (বিদৎ), হে বলের আধার (স্বহস্ব ঃ), অন্য সময়েও (অপরং) যেন ভয় আমাকে অধিকার না করে। (মা)

৫। মানো অগ্নেহ বস্হজো অঘায়া বিষ্যবে রিপবে দুচ্ছুনায়ৈ।
মা দত্বতে দশতে মাদতে নো মা বীষতে সহসাবন পরা দা ঃ।

হে অগ্নে আমাদেরকে (হিংসুকের হাতে (অঘায়) অথবা ভক্ষণেচ্ছু (অবিষ্যবে) দুঃখকারী (দুচ্ছুনায়ৈ) শত্রুর হাতে (রিপবে) নিক্ষেপ করো না (মা অবস্হজঃ)। দন্তযুক্ত দংশনকারী সর্পাদির হাতে (দত্বতে দশতে) নিক্ষেপ করো না। দন্তহীন (আদত্যে) শৃঙ্গাদিযুক্ত হিংস্র জন্তুর হাতে, অথবা হিংসাকারী (চোর ডাকাতের হাতে (রিষতে), হে বলের আধার। (সহসাবন), আমাদেরকে সমর্পণ করো না। (পরাদাঃ)

৬। বিঘত্বাবাঁ ঋতজাত যংসদ গৃণানো অগ্নে তুলেহ বরূথং।
বিশ্বাদ্রির ক্ষোরুত বা নি নিভসোর ভিহ্রু তামসি হে দেব বিস্পট।

হে সত্য স্বরূপের প্রকাশ (ঋতজাত) অগ্নি, শরীরের রক্ষার্থ (তন্বে) তোমাকে বরণীয় (বরুথং) জেনে, তোমার স্তব করে (গৃণাণঃ),

তোমাকে লাভ করে (ত্বাবান), সকল প্রকার (বিশ্বাৎ হিংসাকরী হতে (রিরিক্ষোঃ) অথবা নিন্দুক হতে (নিনিৎসোঃ) আপনাকে নির্মুক্ত করা যায়। হে দেব, তুমি স্পষ্টই চক্রান্তকারী শত্রুদের (অভিহ্রুতাং) বাধাদাতা (বিস্পষ্ট)।

৭। ত্বং তাঁ অগ্নে উভয়ান্বি বিদ্বান বোষ-প্রপিত্বে মনুযো যজত্র।
অভিপিত্বে মনবে শাস্যো ভূর্মমৃজেন্য উশিগভির্নক্রঃ।

হে পূজনীয় (যজত্র) অগ্নে, তুমি সেই (ভালমন্দ) উভয় বিধ লোককে বিশেষভাবে জেনে (বি বিদ্বান), আশ্রয় দেবার জন্য (প্রশিত্বে) কামনাকর। সর্বত্র তোমার অধিকার (অক্রঃ), সময় উপস্থিত হলে (অভিপিত্বে) মানুষের (মনবে) কথা তুমি শোন (শাস্যঃ) জ্ঞানীরা যেমন (উশিকভিঃ) তাদের কথা শোনেন যারা আপনাদেরকে শুদ্ধ করতে চায় (মর্মৃজেন্য ঃ)।

৮। অবোচাম নিবচনান্যস্মিন মানস সূনুঃ সহসানে অগ্নৌ। বয়ং সহস্র মৃষিভিঃ সনেম বিদ্যামেষং বৃজনং জীরদানুং। আমরা মানের সন্তানেরা শত্রুপরাভবকারী (সহসানে) এই অগ্নির উদ্দেশ্যে স্তোত্র উচ্চারণ করছি। অবোচান (অবোচাম নিবচনানি)। এই ঋষিদের সাহায্যে আমরা অপরিমিত ধন (সহস্রং) ও অন্নালাভ করব (সনেম) (বিদ্যাম ইষং) বল (বৃজনাং) এবং দীর্ঘ আয়ু (জীরদানুং) লাভ করব।

॥ ১১ ॥ সূক্ত ৫-২৮।

বিশ্ববারাঃ অগ্নিকন্যা ঋষি দেবতা অগ্নি।

১। সমিদ্ধো অগ্নিদিবি শোচিরশ্রেৎ প্রত্যঙুষস সমুর্বিয়াবি ভাতি। এতি প্রাচী বিশ্ববারা নামোভির্দে বাঁ ভলানা হবিষা ঘৃতাচী। অগ্নি সম্যক প্রজ্বলিত হয়ে (সমিদ্ধঃ) দ্যোতমান অন্তরীক্ষের দিকে (দিবি) শিখা (শোচিঃ) প্রেরণ করছে। (অশ্রেৎ) এবং উষার অভিমুখে (প্রত্যং উষসং) বিস্তীর্ণ আকারে (উঠিয়া) বিশেষ দীপ্তি পাচ্ছে

(বিভীতি)। স্রোত্রদ্বারা (নমঃ ভিঃ)। ঈশ্বর মহিমার পুরুষাকার রূপক স্বরূপ দেবগণের (দেবান) স্তব করতে করতে (ঈলানা), হবি বা ঘৃতাদি আহুতি সহ (হবিষা) শ্রুক বা চামচ হাতে করে (ঘৃতাচী), পূর্বমুখী হয়ে (প্রাচী) বিশ্বাবারা সেই অগ্নির নিকটে আসছে।

২। সমিধ্যমানো অমৃতস্য রাজসি হবিষ্কৃণ্বন্তং সচসে স্বস্তয়ে। বিশ্বং সধত্তে দ্রবিণং যমিন্বস্যা তিথ্যমগ্নে নিচ ধত্ত ইৎপুরঃ। হে অগ্নে, সম্যক প্রজ্বলিত হয়ে (সামিধ্যমানঃ) তুমি অমরত্বের (অমৃতস্য) প্রভু রূপে শোভা পাও (রাজসি), যে তোমাকে আহুতি সহ ডাকে (হবিষ্কৃন্বন্তং) তার কল্যাণের জন্য (স্বস্তয়ে) তুমি তার সঙ্গে সঙ্গে থাক (সচসে) তুমি যার কাছে যাও (ইন্বসি), সে সকল (বিশ্বং) সম্পদ (দ্রবিণং) লাভ করে (ধত্তে)। হে অগ্নে, সে ব্যক্তি পূর্ব হতেই (পুরইৎ) তোমার উপযুক্ত পরিচর্যার (আতিথ্যং) আয়োজন করে। (নিধত্তে)।

৩। অগ্নে শর্ধ মহতে সৌভাগায় তব দ্যুম্নান্যুত্তমানি সন্তু। সং জাম্পত্যং সুযমমা কৃনুষ্ব শত্রুযতামভি তিষ্ঠা মহাংসি। হে অগ্নে, যাতে আমাদের মহাসম্পদ লাভ হয় (মহতে সৌভগায়) সে জন্য তুমি বল প্রকাশ কর (শর্ধ) তোমার প্রদত্ত সম্পদ সকল (দ্যুম্নানি) যেন উৎকৃষ্ট ফলপ্রদ হয় (উত্তমানি সন্তু)। হে অগ্নে দাম্পত্য বা স্বামী স্ত্রী সম্বন্ধকে (জাম্পত্যং) সর্বত্র (আ) সম্যক (সং) সুপ্রতিষ্ঠিত (সুযমং) কর (কৃণুষ্ব)।

৪। সমিদ্ধস্য প্রমহসো হগ্নে বন্দে তব শ্রিয়ং। বৃষভো দ্যুম্নবাঁ আসি সমধ্বরে ষিধ্যসে। হে অগ্নে, তুমি সম্যক প্রজ্বলিত হয়ে প্রকৃষ্টরূপে তোমার তেজ প্রকাশ করেছ (প্রথহসে)। তোমার সৌন্দর্যের (শ্রিয়ং) স্তব করি (বন্দে)। তুমি বাসনা পূরণকারী (বৃষভঃ)। তুমি জ্যোতির্ময় (দ্যুম্নবান)। যজ্ঞ বা পূজার স্থানে তুমি সম্যক প্রদীপ্ত হও (সোমিধ্যসে)।

৫। সমিদ্ধো অ্যাগ্ন আহুত দেবান্যক্ষিস্বধ্বর। ত্বংহি হব্য বালিসি। হে সকলের আহ্বানের পাত্র (আহুত), হে অগ্নে হে শোভন যজ্ঞ

সম্পাদক (স্বধ্বর), তুমি প্রদীপ্ত হয়েছ (সমিধ্বঃ) যেহেতু তুমি ভগবৎ মহিমার পুরুষাকার রূপক স্বরূপ, অতএব তুমি দেবগণের পূজা সম্পাদন কর (যক্ষি), তুমিই হবন দ্রব্যের বহনকারী (হব্যবাট) অর্থাৎ অগ্নিতে আহুতি দিয়ে বৈদিক ঋষিগণ অধ্যাস করতেন বা ভাবতেন যে অতীন্দ্রিয় পরমাত্মা হতে প্রাপ্ত খাদ্যাদি অদৃশ্য হয়ে পুনরায় অতীন্দ্রিয় পরমাত্মাতেই গমন করে।

৬। আ জু হোতা দুবস্য তাগ্নিং প্রযত্যধ্বরে। বৃণীধ্বং হব্য বাহনং আরব্ধ যজ্ঞে (প্রযতি অধ্বরে) অগ্নিকে সম্যকরূপে আহ্বান কর (আজুহোত) তাঁর সেবা কর (দুবস্যত)। তাঁকেই (আহ্বানের বহনকর্তা জেনে (হবা বাহনং) যজ্ঞের উপাস্যরূপে গ্রহণ কর। পাঠক দেখছেন, এই সূত্রের স্রষ্টা একটি নারী ঋষি। একালে হিন্দু শিখেছে, স্ত্রীলোকের বেদে অধিকার নেই—'ত্রয়ী ন শ্রুতি গোচরা, বেদমন্ত্রের যোগে স্ত্রীলোকের কোন ক্রিয়াতে অধিকার নেই, 'নাস্তি স্ত্রীনাং ক্রিয়া মন্ত্রে। স্ত্রীলোকের যজ্ঞে অধিকার নেই নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথক যজ্ঞঃ। আর বেদের বিশ্বাস বেদ-মন্ত্রের দ্রষ্টা বা রচয়িতা। যজ্ঞের হোতা, উগদাতা, এবং ব্রহ্মা সকলই তিনি।

॥ ১২ ॥ ৭ম মণ্ডল। সূক্ত—৮৬।

বরুণ দেবতা। বশিষ্ঠ-ঋষি।

বরুণ অগ্নি সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে, 'বরুণ সম্বন্ধে ও তা সত্য। অগ্নি ইন্দ্রাদি শব্দের ন্যায় বরুণ শব্দও বহু অর্থ বাচী :

(১) 'বৃঞ আবরণে' (ধাতু পাঠ)। এই অর্থে নিশাকালে সকলের আবরণ কারী বাহ্য আকাশের নাম বরুণ। আবার পক্ষী যেমন তার পক্ষ পুটের আবরণে স্বীয় শাবককে রক্ষা করে, সেইরূপ পরমেশ্বরও বিশ্ব সংসারকে বুকে করে রক্ষা করেন। এইজন্য উপমিতি বলে পরমেশ্বরের ও নাম 'বরুণ'। ত্রিচিন বারং বরুণঃ কবন্ধং প্রসসর্জ রোদসী অন্তরিক্ষং। তেন বিশ্বস্য ভুবনস্য রাজা যবং ন বৃষ্টি বুনত্তি ভূম"। বরুণ মেঘকে (কবন্ধং) অধোমুখে গর্তযুক্ত (নীচিন বারং) করে ঢেলে দিলেন।

(প্রসসর্জ), যেন তারদ্বারা দ্যুলোক-ভূলোক (রোদসী) এবং অন্তরিক্ষের উপকার হয়। বিশ্বভুবনের রাজা বরুণ। তার দ্বারা ধরাতলকে (ভূম) কর্দমযুক্ত করলেন (ব্যনত্তি) তাঁর এই কার্য যববীজ বপনকারী পুরুষের (বৃষ্টি) ক্ষেত্রে বীজ বিস্তার করার ন্যায়।

(২) আবার 'বৃঞ্ বরণে (ধাতুপাঠ)। এই অর্থে বরণীয় বা পূজনীয় পরমেশ্বরই বরুণ। 'বেদা যো বীনাং পদমন্তরিক্ষেণ পততাং। বেদনাবঃ সমুদ্রিয়ঃ। বেদমাসো ধৃতব্রতো দ্বাদশ প্রজাবতঃ বেদায উপজায়তে" (১-২৫-৭৮)। বরুণ তিনি "যিনি আকাশগামী পাখী সকলের (বীনাং) কোনটি কোথায় থাকে তা জানেন, সমুদ্রে কোন নৌকা (নাবঃ) কোথায় কখন থাকে, তা জানেন। তিনি ধর্ম বিধির ধারণকর্তা, তিনি দ্বাদশ মাস এবং কোন মাসে কে জন্মে (প্রজাবতঃ), তা জানেন,। আর ত্রয়োদশ মাস (মল মাস) কখন হয় (য উপজায়তে তাও জানেন! 'দ্যাবা পৃথিবী বরুণস্য ধর্মণা বিষ্ক ভিতে (৬-৭০-১), বরুনের ধারণ শক্তি বলে দ্যুলোক-ভূলোক পৃথকভাবে স্ব স্ব স্থানে স্থির হয়ে আছে (বিষ্কভিতে)।" অবার জ্যোতির্ময় পরমেশ্বর বা অগ্নিই বরুণ অথবা মিত্র-"ত্বং বরুণ উত মিত্রো অগ্নে ত্বাং বর্ধন্তি মতিভির্বসিষ্ঠা (৭-১২-৩। 'হে অগ্নে, তুমিই বরুণ (বরণীয়), তুমিই মিত্র (মৃত্যু) হতে রক্ষা কর্তা)। বশিষ্ট বংশীয়েরা স্তুতিদ্বারা (মতিভিঃ) তোমার মহিমা কীর্তন করে।" আবার "স বরুণঃ সায়মগ্নির্ভবতি স মিত্রো ভবতি প্রাতরুদ্যন। স সবিতা ভূত্বান্ত রিক্ষেণ যাতি স ইন্দ্রো ভূত্বা তপতি মধ্যতো দিবঃ অথর্ববেদ। ১৩-৩-১৩। 'সেই অগ্নি সায়ংকালে বরুণ হন, প্রাতঃকালে উদয় হয়ে তিনি মিত্র হন, তিনি ইন্দ্র হয়ে মধ্য স্থলে থেকে আকাশকে উত্তাপিত করেন। দ্বৌ সংনিষদ যন্মন্ত্রয়েতে রাজা তদ্বেদ বরুণস্তৃতীয়" (অথর্ববেদ, ৪-১৬-২), "দু ব্যক্তি গোপনে বসে যে গুপ্ত মন্ত্রণা করে, তাদের মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তি হয়ে (বিশ্বের) রাজা বরুণ (স্বীয় সর্বজ্ঞত্ববলে) তা জানেন। বস্তুতঃ কোরআনের ন্যায় বেদ ও একেশ্বর বাদী। দেবানাং নামধা এক এব (১০-৮২-৩)। তাই বেদের সময়ে লিপি প্রচলন অথবা মুদ্রাংকন না

থাকাতে ঈশ্বরত্ব লোকের চিত্রপটে উজ্জ্বল ভাবে মুদ্রিত করবার জন্য ঋষিগণ পরমেশ্বরের মহিমা সকলকে কল্পনা করতে বাধ্য হয়েছিলেন। পৌরুষ বিধি কৈরঙ্গি স্বংস্তূয়ন্তে (যাস্ক)। ইন্দ্রং মিত্রং বরুণ মগ্নি মাহুরথো দিব্যঃ স সুবর্ণোগোরুৎমান। একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহু। (১-১৬৪-৪৬) 'জ্যোতির্ময় পরমেশ্বরকে ইন্দ্র (অগ্নিং) বলা নয়, ইন্দ্র (ইরা বা অগ্নিদাতা অথবা ইন্দু বা বৃষ্টি দাতা ; মিত্র (মৃত্যু হতে রক্ষা কর্তা। এবং বরুণ। ঐ যে আকাশ গামী পাখী (শরৎমান) অর্থাৎ সূর্য, তাও (ঐ অগ্নিরই মহিমা)। এক সত্য স্বরূপ পরমেশ্বর আছেন, ঋষিগণ তাকেই নানা নামে বর্ণনা করেন, যম (সূর্য) মাত বিশ্বা (বায়ু) ইত্যাদি নামে সেই অগ্নিকেই তারা পূজা দিয়ে থাকেন। পুরুষাকারে কল্পিত ঈশ্বর মহিমাই পরবর্তীকালে ভিন্ন ভিন্ন দেবতা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, এবং ৩৫০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে গ্রীকদের ভারত আগমনের পরে তাদের মাটির মূর্তি গড়া হয়েছিল। পাঠক মনে রাখবেন যে, অতীন্দ্রিয় ভাব প্রকাশ করবার যোগ্য ভাষা বেদের সময়ে বিকাশ লাভ করেনি। উপমিতির পথ অবলম্বন ভিন্ন বৈদিক ঋষিদের আত্মিক ভাব প্রকাশ করবার উপায়ন্তর ছিল না।

॥ ১৩ ॥ সূক্ত—৭-৮৫

বরুণ দেবতা বশিষ্ঠ ঋষি।

১। ধীরা তস্য মহিমা জনূংসি বি যস্তোস্তস্ত রোদসী চিদুর্বী প্র নাকং ঋদং নুনুদে বৃহন্তং দ্বিতা নক্ষত্রঃ পপ্রথচ্চ ভূম।

এই বরুণ হতে যা জন্মেছে (তস্য জনূংষি), তাঁর মহিমার প্রভাবে (তস্য মহিমা) কে সকলই স্থির অটল (ধীরা)। তিনিই বরুণ যিনি বিস্তীর্ণ (উর্বী) দ্যুলোক ভূলোককেও (রোদসী চিৎ) নানারূপে স্ব স্ব স্থানে স্থির রেখেছেন (বিতস্তম্ভ), যিনি বৃহৎ আদিত্যকে (নাকং) এবং সুন্দর (ঋদং) নক্ষত্রকে দিবারাত্রিভেদে দুটি প্রকারে (দ্বিতা) চালাচ্ছেন (প্র নুনুদে), যিনি ভূমিকেও বিস্তারিত করেছেন (প প্রথৎ)।

২। উতস্বয়া তন্বা সংবদে তৎকদা ঘন্তর্বরুণে ভুবানি। কিং মে

হব্য মহৃণানো জুষেত কদা মৃলীকং সুমনা অভি খ্যং। আমি কি কেবল (উত) আমার নিজের শরীরের সঙ্গে (স্বয়া তন্বা) আলাপ করব (সংবদে)? তবে (তং) যখন (কদান্নু) আমি বরুণের মধ্যে ডুবে যাব (অন্ত ভুবানি)। তিনি ক্রোধ রহিত হয়ে (অহ্নানাঃ) আমার হবিযুক্ত পূজা (হব্যং) গ্রহণ করবেন (জুষেত), তখন আমি আনন্দিত চিত্তে (সুমনা,) সেই সুখদাতা (মৃলকীং) বরুণকে সর্বত্র (অভি) দর্শন করব (খ্যং)।

৩। পৃচ্ছে তদেনো বরুণ দিদৃক্ষুপো এমি চেকিতু যো বিপৃচ্ছং। সমানমিম্মে কবযশ্চিদাহুরয়ং হতুভ্যং বরুণো হৃণীতে। হে বরুণ, আমি তোমার দর্শন লাভেচ্ছু (দিদৃক্ষু)। তাই যে পাপের ফলে আমি তোমার দর্শন হতে বঞ্চিত, সে পাপের কথা (এনঃ) তোমাকেই জিজ্ঞাসা করি (পৃচ্ছে)। তা ভালরূপে জানবার জন্য (বিপৃচ্ছং), আমি জ্ঞানীদের (চিকিতুষঃ) নিকটে যাই (উপক্রমি)। সেই জ্ঞানীগণ (কবযঃ) বা অতীন্দ্রিয়র্থে বশীগণও (চিৎ) একবাক্যে (সমানং) আমাকে বলেছেন (মে আহুঃ), সে বরুণ (অয়ং বরুণঃ) তোমার প্রতি অপ্রসন্ন হয়েছেন। (হৃণীতে)।

৪। কিমাগ আম বরুণ জ্যেষ্ঠং যৎ স্তোতারাং জিঘাংসসি সখায়ং। প্রতম্মে বোচো দূলভ স্বধাবোহ ব ত্বানেনা নামসা তুর ইয়াং। হে বরুণ, বড় (জ্যেষ্ঠং) অপরাধ (আগঃ) আমার কি (কিঃ) হয়েছে (আসা), যে জন্য (যৎ) আমার এই অনুচর (সখায়ং) স্তবকর্তাকে বধ করতে ইচ্ছা করছ (জিঘাংসসি), হে অপ্রতিহত প্রভাব শালী (দুদভ), আপনাতে আপনি অবস্থিত (স্বধাবঃ) বরুণ, সেই পাপ কি (তৎ), আমাকে (মা) তা বিশেষ করে বলে দাও (প্রবোচঃ), যেন নিষ্পাপ হয়ে (অনেনার) সত্বর (তুর) নমস্কার দ্বারা (নাম্যা) তোমার সঙ্গে (ত্বা) মিলতে পারি। (অব ইয়াং)।

৫। অব দ্রুগ্ধানি পিত্র্যা সৃজা নোহ ব যা বয়ং চকৃমা তম্ভুভি। অব রাজন পশুতৃপং না তায়ুং সৃজা বৎসং ন দাম্নো বশিষ্ঠং। হে বরুণ, পূর্বপুরুষ হতে প্রাপ্ত (পিত্র্যা) আমাদের (নঃ) অনিষ্টকারী পাপ

প্রবৃত্তি সকল হতে (দ্রগ্ধানি) আমাদেরকে মুক্ত কর (অবসৃজ)। আমরা বরং স্বীয় শরীর দ্বারা (অনূভিঃ) যে সকল দুষ্কার্য করেছি (চকৃম) তা হতে ও মুক্ত কর (অবসৃজ)। পশুচোর (তায়ুং) যেমন ঘাসাদি প্রদান দ্বারা পশুকে পরিতৃপ্ত করে পাপ হতে মুক্ত হয় (পশুতৃপং), হে বিশ্বরাজ বরুণ (রাজন) গো বৎসকে যেমন বন্ধন রজ্জু হতে (দাম্নঃ) মুক্ত করে, বশিষ্ঠকেও সেইরূপ পাপের বন্ধন হতে মুক্ত কর। (অবসৃজ)

৬। ন স স্বো দক্ষো বরুণ ধ্রুতিঃ সাসুরা মন্যু বিভীদকো অচিত্তিঃ। অস্তি জ্যায়ান কনীয়স উপারে স্বপ্নস্বনেদনৃতস্য প্রযোতা। হে বরুণ, লোকে যে পাপ করে (সেঃ) তার আত্মার স্বরূপ গতি (স্বঃ) বলে (দক্ষ) নয়। যা আকর্ষণ হেতু (ধ্রুতিঃ) তা হয় (সা) যথা সুরাপান জনিত মত্ততা (সুর), ক্রোধান্ধতা (মনুষ্য :) দ্যূতক্রীড়াতে আসক্তি (বিভীদকঃ) অথবা মূঢ়তা (অচিত্তি), আবার কনিষ্ঠের (কনীবসঃ) নিকটে (উপারে) জ্যেষ্ঠের কুদৃষ্টান্তও (জ্যোয়ান) আছে (অস্তি), এমন কি (ইৎ) স্বপ্ন ও (স্বপ্নাশ্চন) লোকের অধর্মে (অনৃতস্য) বিলুপ্ত হবার কারণ হয় (প্রযোতা)। লোকের পাপের প্রতি বশিষ্ঠের এই ক্ষমাশীল দৃষ্টি আমাদের বিশেষ অনুধাবণ যোগ্য।

৭। অরং দাসো ন মীহলুষে করাণ্যহং দেবায় ভূর্ণ যেহ নাগাঃ। অচে তদযচিতো দেবো অর্যো গৃৎসং রায়ে কবিতরো জুনাতি। পাপ শূন্য হয়ে (অনাগাঃ) আমি দাসের ন্যায় (দাসঃ) বাসনা পূরণকারী (মীহ্লুষে) জগত পাতা (ভূর্ণয়ে) দানশীল দেবায় দানাদিগুণ যুক্তায়; (সোয়ন) বরুণের সেবা করব (অরং কবাণি) প্রভু (অর্য) দেববরুণ আমাদেরকে অজ্ঞানী (অচিতঃ) জেনে, জ্ঞান প্রদান করুন (অচেতয়ৎ) যে পথে গেলে তাঁর স্তবকর্তার (গৃৎসং) প্রকৃত সম্পদ লাভ হয় (রায়ে) সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী (কবিতরঃ) বরুণ সেই পথে তাকে চালনা করুন (জুনাতি) বেদের আদর্শ দাস্য-মুক্তি। তা লাভ করতে হলে নিষ্পাপ (অনাগাঃ) হতে হয়। বশিষ্ঠ আপনাকে অজ্ঞানী জেনে সরল বালকের

মত নিরত পরমেশ্বরের নিকটে জ্ঞান ভিক্ষা করেছেন। এরূপ স্থলে বেদকে অভ্রান্ত মনে করা কি ভ্রম নয়?

৮। অয়ং সু তুভ্যং বরুণ স্বধাবো হৃদি স্তোম উপশ্রিশ্চিদস্তু। শং নঃ ক্ষেমে শমু যোগে নো অস্তু যূয়ং বাত স্বস্তিভিঃ সদানঃ। হে আপন মহিমাতে প্রতিষ্ঠিত (স্বধাবঃ) বরুণ? তোমার উদ্দেশ্যে রচিত (তুভ্যং) আমার দৃষ্ট এই স্তোত্র (অয়ং স্তমঃ) যেন (চিৎ) তোমার হৃদয়ে (হৃদি) সুন্দর রূপে জ্ঞান লাভ করে (সু উপশ্রিত অস্তু)। প্রাপ্তধনের রক্ষা কার্য (ক্ষমে) আমাদের পক্ষে উপদ্রবশূন্য (শং) হোক, অপ্রাপ্ত ধনের প্রাপ্তি কার্য (যোগে), (উ) আমাদের পক্ষে উপদ্রব শূন্য (শং) হোক। মঙ্গল বিধান দ্বারা (স্বস্তিভিঃ (তুমি) যুয়ং মান্যার্থে বহু বচন—আমাদেরকে সর্বদা রক্ষা কর (পাত)। বৈদিক ঋষিগণ গৃহী ছিলেন,—ধন সম্পদ এবং পুত্র কন্যাদি কামনা করতেন। তারা কখনো বলতেন না 'অর্থ মনর্থং ভাবয় নিত্যং"। এ কালের পরমুখাপেক্ষী পরভাগ্যোপজীবি কাপুরুষোচিত প্রাণহীন বীরত্ব হীন কর্কট বৈরাগ্যের আদর্শ দ্বারা পাঠক বৈদিক ঋষিদের বিচার করবেন না।

॥ ১৪ ॥ সূক্ত—৭-৮৭

বশিষ্ঠ—ঋষি

বরুণ—দেবতা

১। রদৎ পথো বরুণঃ সূর্যায় প্রার্ণানসি সমুদ্রিয়া নদীনাং। সর্গো ন সৃষ্টো অর্বতীর ঋতায়ঞ্চকার মহীর বনী রহভ্যঃ। বরুণ দেব সূর্যের জন্য আকাশ পথ প্রদান করেন (রদৎপথঃ) নদী সকলের জন্য অন্তরীক্ষ হতে (সমুদ্রিয়ঃ) জল (অর্ণাংসি) প্রেরণ। যুদ্ধাশ্ব যেমন (সর্গঃ ন) ঘোটকীর প্রতি ছেড়ে দিলে (সৃষ্টং) সত্বর (ঋতায়ণ) ঘোটকীর নিকট যায় (অর্বতীয়ঃ), বরুণ ও সেইরূপ সত্বর হয়ে দিন হতে (অ হভ্যঃ) মহতী রাত্রি সকল (অবনীঃ) উৎপন্ন করেন।

২। আত্মাতে বাতো রজ আ নবীনোৎ পশুর্নভূর্ণির্যবসে সসবান।

অন্তর্মহী বৃহতী রোদসীমে বিশ্বাতে ধামে বরুণ প্রিয়ানি। "হে বরুণ, তোমার বায়ু সকলের আত্মা স্বরূপ। তা জলকে (রজঃ) সকলের কাছে প্রেরণ করে (আ নবীনোৎ)। (সেই বায়ু) জগতের ভরণ কর্তা (ভূর্ণিঃ) পশু যেমন খাস পেলে (যবসে) অন্নবান হয়। সেইরূপ সেই বায়ু অন্নদারা (সুখবান) জগতকে ভরণ করে। হে বরুণ, এই মহতী সীমারহিতা দ্যাবা পৃথিবীর মধ্যে (রোদসী অন্তঃ) তোমার সমস্ত স্থান সকলের পক্ষেই প্রীতিকর।

৩। পরিস্পশো বরুণস্য স্মদিষ্টা উভে পশ্যন্তি রোদনী সুমেকে। ঋতাবানঃ কবয়ো যজ্ঞধীরাঃ প্রচেৎসোযো ইষয়ন্ত মন্ম। "বরুণ দেবের চরগণ (স্পশঃ) প্রশংসিত গতিশীল (স্মৎ ইষ্টাঃ), এবং সুন্দর রূপশালী (সুমেকে), তিনি উভয় দ্যুলোক ও ভূলোকের সমস্ত দর্শন করেন (পরি পশ্যন্তি) যারা (যে) সৎকর্মশালী (ঋতাবানঃ) পূজানিরত (যজ্ঞধীরাঃ), প্রকৃষ্টজ্ঞানশালী (প্রচেতসঃ) অতীন্দ্রিয়ার্থদর্শি ঋষি (কবরঃ) তারা বরুণের দিকে স্তোত্র (মন্ম) প্রেরণ করেন (ইষয়ন্ত)।

৪। উবাচ মে বরুণো মেধিরায় ত্রিঃ সপ্ত নামাঘ্ন্যা বিভর্তি। বিদ্বান পদস্য গুহ্যা ন বোচদ যুগায় বিপ্র উপরায় শিক্ষণ। আমাকে মেধা সম্পন্ন করে (মেধিরায়) গোরূপী পৃথিবী (অঘ্ন্যা) যে একশটি নামধারণ করেন, বরুণ আমাকে তা বলেছেন। পরম জ্ঞানিবান (বিপ্রঃ) বরুণ আমাকে তাতে যুক্ত (যুগায়), তাতে আনন্দিত (উপরায়) জেনে (বিদ্বান), উৎকৃষ্ট লোকের (পদস্য) রহস্য সকল (গুহ্যা) ও (ন) উপদেশ দ্বারা (শিক্ষণ) শিক্ষা দিয়েছেন (বোচৎ)।

৫। তিস্রো দ্যবো নিহিতা অন্তরস্মিন তিস্রো ভূমিরূপরাঃ ষড় বিধানাঃ। গৃৎসো রাজ্য বরুণ সশ্চক্র ত্রতং দিবি। প্রঙখং হিরণ্যয়ং শুভেকং। (উত্তম-মধ্যম-অধম ভেদে) তিন প্রকার দ্যুলোক এই বরুণের মধ্যে নিহিত বসন্তাদি ঋতুভেদে ছ প্রকার রূপধারী (ষড়্‌বিধানাঃ)। তিন শ্রেণীর ভূমি সকল তাতে অবস্থিত (উপরাঃ)। পূজনীয় (গৃৎসঃ) বিশ্বরাজ বরুণ আকাশে (দিবিঃ) সোণার (হিরণ্যয়ং) দোলার ন্যায়

(পূর্ব পশ্চিম স্পর্শী) এই সূর্যকে (এবং) আলোক দানার্থ (শুভেকং) নির্মাণ করেছেন (চক্রে)।

৬। অব সিন্ধুং বরুণো দ্যোরিব স্থাৎ দ্রপসো ন শ্বেতো মৃগস্তুবিষ্মাণ। গম্ভীর শংসো রজসো বিমানঃ। সুপার ক্ষেত্রঃ যতো অস্য রাজা। বরুণ আকাশের ন্যায় (দৌরিব) নির্মল, জলবিন্দুর ন্যায় (দ্রপ্‌সঃ ন) শুভ্র (শ্বেতঃ)। তিনি অনুসন্ধান যোগ্য (মৃগঃ)। তিনি মহাবলশালী (তুবিষ্মান)। তার স্তোত্র মহৎ (গংভীর শংসঃ) তিনি জলের (রজক) নির্মাণ কর্তা (বিমানঃ), তাঁর বলে অনায়াসে দুঃখ-পাপ অতিক্রম করা যায় (সুপার ক্ষত্রঃ)। যা কিছু বর্তমান সত্ত্ব, তিনি তারই রাজা।

৭। যো মৃলয়াতি চক্রুষে চিদাগো বয়ং সাম বরুণে অনাগাঃ। অনুব্রতান্যদিতে ঋধন্তো যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদাণঃ। যে পাপ কার্য করে (চক্রুষে চিৎ, আগিঃ) তাকেও যিনি সুখদান করেন (মৃলয়াতি) সেই বরুণের নিকটে যেন আমরা নিষ্পাপ (অনাগাঃ) হই। আমরা যেন অখণ্ড স্বরূপ (অদিতেঃ) বরুণের প্রত্যাদেশ সকল (ব্রতানি) নিয়ত (অনু) পালন করি (ঋধন্তঃ)। হে বরুণ তুমি (সম্মানার্থে) বহুবচন যূয়ং (নিয়ত) সদা (কল্যাণ দান) করে (স্বস্তিভিঃ) আমাদেরকে প্রতিপালন কর।

॥ ১৫ ॥ সূক্ত—১০-১২১
হিরণ্যগর্ভ—ঋষি
প্রজাপতি-দেবতা।

আমরা পূর্বেই বলেছি একালে যেমন বঙ্গদেশে পরমেশ্বরের নামে মানুষেরও পরমেশ্বর, জগন্নাথাদি নাম থাকে, বৈদিক সময়েও মানুষের 'ইন্দ্র', অগ্নি, বরুণ ইত্যাদি নাম থাকত। শুধু তা নয়—পরমেশ্বরই হিত রমণীয় বস্তু সকলের বীজ যা উৎপত্তি ভূমি (হিরণ্য গর্ভ), যা হতে আম্রাদি বীজ হতে আম্রাদি বৃক্ষের উৎপত্তির ন্যায়, জগত উৎপন্ন হয়েছে। এজন্য পরমেশ্বরের নাম 'হিরণ্য গর্ভ, প্রজা সকলকে পালন করেন,

এজন্য পরমেশ্বর 'প্রজাপতি'। আবার একালের মত কোন কোন বৈদিক ঋষিরও নাম প্রজাপতি (১০-১২৯)। পরমেশ্বরের আদেশ মাত্র সৃষ্টি হয়, এজন্য পরমেশ্বরের নাম বাক। আবার একটি নারী ঋষির ও নাম বাক (১০-১২৫)। এই সকল ঈশ্বর নাম ধারী ঋষিগণ আবার স্থানে স্থানে কবিত্বের ভাবে বিভোর হয়ে নিজের নামেই ঈশ্বরকে সম্বোধন করেছেন। এ হতেই পরবর্তী কালে এদেশে অবতারবাদ স্থান পেয়েছে এবং নানা প্রকার উপকথার সৃষ্টি হয়েছে। নিম্নের সূক্তে হিরণ্যগর্ভ নামে ঋষি, হিরণ্য বা হিত রমণীয়ের প্রসবকারী পরমেশ্বরের স্তব করেছেন

॥ ১৬ ॥ সূক্ত—১০-১২১

১। হিরণ্যগর্ভ সমবর্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ। সদাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম। সৃষ্টির পূর্বে (অগ্রে) জগতের হিত রমণীয় বীজ বা উৎপত্তি ভূমি স্বরূপ (হিরণ্যগর্ভঃ) পরমেশ্বর বর্তমান ছিলেন (সমবর্তিত)। তিনি সৃষ্ট সকলের (ভূতস্য) এক বা অদ্বিতীয় প্রভু (পতিঃ) রূপে আবির্ভূত হলেন (জাত আসীৎ)। তিনি দ্যুলোক এবং এই পৃথিবীকেও (উত) ধারণ করছেন (দাধার)। উপহার যোগে (হবিষা) তিনি ভিন্ন কোন্ দেবতার সেবা করব ? (বিধেম)।

২। য আত্মদা বলদা যস বিশ্ব উপমতে প্রশিষং যস্য দেবাঃ। যস্য ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ কস্মি দেবায় হবিষা বিধেম। যিনি সকলকে আত্মা (বারুহ) দান করছেন, বলদান করছেন। যাঁর আদেশ (প্রশিষং) বিশ্ব সংসার (বিশ্বে) পালন করে। দেবতাগণ (ফেরেস্তাগণ) ও যার আদেশ পালন করেন। আমরণ ধর্ম (অমৃতং) যার ছায়াস্বরূপ মৃত্যু ও যাঁর দয়া স্বরূপ, তিনি ভিন্ন উপহার যোগে কোন্ দেবতার সেবা করব ?

৩। যঃ প্রাণতো নিমিষতো মহিত্বৈক ইদ্রাজা জগতে বভূব। য ঈশে অস্য দ্বিপদাচতুষ্পদঃ কস্মি দেবায় হবিষা বিধেম। যিনি স্বীয়

মহিমা বলে (মহিত্বা) শ্বাস প্রশ্বাসকারী (প্রাণতঃ) চক্ষু নিমেষে উন্মেষকারী (নিমিষতঃ) গতিশীল প্রাণী বর্গের (জগতঃ) একমাত্র (এক ইৎ) রাজা বা ঈশ্বর হয়েছেন, যিনি দৃশ্যমান (অস্য) মনুষ্যাদি দ্বিপদ এবং গবাদি চতুষ্পদকে শাসন করছেন (ঈশে), তিনি ভিন্ন উপহার যোগে কোন্ দেবতার সেবা করব ?

৪। যস্যেম হিমবন্তো মহিত্বা যস্য সমুকং রসয়া সহাহু। যস্যে:মাঃ প্রদিশো যস্য বাহু কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম। এই দৃশ্যমান (ইমে) তুষার মণ্ডিত পর্বত সকল (হিমবন্তঃ) যাঁর মহিমা, নদী সকল সহ (রসয়া সহ) সমুদ্র যাঁর মহিমা স্বরূপ (যস্য) বলে উক্ত হয়, (আহুঃ)। পূর্ব পশ্চিমাদি দিক সকল (ইমাঃ) যাঁর (যস্য), অগ্নি বায়ু ঈশানাদি কোন সকল, যাঁর বাহু স্বরূপ, তিনি ভিন্ন উপহার যোগে কোন্ দেবতার পূজা করব ?

৫। যেন দ্যৌরুগ্রা পৃথিবী চ দৃহ্লা যেন স্বঃ স্তভিতং যেন নাকঃ। যো অন্তরিক্ষে রজসো বিমানঃ কস্মি দেবায় হবিষা। যাঁর প্রভাবে দ্যুলোক তেজোময় পৃথিবী অচলা যিনি স্বর্গলোক (স্বঃ), যিনি দুঃখ রহিত লো:ক (নাক) ধারণ করে অছেন, যিনি অন্তরিক্ষে থেকে জলরাশি (যজসঃ) নির্মাণ করেন, তিনি ভিন্ন উপহার যোগে কোন্ দেবতার সেবা করব ?

৬। যং ক্রন্দসী অবসা তস্তটানে অভ্যৈক্ষভং মনসা রেজমানে, যত্রাধি সূর উদিতো বিভাতি কস্মি দেবয়ে হবিষা বিধেম। লোক রক্ষার্থ (অবসা) স্থির ভাবে স্থাপিত শোভমান (রেজমানে) আকাশ—পৃথিবী (ক্রন্দসা) মনে মনে (মনসা) যার দিকে চেয়ে আছে (অভি ঐক্ষেতাং) যাঁর আশ্রয়ে থেকে (যত্র অধি) সূর্য (সূরঃ) উদিত হয়ে শোভা পাচ্ছে (বিভাতি) তিনি ভিন্ন উপহার যোগে কোন্ দেবতার সেবা করব ?

৭। আপো হ যদ্বৃহতী বিশ্বমায়ন গর্ভং দধানা জয়ন্তী রগ্নিং। ততো দেবানাং সমবর্তা তা সুরেকঃ কস্মি দেবায় হবিষা বিধেম। গর্ভ ধারিণী (গর্ভং দধানাঃ) বিদ্যুতাগ্নির জনয়িত্রী (জনয়ন্তী রগ্নিং) মহতী (বৃহতীঃ) জলরাশি (আপঃ) যখন (সৎ) সর্বত্র (বিশ্বং) ব্যাপ্তহল,

তখনই যা হতে (ততঃ) দেবমানবাদি সকল প্রাণীর এক অভিন্ন প্রাণ (অসুঃ একঃ) প্রকাশিত হল (সং অবর্তত), তিনি ভিন্ন উপহার যোগে কোন্ দেবতার সেবা করব ?

৮। য শ্চিদাপো ম.হিনা পর্যপশ্যৎ দক্ষং দধানা জনয়ন্তীর্যজ্ঞং। যা দেবেষ্বধি দেব এক আসীৎ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম। যজ্ঞাগ্নি হতে স্ফুলিঙ্গের ন্যায় জগৎ সৃষ্টির জন্য (যজ্ঞং জনয়ন্তী) বল প্রকাশ করে (দক্ষং দধানঃ), যিনি স্বীয় প্রভাব সহকারে (মহিনা) জলের প্রতি দৃষ্টি করে ছিলেন (আপঃ পরি অপশ্যৎ) যিনি সকল দেবতার ওপরে (দেবের অধি) এক অদ্বিতীয় দেব হয়ে আছেন, তিনি ভিন্ন উপহার যোগে কোন্ দেবতার সেবা করব ?

৯। মানো হিংসীজ্জনিতা যঃ পৃথিব্যঃ যো বা দিবং সত্য ধর্মা র্জজান য শ্চাপশ্চন্দ্রা বৃহতীর্জ জান কস্মৈ দেবায় হিবষা বিধেম। যিনি পৃথিবীর জন্মদাতা (জনিতা), অথবা যিনি সত্যের ধারণকর্তা (সত্য ধর্মা) হয়ে দ্যুলোকের জন্ম দিয়েছেন (জান) যিনি মহতী (বৃহতীঃ) আহ্লাদ দায়িনী (চন্দ্রঃ) জল সকলের (অপঃ) জন্ম দিয়েছেন, তিনি যেন আমাদের প্রতি অপ্রসন্ন না হন (হিংসীৎ) তিনি ভিন্ন উপহার যোগে কোন্ দেবতার সেবা করব ?

১০। প্রজাপতে ন ধদেতান্যন্যো বিশ্বা জাতানি পরি তা বভূব। যৎকামাস্তে জহুমস্তন্নো অস্তবয়ং স্যাম পতযো রয়ীণাং। হে লোক! সকলের রক্ষাকর্তা (প্রজাপতে) পরমেশ্বর, তুমি ভিন্ন অন্ন কেউ (ত্বদন্যো) এই দৃশ্যমান (এতানি) সৃষ্ট (জতিনি) বিশ্ব সংসারকে পরিব্যপ্ত করতে পারে না (পরি তা বভূব)। আমরা যা যা কামনা করি (যৎকামঃ) ঘৃতাদি উপহার সহ তোমাকে ডাকছি (জহুমঃ) আমরা যেন তা লাভ করতে পারি—আমরা যেন সম্পদের (রয়ীনার) অধিকারী (পতয়ঃ) হই।

পবিত্র বেদে আরও প্রার্থনা করে বলা হয়েছে: হে জ্যোতির্ময় পরমেশ্বর, হে মঙ্গলময়, পৃথিবীবাসী লোক সকল, তোমারই পূজা করে। তুমি লোকের পূজা গ্রহণ কর, তুমি ধর্মাধর্মের বিচারক, তুমি আনন্দ-

দাতাদের শ্রেষ্ঠ, তুমি হৃদয়ে বাস কর, তুমি সকলের দর্শনীয়, তুমি মহাশব্দকারী, তুমি সুখের সঙ্গে পূজিত, তুমি উজ্জ্বল শোভা ধারণ কর। হে বলের আধার, বৃদ্ধ যেমন দণ্ডকে আশ্রয় করে, আমরাও সেরূপ তোমাকেই আশ্রয় করি। আমরা সদা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে তোমাকেই কামনা করি। এভাবে বেদে বহু প্রার্থনা শ্লোক আছে, যে শ্লোকগুলির সঙ্গে কোরআনের আয়াতের হুবহু মিল আছে। সুতরাং ধর্মতঃ আমরা সকলে এক ও অভিন্ন।—'সমগ্র মানবমণ্ডলী একজাতি'; আল্-কোরআন।

এছাড়া পবিত্র কোরআনে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে: 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের পাপ ক্ষমা কর, আমাদের মন্দ কার্যগুলি দূরীভূত কর এবং আমাদের সৎ কর্মশীলদের মত মৃত্যু দাও (৩: ১৯৩)। হে প্রভু! সমস্ত প্রশংসা তোমারই প্রাপ্য, তুমি অনন্ত করুণাময়, পরমদয়ালু। তুমি কর্মফল দিবসের বিচারক। আমরা কেবল তোমারই উপাসনা করি এবং তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। আমাদের সরল সঠিক (সত্য) পথে চালিত কর—অর্থাৎ যাদের তুমি অনুগ্রহ দান করেছ ও যারা তোমার ক্রোধে পড়েনি এবং বিপথে যায়নি—(১: ১-৭)।

। নবম অধ্যায় ।

সাংস্কৃতিক ভাবের আদান প্রদান

বঙ্গে সুফী প্রভাব

। ১ ।

দেশে রাষ্ট্রবিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন ভাবধারার পরিবর্তন ও পরিবর্ধন, নিত্য নব নব ভাবধারার উৎপত্তি ও বিকাশ নিতান্তই স্বাভাবিক। মুসলমান অধিকারের সময় কেবল ভারতের অন্যান্য স্থানে যে এ সমস্ত বিষয় বিশেষ ভাবে লক্ষিত হয়েছিল তেমন নয়, বাংলায় ভারতের অন্যান্য স্থান হতে ভাবজগতের বিপ্লব সকলের চেয়ে অধিক প্রকাশ পেয়েছিল বলে মনে হয়। তা ছাড়া পরিস্ফুট প্রমাণ, যেমন একদিন দেশের সর্বত্র বৈষ্ণব, আউল, বাউল, সাঁই প্রভৃতি সম্প্রদায়ের আখড়া প্রতিষ্ঠা, তেমনি অন্যদিকে অধিবাসীদের মধ্যে মুসলমান ধর্মের প্রচার এবং মসজিদ, মক্তব ও মুসলমান সাধকগণের আস্তানাহ্ ও দরগাহ প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা। মুসলমান অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে, যতগুলি নবভাবের আগমনে, এদেশের চিন্তা জগতে বিপ্লব উপস্থিত হয়েছিল, তারমধ্যে সুফীভাব ধারাই প্রধান। ভাব-প্রবণ-বঙ্গ এ নব নব ভাবধারার সংস্পর্শে চমকিত ও পূর্ণরূপে বিপ্লাবিত হয়ে ওঠেছিল। এ বিপ্লবের ফলে এদেশে কত নব নব ভাব ও চিন্তার বিকাশ হয়েছিল। আজ তার ইতিহাস আমাদের নিকট যেন অজানার পর্যায়ে পড়েছে। বর্তমান অবস্থায় ইতিহাস বলতে রাষ্ট্রবিপ্লবের ইতিহাস হয়ে পড়ায়, বঙ্গদেশীয় সুফীদের কোন ধারা বাহিক ইতিহাস বা স্থানীয় প্রবাদ ব্যতীত অধুনা অন্য কোন ঐতিহাসিক উপাদান নেই। পরবর্তীকালে, পশ্চিম ভারতে ও মুসলমান অধিকৃত অপরাপর রাজ্যে, সুফীদের নানা জীবনী

ও জীবনকথা সংগৃহীত হয়েছিল। দুর্ভাগ্য বশতঃ এযাবৎ বাংলায় তা হয়নি; হলেও অধুনা তা লোপ পেয়েছে। সুতরাং বঙ্গীয় সুফীদের ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা, বর্তমান অবস্থায় একরূপ অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। ধর্মান্ধ ও গোঁড়া বিজেতৃদের আপ্রাণ চেষ্টা যেখানে নিতান্তই ব্যর্থ ও নিষ্ফল বলে প্রমাণিত হয়েছে, মুসলমান সাধকদের উদার ভাব ও শান্ত প্রবর্তনা সেখানে আশ্চর্য রূপে সাফল্য মণ্ডিত হয়েছে। সকল স্তর ও সকল সম্প্রদায়ের সঙ্গে অবাধ মিলনের দ্বারা, বিজেতা ও বিজিতদের মধ্যে এই মুসলমান সাধকগণ যোগসূত্রের সৃষ্টি করেছিলেন। বিজেতাদের ক্ষেত্র শক্তির উচ্ছৃঙ্খলতায় বিজিতেরা যখন তাদের নিকট হতে সরে দাঁড়াত, বিজেতৃ সম্প্রদায়ের এই উদার ও মহাত্মা সাধকদের সংস্পর্শে এসে বিজিতেরা তাদের নূতন রাজ জাতির আত্মার পরিচয় লাভ করে নিকটবর্তী হয়ে পড়ত। বৈজেতৃগণ ও বিজিতদের প্রাণের সন্ধান পেয়েছিল কোথায়? দেশব্যাপী মন্দির মালার গগন-চুম্বী চূড়ার তলে বিশাবপু ও সুচিত্রিত মূর্তিশ্রেণীর পাদদেশে দাঁড়িয়ে, শঙ্খ ঘণ্টা মুখর মন্দির প্রাঙ্গনে শাস্ত্র পাঠ-নিরত শিখা ধারী ব্রাহ্মণের নিকট তারা কখনও তা লাভ করে নি। চিরদিনই মানব-আত্মা পরস্পরের সন্ধান ও পরিচয় লাভে উন্মুখ; চিরকালই মানুষ মানুষকে বুঝতে চেষ্টা করেছে, চিনতে সাধনা করেছে। অল্পদিনের মধ্যে বিজয়-মদ-মত্ততার অবসানের সঙ্গে সঙ্গে, এবং মর্মন্তুদ পরাজয়ের লজ্জাকর অপমান বিস্মরণের সঙ্গে সঙ্গে, অন্যান্য দেশের ন্যায় বঙ্গদেশেরও, বিজেতা, ও বিজিতদের মধ্যে পরস্পর নিকটবর্তী হয়ে, হৃদয়ের সন্ধান ও বুঝবার বিশ্বজনীন প্রচেষ্টা, জোরের সঙ্গে চলেছিল। কিন্তু দেশের উভয় দিক হতে এই যে মিলনের আকাঙ্খা, একে রূপ দিয়েছিল কে? একে প্রবল করে তুলেছিল কারা এই বিষয় যখন চিন্তাকরি, তখন আমার নিকট নানা শাস্ত্রালোচনা মুখর ও নানা সংস্কারের জন্মস্থান বঙ্গদেশের অসংখ্য মন্দির ও মসজিদ হতে, এদেশের দরবেশ আখ্যাধারী মুসলমান সাধকদের প্রাচীণ পূর্ণকুটীর আস্তানা বা আশ্রম গুলিকে সমাধিক পুণ্যময় পীঠস্থান বলে মনে হয়। মানুষের ভূতময় শরীর হতে আত্মা নিশ্চয় শ্রেষ্ঠ ও মহত্তর উপাদানে

সৃজিত। তাই আত্মিক ক্ষমতার নিকট সকল শ্রেণীর মানুষ সহজেই আত্মসমর্পণ করে। দরবেশ দীন দরিদ্র আস্তানা গুলিতে শাস্ত্রের ব্যর্থও নিরস আলোচনা হয়নি, নিত্য নবীন সংস্কারের উদ্ভব ঘটেনি,—এরা প্রাণের লীলায়, আত্মার স্বাভাবিক স্ফুরণে ভরপুর। তাই, বিজেতা ও বিজিত আত্মার সন্ধান করতে গিয়ে এই পীঠস্থান গুলিতে সম্মিলিত হয়েছিল, পরস্পরকে চিনে নিতে পেরেছিল। এই আস্তানা গুলিই উভয়ের মিলন মন্দিরে পরিণত হয়েছিল, তাই আমার নিকট অতি প্রিয় ও পুণ্যময়। বঙ্গীয় সুফী প্রভাবের ধারার বিষয় আলোচনা করতে গেলে, এবং তার স্বরূপ বুঝতে হলে, ইসলামে সুফী মতবাদের উদ্ভব ও তার ধারাবাহিক ইতিহাসের সঙ্গে যৎসামান্য পরিচয় না ঘটলে, একে বুঝবার পক্ষে, সকলের না হোক অনেকের বিপদে পড়বার সম্ভাবনা খুব বেশী। বঙ্গের সুফীমতবাদ এ দেশীয় কোন সামগ্রী নয়, অথবা কোন নূতন দার্শনিক মতবাদও নয়। বঙ্গদেশে আসবার বহু পূর্বে খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর নবধর্মালোকিত ও দিগ্বিজয়ী আরবদের মধ্যেই এর জন্ম ও পরবর্তীকালে পারস্য, বোখারো ও সমরকন্দ প্রভৃতি মুসলমান দেশেই এর বন্ধন, পরিপুষ্টি ও পরিণতি লাভ ঘটে। বহুদিন পরে আরব, পারস্য প্রভৃতি দেশের এই নব মতবাদের একটি শাখা ধারা দরবেশ নামধেয় কতকগুলি মুসলমান সাধু ও সিদ্ধ পুরুষের আগমনে বঙ্গে প্রবেশ করেছিল। এই বঙ্গীয় দরবেশ ও সুফীরা পৃথক মতাবলম্বী ব্যক্তির সম্প্রদায় নয়। উভয়ই এক গোষ্ঠীর লোক এবং এক মতাবলম্বী। সুতরাং আদি সুফীমতবাদের সঙ্গে যোগসূত্র ছিন্ন করে এদেরকে দেখতে গেলে তাদের অর্ধেক খানিই দেখা হয়। বঙ্গের সুফী ও তাঁদের মতামতের সঙ্গে ভারতীয় সুফী ও তাঁদের মতামতের সম্বন্ধ আরও ঘনিষ্ঠ ও নিকটতর।

পশ্চিম ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের সঙ্গে বাংলার রাষ্ট্রীয় ইতিহাস যেমন অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত রয়েছে, পশ্চিম ভারতের সুফীদের ইতিহাসও বাঙ্গালী সুফীদের ইতিহাসের সঙ্গে তেমন ভাবে সংশ্লিষ্ট। পশ্চিম ভারতের রাষ্ট্র নায়কগণ যেমন বাংলা দেশের ভাগ্য নিয়ন্তা

ছিলেন, আবার মধ্যে মধ্যে বঙ্গাধিপতিরা যেমন বঙ্গের বাইরেও তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি রেখে গিয়েছেন, বঙ্গীয় সুফীদের ইতিহাসেও তার স্পষ্ট ছাপ রয়ে গিয়েছে। পশ্চিম ভারতীয় সুফীরা অনেকদিন পর্যন্ত বঙ্গীয় সুফীদের চিন্তাধারা ও মতামতে পরিচালিত করেছিলেন। আবার মধ্যে মধ্যে বঙ্গীয় সুফীরাও পশ্চিম ভারতে আপনাদের মতামত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা পেয়েছিলেন। ভারত ও বঙ্গের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের সঙ্গে উভয় দেশের ভাবজগতের ইতিহাসের নিকট সম্বন্ধ নূতন না হলেও আশ্চর্য বটে। সুতরাং পশ্চিম ভারতের ভাব জগতের ইতিহাস হতে বঙ্গের এই ভাব ধারার ইতিহাসকে পৃথক করতে গেলে, বঙ্গীয় ইতিহাসটুকু অসম্পূর্ণই রয়ে যায়। এখন বেশ দেখা যাচ্ছে, আরবের মূল সুফীমতবাদ ও তার ভারতীয় ইতিহাস হতে বঙ্গীয় সুফীদের ইতিহাসকে পৃথকভাবে দেখতে গেলে, তাকে প্রকৃতরূপে বুঝাই হবে না। আরব ও ভারতীয় সুফীমত এদেশে এসে অনেক ক্ষেত্রে নূতনরূপ ও রস গ্রহণ করেছে সত্য, কিন্তু মূলের সঙ্গে একেবারে যোগ ছিন্ন করে এ বাঁচে নি। বঙ্গীয় সুফীবাদের বচন, প্রবচন বা উপদেশ সম্বলিত কোন পুস্তক পুস্তিকা এযাবৎ আমাদের হস্ত গত হয় নি, "যোগ শাস্ত্র" "জ্ঞানসাগর প্রমুখ হস্তলিখিত পুঁথিগুলিতে বঙ্গীয় সুফী বা পীরদের যে চিত্র আমাদের হস্তগত হয় তা এত পরবর্তীকালের চিত্র যে, তা হতে প্রাথমিক যুগের সুফীদের বিষয় কিছু বলা চলে না। ঐগুলি এদেশের শেষ যুগের সুফীবাদের এত শোচনীয় ও করুণ চিত্র অঙ্কিত করেছে যে, সে বিষয় আলোচনা করলে, সুফীমত বঙ্গে এসে কিরূপ অধঃপতন ও অবনতির চরম শীর্ষে ওঠেছিল, তার একটি সুন্দর ইতিহাস রচিত হতে পারে। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত বঙ্গীয় ভাবজগতে পশ্চিম ভারতীয় সুফীরাই সম্রাট ছিলেন। তাঁরাই এতদিন পর্যন্ত এদের চিন্তাধারাকে পরিচালিত করেছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দী হতে ভারতীয় সুফীদের সঙ্গে বঙ্গীয় সুফীদের যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে পড়ায় তাঁরা বিপথগামী হতে থাকেন। সুফীমতবাদ বঙ্গে পৌঁছাবার পর, কোন নূতন রূপ ও রস গ্রহণ করেছিল, সে বিষয় আমরা সম্যক অবগত না হলেও, এই ক্ষুদ্র ইতিহাসটুকু হতে দেখা যাচ্ছে

আরবদের মধ্যে উদ্ভূত প্রাথমিক যুগের কৃচ্ছ্রতা ও সাধনামূলক সুফীমত বাদ ধীরে ধীরে সংসার বিতস্পৃহতা ও পূর্ণ বৈরাগ্যের দিকে অগ্রসর হয়ে যখন খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে পারস্যে পৌঁছে, বিশ্ব ব্রহ্মাবাদ অথবা 'সর্বং খলিরং ব্রহ্ম বাদের দিকে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছিল, প্রকৃত পক্ষে তা না হলেও, ঠিক সেই সময়ের পরবর্তী সুফীমতবাদের একটি ধারা ভারতে প্রবেশ করে, এবং অনতি বিলম্বেই ভারতের পশ্চিম প্রান্তকে বিধৌত ও বিপ্লবিত করে তারই একটি শাখা-প্রবাহ চিরদিনের ভাব-প্রবণ বাংলাকে প্লাবিত করবার জন্য এদেশে এসে উপস্থিত হয়। এই ক্ষেত্রে মূল উৎস ও ভারতীয় সুফীদের ইতিহাস হতে বঙ্গীয় সুফীদের ইতিহাস একরূপ অচ্ছেদ্য। কোন প্রামাণিক ইতিহাসের অভাবে, বঙ্গদেশে কোন সময় হতে সর্বপ্রথম সুফী প্রভাব পড়তে আরম্ভ হয়, তা নিশ্চিত রূপে বলা কঠিন। খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হতেই ভারতে সুফী প্রভাব পড়তে আরম্ভ করে। ভারতে তখনও স্থায়ীভাবে মুসলমান কর্তৃক বিজিত হয়নি, অতএব একভাবে বলতে পারা যায়, মুসলমান বিজয়ের পূর্ব হতেই ভারতে সুফী প্রভাব পড়েছিল, এবং মুসলমান বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে তা ভারতের নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। তা হলে, কি এই সময় হতেই ভারতের পশ্চিম প্রান্তের একটি ভাবতরঙ্গ বঙ্গদেশে ও এসে পড়েছিল; প্রায় নয় শতাব্দী পর, আজ এ পত্রের উত্তর দেবে কে— ইতিহাস যে এ বিষয়ে নীরব। খীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই বঙ্গদেশ—মুসলমান কর্তৃক বিজিত হয়েছিল। তা হলে কি বঙ্গে মুসলমান অধিকার সুচনার সঙ্গে সঙ্গেই এদেশে সুফীরা আগমন করেছিলেন? পশ্চাল্লিখিত প্রমাণ বলীর ওপর নির্ভর করে, আমরা জোরের সঙ্গে বলতে পারি, এ সময়ের পূর্ব হতেই বঙ্গে সুফী প্রভাব পড়তে থাকে। তবে বঙ্গে সুফী প্রভাবের প্রথম ও প্রকৃত সময় কখন? এ পর্যন্ত যত বঙ্গীয় সুফীর বিবরণ ও ইতিহাস আমরা উদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছি, তার মধ্যে বাবা আদমই সবচেয়ে প্রাচীন বলে মনে হয়। তিনি বিক্রমপুরে মহারাজ বল্লাল সেনের (১১১৯ খ্রীঃ মৃত্যু) সঙ্গে যুদ্ধ করে 'শহীদ' (ধর্ম যুদ্ধে নিহত) হয়ে ছিলেন। তাঁর পর ময়মন সিংহের শাহ

মোহাম্মদ সুলতান রুমীর (১০৫৩ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গে আগমন) নাম উল্লেখ যোগ্য। কিন্তু এই উভয় সাধকের সঙ্গে ভারতীয় সুফীদের কোন সম্বন্ধ ছিল কিনা তা জানা যায় না। এরাই বঙ্গে সুফী প্রভাব আণয়নের অগ্রদূত ছিলেন বলে মনে হয়। এদের পর শেখ জালাউদ্দীন তবরীযীর (মৃত্যু ১২২৫ খ্রীঃ) আগমনের পর হতেই বঙ্গে বন্যা প্রবাহের ন্যায় সুফী প্রভাব পড়তে আরম্ভ হয়। এই সকল বিষয় বিবেচনা করে আমরা মনে করি, খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীই বঙ্গে সুফী প্রভাবের প্রথম আগমনের প্রকৃত সময়। সুফীদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে হিন্দু রাজ্যের পতন হয়। বাংলায় ও তার পুনরাভিনয় হয়েছিল। এই দিক হতে বিচার করতে গেলে বলতে হয়, সুফীরাই ভারত, বঙ্গ ও আসামে হিন্দু রাজ্য পতন ও মুসলমান বিজয়ের অগ্রদূত স্বরূপ ছিলেন। এখন ইতিহাসকে সময় ও স্থান এই দুই হিসাবেই ভাগ করা যেতে পারে। সময় হিসাবে ভাগ করতে গেলে, অনেক সময় গোলে পড়বার সম্ভাবনা আছে। বিশেষতঃ অনেক বঙ্গীয় সুফীদের সময় সম্বন্ধে আমরাও নিসন্দেহ নই। তাই তাঁদেরকে সময় হিসাবে ভাগ করি নি। তাঁদেরকে কর্মক্ষেত্র হিসাবে ভাগ করাই সব চেয়ে সুবিধাজনক ও সমীচীন বলে মনে হয়। বঙ্গের এক একটি ভাগে তাঁদের এক একটি কেন্দ্র গড়ে ওঠেছিল এই কেন্দ্রগুলি আবার কোন সংঘবদ্ধ দলবিশেষের দ্বারা গড়ে ওঠে নি। বিভিন্ন সময়ে পৃথক পৃথক সাধক এক এক জায়গায় ধর্ম প্রচার ও সাধনা করে গিয়েছিল। কিন্তু বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তি এদেশে আগমন করলেও, তাঁরা দেশের নানা স্থানে বিচ্ছিন্ন হয়ে ছড়িয়ে পড়েন নি। যে সকল স্থানে প্রাচীন কাল হতে রাজধানী, ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্র অথবা খুবই জন-সমাকীর্ণ ছিল, প্রায়ই ঐ সকল স্থানকেই, সাধারণতঃ নিজেদের প্রচার কেন্দ্ররূপে মনোনীত করেছিলেন। তাঁরা কখনও বন, জঙ্গল বা জন-বিরল স্থানে গিয়ে বাস করেছিলেন বলে মনে হয় না। প্রধানতঃ মানুষের সঙ্গেই যাঁদের সম্বন্ধ ছিল, তাঁরা জনহীন স্থানে গিয়ে বাস করবেনই বা কেন? তাই বঙ্গের প্রাচীন জনাকীর্ণ স্থানগুলিতেই তাঁরা আগমন করেছিলেন। কারো সঙ্গে কারো বিশেষ কোন সম্পর্ক ছিল

বলে এ যাবৎ তার কোন প্রমাণ পেতে না পারলেও চতুর্দশ শতাব্দীর পর হতে, প্রত্যেক দরবেশ ফকিরের এক বা বহু বিশিষ্ট খলীফা বা প্রতিনিধি ছিলেন। এক মূল সাধকের মৃত্যুর পর বা পূর্ব হতে, গুরুর উপদেশ মত দেশের নানাস্থানে প্রচার করে বেড়াতেন। এই হিসাবে, প্রত্যেক বিশিষ্ট দরবেশ এক একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কেন্দ্রে পরিণত হয়ে পড়তেন। রাঢ় কেন্দ্রের সাধকদের বিষয় পাঠকালে এ বিষয়টি পরিষ্কার ভাবে ধরা পড়বে। প্রত্যেক বিশিষ্ট ও খ্যাতনামা সাধকদের মধ্যে পরস্পর কোন সম্বন্ধ থাকুক বা না থাকুক, এরা একের পর একজন করে বাংলার জনবহুল স্থানগুলিতে আগমন করতে থাকেন। এদের পর পর আগমন. বেশ একটি সূত্রের সৃষ্টি করেছিল। এ সূত্র আবার কতকগুলি স্থান নিয়ে সৃষ্ট হয়। এই সকল স্থানকেই আমরা এক একটি কেন্দ্র বলে নাম করলাম। বাংলার নিম্নলিখিত চারটি কেন্দ্রেই মুসলমান দরবেশগণ অধিক আগমন করেছিলেন।

১। বরেন্দ্র কেন্দ্র—মালদহ, দিনাজপুর, রংপুর, পূর্ণিয়া, রাজমহল তার চতুঃস্পর্শবর্তী স্থান ২। রাঢ় কেন্দ্র—বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া ও হুগলী ৩। বঙ্গকেন্দ্র—পাবনা, বগুড়া, রাজশাহী ময়মন সিংহ, ঢাকা, ফরীদপুর ও বাখর গঞ্জ ৪। চট্টলকেন্দ্র—চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা ও নোয়াখালী, যদিও আমরা বঙ্গের প্রাচীন বিভাগ অনুযায়ী কেন্দ্রগুলির নাম দিয়েছি। এতে কেউ যেন মনে না করেন, তারদ্বারা আমরা ঐ কেন্দ্রগুলির প্রাচীন ভৌগোলিক সংস্থান নির্দেশ করছি। কেন্দ্র ভুক্ত বর্তমান স্থানগুলির নাম দেখলেই বুঝা যাবে, আমরা প্রাচীন ভূগোল মোটেই অনুসরণ করিনি। পূর্ণিয়া ও রাজমহল মুসলমান রাজত্বের সময় বঙ্গদেশ ভুক্ত ছিল বলে তাকে বরেন্দ্র কেন্দ্র ভুক্ত করে নেওয়া হল। প্রত্যেক কেন্দ্রের মূল কয়েকটি স্থান হতেই, তাদের চতুঃপার্শ্ববর্তী স্থান গুলিতেই দরবেশগণ প্রভাব বিস্তার করে ছিলেন। তাই যে কেন্দ্রের সাধকদের প্রভাব যে যে স্থানে পড়েছিল, তা প্রাচীন ভূগোলের সীমায় পড়ুক বা না পড়ুক আমরা নিজ সুবিধার জন্য ঐ ঐ স্থানকে, এক কেন্দ্র ভুক্ত করে নিয়েছি। বঙ্গের রাষ্ট্রীয় ইতিহাস হতে এর যতটুকু উপাদান

পেয়েছি, তা যথাসম্ভব গ্রহণ করেছি। এ উপাদান এত সামান্য যে এর দ্বারা কোন ধারাবাহিক ইতিহাস রচিত হতে পারে না। তাই বাধ্য হয়েই অনেক স্থলে লৌকিক প্রবাদ গ্রহণ করে তার একটি ঐতিহাসিক মূল্য নির্ধারণে যথাসম্ভব চেষ্টা করেছি। সে চেষ্টা অনেক ক্ষেত্রে যে ব্যর্থ হয় নি, তা আমরা জোর করে বলতে পারি না। যতদিন আরও নূতন তথ্য ও নবীন সত্যের আবিষ্কার না হয়, ততদিন এই দরবেশদের সম্বন্ধে আমরা বর্তমানে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি, এর বেশী বলা যায় না। নূতন তথ্য আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বর্তমান সিদ্ধান্ত গুলি মিথ্যা বলে প্রমাণিত হলে, আমরা মত পরিবর্তন করতে কখনও দ্বিধাবোধ করব না। আশাকরি, দেশে এ বিষয় নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা চলবে। আমরা গভীর অরণ্যে সরল পথ আবিষ্কার করতে গিয়ে যদি বিপথগামীও হয়ে থাকি, তজ্জন্য আমাদের অনুবর্তীরা ক্ষমা করবেন বলে ভরসা করেই অনন্য মনে ও সাহস করে অগ্রসর হয়েছি।

॥ ২ ॥

স্থফী মতবাদ মানবের স্বাভাবিক চিন্তাধারা ও মর্মমুখ জ্ঞানের একটি স্ফুরণ রূপ। মানুষের বাহ্যিক জ্ঞান-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মর্মমুখ চৈতন্যের বিকাশও স্বাভাবিক। মানুষের মন চিরদিন অজানাকে জানতে চেয়েছে ও চাইবে, অজ্ঞাত কে পরিজ্ঞাত হবার সন্ধান খুঁজেছে ও খুঁজবে, অনুপলব্ধকে উপলব্ধি করবার প্রয়াস পেয়েছে ও পাবে; মানুষের মন যা পায় প্রায়ই তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকেনা, যা চর্ম চক্ষে দেখে তার পশ্চাতে অদৃশ্য কি রয়েছে, তাকে জ্ঞানের চক্ষে, প্রাণের নয়ণে, মর্মের দৃষ্টিতে দেখবার ও বোঝবার প্রয়াস পায়। এই যে অজানাকে জানবার, অজ্ঞাতকে জ্ঞাত হবার, অনুপলব্ধকে উপলব্ধি করবার ফল্গু ধারার মত অন্তঃসলিলা অথচ চির-ক্রিয়াশীল অনন্ত প্রয়াস, তা মানবের পক্ষে চিরন্তন, শাশ্বত, সত্য ও সাক্ষী; মানুষের ইতিহাস তার অতি নগন্য অংশকে নিয়েই গঠিত হয়েছে। স্থফীমতবাদ উদ্ভবের মূলেও ঠিক এমনিই একটি তীব্র প্রেরণার অনুভূতির সন্ধান আমরা পেয়েছি। একটু চিন্তা করলেই আমরা বেশ দেখতে পাই, প্রত্যেক নবীন ধর্ম

উদ্ভবের মূলে দুটি বিষয়ই মুখ্যতঃ রয়েছে,—একটি মানুষকে মর্ম মুখ করে অজানার সন্ধান বলে দেওয়ার প্রয়াস, আর অন্যটি তাকে কর্ম মুখ করে সভ্যতা ও জ্ঞানের দিকে পরিচালিত করবার প্রচেষ্টা। পরে যখন নব প্রচারিত ধর্ম, জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তখন হয়ত এই দুটির কোন একটি ধর্মানুবর্তীদের মধ্যে প্রবল হয়ে ওঠে এবং ধীরে ধীরে হয়ত একটি অপরটিকে গলাটিপে মেরে ফেলে। প্রত্যেক ধর্ম-প্রবর্তকের জীবনের প্রতি একটু মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করলেই এই দুটি বিষয় অনায়াসেই ধরা পড়ে। হযরত মোহাম্মদও এমনই একটি নূতন ধর্ম প্রতিষ্ঠা ও প্রচার করেছিলেন, সুতরাং তাঁর প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত ধর্ম ইসলামেও এই দুটি দিক ছিল। তাঁর পর যে চারজন মহাপুরুষ তাঁর শূন্যপদ পূর্ণ করেছিলেন, মুসলিম জগতে অদ্যাবধি তাঁরা "খলীফা-ই রাশে-দীন" বা "আদর্শ প্রতিনিধি" নামে সম্মান লাভ করে থাকেন। এর একমাত্র কারণ, ধর্ম প্রবর্তক হযরত মোহাম্মদের উপযুক্ত দুটি আদর্শের অনেক খানি তাঁদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু ইসলাম ধর্ম, এই মহাপুরুষ চতুষ্টয়ের পর হতে যখন মর্মের দিক হতে কর্মের (এই "কর্মের" দ্বারা বৌদ্ধধর্মের "কর্মবাদ" বুঝান আমাদের উদ্দেশ্য নয়, অন্তরে তীব্র অনুভূতি থাকুক বা না থাকুক, সংস্কার ও বিশ্বাস বশে ধর্ম প্রচার, রাজ্য বিস্তার, জাগতিক সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধির দ্বারা নূতন সভ্যতার পত্তন প্রভৃতি কাজ বা চেষ্টাকে বোঝানই আমাদের উদ্দেশ্য) দিকে দ্রুত গতিতে অগ্রসর হতে লাগল, তখন এমন একদল মুসলমান অবশ্য তাঁদের সংখ্যা অতি অল্প ও নগণ্য ছিল বার হয়ে পড়লেন, যাঁরা নীরবে ইসলামের কর্মদিকের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হলেন। সাধারণতঃ ধর্মে, কর্মের দিকে একটা ঝোক পড়ল যে অবস্থা এসে পড়া অবশ্যম্ভাবী, ইসলাম ও তার হাত হতে রক্ষ পায়নি। একদিকে ইসলামী শিক্ষা, দীক্ষা ও সভ্যতা যেমন বেড়ে চলল, তেমনিই অন্যদিকে মুসলমানদের মধ্যে বিলাসিতা অমিতাচার, সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য ও ঐহিকতা দিন দিন বৃদ্ধি পেতে লাগল—মর্মের দিক ধীরে ধীরে নির্বানোম্মুখ প্রদীপের মত মরণের পথে ছুটে চলল। এই নির্বানোম্মুখ প্রদীপের শেষ-শিখা টুকুকেই সুফী মতবাদের মূলে দেখতে

পাই। কর্মের পথে যখন বিশেষরূপে বাড়াবাড়ি চলল মর্মের পথেও একটু বাড়াবাড়ি চলতে লাগল, —একটি নূতন প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হল, নবীন সংঘর্ষ উপস্থিত হল। ইসলামে এই প্রতিক্রিয়া ও সংঘর্ষের ফলেই অভিনব সুফী মতবাদের উদ্ভব হল। একথা একটু পরেই, আরও একটু পরিষ্কার ভাবে বলতে চেষ্টা করব। এখানে প্রসঙ্গক্রমে আরও একটি কথা বলে রাখা আবশ্যক। পৃথিবীতে যুগে যুগে মর্মমুখ সাধুপুরুষের আবির্ভাব ঘটেছে, তাঁরা সকলেই অজানার সন্ধানে ছুটে চলে ছিলেন, অজ্ঞাতকে পরিজ্ঞাত করতে চেষ্টা করেছিলেন। সুফীগণও তাই করেছেন। তবে এই সমুদয় সাধুপুরুষ ও সুফীদের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? সে কি শুধু আরবী নামটির মধ্যে পর্যবসিত, না আরও কিছু আছে? যদিও উভয়ের অভীপ্সিত স্থান এক, তবু এই দুই শ্রেণীর সাধুর মধ্যে একটি পরিষ্কার বিভাজ্য রেখা অঙ্কিত রয়েছে। যখন উভয় শ্রেণী শেষ সীমায় পৌছে পরমাত্মার প্রকৃত সন্ধান লাভ করে এবং তার সঙ্গে মিলে যায়। (অর্থাৎ সুফীদের 'ফনার' অবস্থায় পৌছে) হয়ত তখন তাদের কোন পার্থক্যই থকে না; কিন্তু তার পূর্বে উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট বিভিন্নতা থেকে যায়। এই বিভিন্নতাটুকু হল মার্গজ। সুফীরা একশ্রেণীর মার্গ অবলম্বন করে অভীপ্সিত স্থানের দিকে চলতে থাকেন, আর অপরাপর সাধু-সন্ন্যাসীরা অন্য শ্রেণীর মার্গ ধরে অগ্রসর হন। একটু উদার ভাবে দেখতে গেলে সকল ধর্মের শেষ যেমন কেবল একটি কেন্দ্রে গিয়ে মিশেছে, সুফী ও অপর সাধকদের মার্গও ঠিক সেই এককেন্দ্রে গিয়ে মিশেছে। পরমাত্মাকে কেন্দ্র করে একটি বৃত্ত অংকিত করলে পরিধি হতে যত ব্যাসার্ধই টানা যাক, তা যেমন প্রত্যেকটিই অপরটি হতে পৃথক হলেও একই কেন্দ্রে গিয়ে মিশে যায়, তেমনই পৃথিবীর যাবতীয় ব্রহ্মাবাদীরা যে পথই অবলম্বন করুন পরিশেষে তা নির্দিষ্ট কেন্দ্রে গিয়েই মিশে যায়। পৃথিবীর যাবতীয় সাধক ও সুফীদের সম্বন্ধেও একথা নিতান্তই সত্য। প্রত্যেক ব্যাসার্ধের মত তাঁদের মার্গ পৃথক হলেও মূল কেন্দ্র এক। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত শেষ সীমায় না পৌছান, ততক্ষণ এক মার্গগামীদের সঙ্গে মিশতে

পারেন না। 'সুফীরা ইসলামের অন্তর্গত থেকে, তার নির্দেশিত মার্গ অবলম্বন করেই অগ্রসর হন, তাই তারা সুফী নামে খ্যাত; নতুবা সকল সাধুর সাধনার মূলে ঐ অনির্দিষ্ট ও অজানিত কেন্দ্রের সন্ধান লুকোন রয়েছে।

এখন দেখা যাবে, সুফীমতবাদের উদ্ভবের মূলে ইসলামের মর্মমুখী শক্তিকে কর্মমুখী শক্তি গ্রাস করবার বিপুল প্রচেষ্টায়, পর শক্তির বিরুদ্ধে পূর্ব শক্তির চৈতন্য প্রাপ্তি, কতটুকু নিহিত রয়েছে। সুতরাং যে জাগরণ বা চৈতন্যপ্রাপ্তি, বিলাসিতা, আড়ম্বর ও সংসার আসক্তির সংঘাতে লাভ করা যায়। তাতে যে এই দোষত্রুটিগুলির কোনটিই পাওয়া যাবে না, তা একান্তই স্বাভাবিক। প্রাথমিক যুগের সুফীদের জীবনই এর একমাত্র প্রমাণ। তারা হযরত মোহাম্মদ ও তদীয় আদর্শ প্রতিনিধি চতুষ্টয়ের সরল, সহজ ও অনাসক্ত জীবনযাত্রাকে আদর্শ করে, আত্মজীবন পরিচালিত করেছিলেন। তাঁদের জীবন পবিত্রতা ও ভগবৎ সাধনার জীবন্ত ও জ্বলন্ত মূর্তি। তাঁরা বাঞ্ছিতকে হৃদয়ের নিবিড়তম অন্তস্থলে অনুভব করতেন এবং তাঁর সঙ্গে শুভ-মিলনের জন্য যত প্রকার কষ্ট সহ্য করতে হয়, অম্লানবদনে, আনন্দপ্লুত মনে তা সহ্য করে গিয়েছেন।

প্রাথমিক যুগের সাধনা প্রধান সুফীদের মধ্যে হাসান বাসরী (মৃত্যু—৭২৮ খ্রীষ্টাব্দে), বিবি রাবিয়া (মৃঃ—৭৫৩ খ্রীঃ) ইব্রাহীম-ইবনে অদহম (মৃঃ—৭৭৭ খ্রীঃ), আবু হাশিম (মৃঃ—৭৭৭ খ্রীঃ) দাউদ ত্বায়ী (মৃঃ—৭৮১ খ্রীঃ) মারূফ করখী (মৃঃ—৮১৫ খ্রীঃ) প্রভৃতির নাম নিঃসন্দেহে উল্লেখ করা যায়। এই সূফীগণের নাম ইসলাম জগতে এমন প্রসিদ্ধ যে, উচ্চারিত হওয়া মাত্রই সকল মতাবলম্বীদের মানস-পটে একটি পবিত্রতা, সারল্য ও নিস্পৃহতার ছবি, কঠোর সাধনা ও তপস্যার মূর্তি নিয়ে অমনিই ভেসে ওঠে। তাঁদের জীবনী ও বাণী পাঠ করলে দেখা যায়, ইসলামের প্রাথমিক যুগে মর্মমুখী প্রতিভা কেমন ভাবে কোন মার্গ অবলম্বন করে বিকশিত হয়েছিল। তাঁর বর্ণনা ও বিশ্লেষণের স্থান এখানে কোথায়? তাঁরা সকলেই আরববাসী

ছিলেন। ইসলামী আওতায়, ইসলাম নির্দেশিত মার্গ অবলম্বন করেই, তাঁরা 'ত্বরীকত' বা ইসলামের মর্মমুখ দিক গ্রহণ করে চিরবাঞ্ছিতের সঙ্গে শুভ মিলনোদ্দেশে ছুটে চলেছিলেন। কর্মমুখ দিকের সংঘাতে এই মর্মমুখ দিক চৈতন্য লাভ করেছিল বলে, এই সাধকদের কারো কারো মধ্যে মানসিক সমতা রক্ষিত হয়নি। তাঁরা একটু অধিক ভাবে মর্মমুখ হয়ে পড়েছিলেন; কারণ বিশুদ্ধ শক্তির বিপক্ষে দাঁড়াতে হলে, এর বিপক্ষে প্রতিক্রিয়া দেখা দেওয়া নিতান্তই স্বাভাবিক। কিন্তু খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত এই সুফী সাধকদের মধ্যে কোনরূপ ভাবের প্রাবল্য বা উচ্ছৃঙ্খল চিন্তার বিকাশ দেখতে পাই না—এটাই হল প্রাথমিক যুগের সুফীদের বিশেষত্ব!

॥ ৩ ॥

এখানে একটি কথা স্মরণ রাখা আবশ্যক, আরবের সুফী আন্দোলন কোন সংঘবদ্ধ আন্দোলন ছিল না। সুফীরা পূর্ব হতে কোন একটি বিশিষ্ট মত খাড়া করে তার প্রচার করেন নি। এটা অনেকটা ব্যক্তিগত আন্দোলন। এক একজন সুফী বাঞ্ছিতকে লাভ করতে গিয়ে, "ত্বরীকত" বা ইসলামের মর্মমুখ দিককে, স্বীয় স্বীয় ধারণা ও মানসিক ক্ষমতানুযায়ী যতটুকু উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, তিনি ততটুকু গ্রহণ করে স্বীয় বিশিষ্ট পদ্ধতির অনুসরণ পূর্বক মূলকেন্দ্রের দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন। এইজন্য প্রত্যেক খ্যাতনামা ও বিশিষ্ট সুফীদের পদ্ধতিতে এক একটি বৈশিষ্ট্য রয়ে গিয়েছে। খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর প্রথম ভাগ হতে, এই সুফী সাধকদের মধ্যে বিষয় অনাসক্তির দিকটি অধিক ভাবে দেখা দিতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে বৈরাগ্য ও ভাবের প্রাবল্য আনুষঙ্গিক ভাবে এসে পড়ল। ইসলাম কখনও বৈরাগ্য ও ভাবাবেগের দিকটিকে অতিরিক্ত প্রশ্রয় দান করেনি; প্রাথমিক যুগের সুফীদের মধ্যে তা বেশ দেখতে পাওয়া যায়। কাজেই দেখা যাচ্ছে, সুফীমতবাদ ধীরে ধীরে ইসলাম নির্দেশিত মার্গের মধ্যে থেকেও আপনার অধিকার সীমা বাড়িয়ে নিচ্ছিল। তা নিতান্তই স্বাভাবিক; কেননা এ সাধারণতঃ ব্যক্তিগত আন্দোলন। কোন ব্যক্তিগত

আন্দোলনই বহুদিন ধরে একটি নির্দিষ্ট মার্গ অবলম্বন করে চলতে পারে না। এই সময় সুফী মতবাদ আরবের নানা স্থানে ধীরে ধীরে বিস্তৃত হয়ে পড়ছিল। প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ সুফীরা তার ব্যাখ্যাও প্রচার করতে লেগে গেলেন। তাই আমরা দেখতে পাই, নবম শতাব্দীর শেষভাগে যূন-নূ-ন মিস্‌রী (মৃঃ—৮৬০ খ্রীঃ) সুফী মতবাদের শৃংখলা-বিধান ও ব্যাখ্যা করছেন। অশ্‌-শিবলী খুরাসানী (মৃঃ ৯৪৬ খ্রীঃ) মসজিদের মিম্বরে" (বেদীতে) দাঁড়িয়ে প্রকাশ্য সভায় সুফী মতবাদ প্রচার করছেন। জুনাইদ বাগদাদী (মৃঃ—৯১০ খ্রীঃ) নিবিষ্ট মনে তাকে ধারাবাহিক ভাবে লিপিবদ্ধ করে যাচ্ছেন। এইরূপেই সুফী মতবাদ খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর প্রথম ভাগ হতে দশম শতাব্দীর প্রারম্ভ-কালের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করতে সমর্থ হয়। ইতঃ-পূর্বে এটি বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত ও বিশ্বস্ত ভাবে সুফীদের মধ্যে সময় সময় ফুটে উঠলেও বিশেষভাবে শৃংখলাবদ্ধ হয়ে একটি মতবাদ রূপে দাঁড়াতে পারত না। এখন প্রধানতঃ যূন-নূন মিস্‌রীর চেষ্টায় এই চিন্তাধারাটি একটি নির্দিষ্ট রূপ পরিগ্রহণ করে জগতের সম্মুখে মাথা তুলে দাঁড়াল। ধর্মের বাহ্যিক আচার ব্যবহার ও নিয়ম-কানুনাদি ব্যতীত হযরত মোহাম্মদের নিকট একটি গুপ্তজ্ঞানের দিকও ছিল। সমাজ, রাষ্ট্র ও নীতির কথা তিনি প্রচার করে গেলেও এই গুপ্তজ্ঞানের কথা তিনি একেবারেই লুপ্ত রেখে যাননি। কেননা কোরআন শরীফেও তার উল্লেখ রয়েছে। বাস্তবিকই কোরআনে এমন কতকগুলি "আয়াত" (শ্লোক) রয়েছে, যা চিন্তাশীল মানুষকে স্বতঃই মর্মবাদী করে তোলে। প্রকৃতপক্ষে দেখতে গেলে সুফীমতবাদ এই শ্লোকগুলিকেই কেন্দ্র করে হযরতের মৃত্যুর পর হতে ন্যূনাধিক দু'শত বছরের মধ্যেই, ধীরে ধীরে রূপ গ্রহণ করেছিল। সুতরাং সুফী মতবাদের মূল সূত্রগুলি বলবার পূর্বে এই শ্লোকমালার মধ্যে অন্ততঃ প্রধান কয়েকটির সঙ্গে পাঠকের সাক্ষাৎ পরিচয় করে দেওয়া আবশ্যক। তার দ্বারা সুফীমতবাদের গোড়ার কথার সঙ্গে পাঠকের পরিচয় ঘটবে। সুফীরা বলেন, গুপ্তজ্ঞান কোরআন শরীফের লৌকিক শিক্ষা হতে

পৃথক বস্তু ; এই কথার স্বপক্ষে তাঁরা কোরআনের এই শ্লোকের নির্দেশ করেন,—কেননা, আমি তোমাদের নিকট তোমাদের মধ্য হতে একজন প্রেরিত পুরুষ পাঠিয়েছি ; তিনি আমার সংবাদ (মতান্তরে নিদর্শন, শ্লোকমালা,) তোমাদেরকে পড়ে শুনিয়ে থাকেন, তোমাদেরকে পবিত্র করে থাকেন এবং যা তোমরা (পূর্বে) জানতে না তা (ও) শিক্ষাদান করেন।"

(১) তাঁরা বলে থাকেন, কোরআন শরীফে এই যে গুপ্তজ্ঞানের (হিকমাহ্) কথা বলা হয়েছে, তা কোরআনের লৌকিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা তা যদি অন্তর্ভুক্ত হত, তবে "হিকমাহ্" (গুপ্তজ্ঞান) শব্দটি এই শ্লোকে অতিরিক্ত হয়ে পড়ত। এখানে "কিতাব" (কোরআন) শব্দের পার্শ্বেই "হিকমাহ্" শব্দ ব্যবহারের কোন আবশ্যকতাই থাকত না। তাঁরা এই প্রসঙ্গে কোরআনের আরও একটি শ্লোক নির্দেশ করেন ; তা এই, "(তাঁরাই মুসলমান) যাঁরা অদৃষ্ট বস্তুতে (গয়ব) বিশ্বাস স্থাপন করেন, এবং নামায আদায় (অর্থাৎ পালন) করেন, এবং আমরা যা তাঁদেরকে দান করেছি তা সৎপথে ব্যয় করেন।"

(২) এখানে প্রথমেই প্রশ্ন ওঠে অদৃষ্ট বস্তুর রূপ কি, এবং তা কোথায় ? সুফীরা প্রথম প্রশ্নের উত্তরে কোরআন শরীফের এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করেন,—"আল্লাহ্ স্বর্গ ও মর্তের আলোক ("নূর"-স্বরূপ)"।

(৩) দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে তারা বলে থাকেন, এই পৃথিবীতে এবং তোমাদের মধ্যে (মতান্তরে তোমাদের হৃদয়ের মধ্যে), বিশ্বাস-কারীদের জন্য নিদর্শন মালা বিরাজিত,—তোমরা কি তা দেখতে পারছ না।"

(৪) এই শ্লোকটিকে আরও সুদৃঢ় করবার জন্য তাঁরা এই শ্লোকটির উল্লেখ করেন—"আমরা তার (মানুষের) গ্রীবাস্থিত ধমণী হতেও নিকটবর্তী।

(৫) কোরআন শরীফের এই শ্লোকগুলিকেই প্রধানতঃ কেন্দ্র

করে সুফীমতবাদ গড়ে উঠেছিল! প্রকৃত প্রস্তাবে বলতে গেলে পরবর্তী সুফীরা এই শ্লোকমালার ব্যাখ্যা ও অতিরিক্ত আলোচনা করতে গিয়েই উত্তরকালে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। সে ইতিহাস একটু পরেই লেখা হচ্ছে। এই শ্লোকগুলি হতেই সুফীরা "অদৃষ্ট বস্তুর" (গয়ব) বা বাঞ্ছিতের সঙ্গে মিলনের বা তার মধ্যে লীন (ফনাফীললাহ) হয়ে যাওয়ার পূর্বে, প্রধানতঃ এই চারটি অবস্থার ভেতর দিয়ে যেতে হয় বলে মত প্রকাশ করে থাকেন :—

(১) ঈমান বা অদৃষ্ট বস্তুতে বিশ্বাস।

(২) তলব বা অদৃষ্ট বস্তুর অনুসন্ধান।

(৩) "ইরফান" বা অদৃষ্ট বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ।

(৪) ফনা-ফীললাহ বা অদৃষ্ট বস্তুতে বিলীন। প্রথমতঃ সুফীকে "গয়বে" (অদৃষ্ট বস্তুতে) বিশ্বাস,—শুধু বিশ্বাস নয় পূর্ণ বিশ্বাস করতে হবে। এই দৃশ্যমান জগৎ ও বস্তু ব্যতীত তার পশ্চাতে অদৃশ্যমান ও মানবের সাধারণ জ্ঞানের অগোচরে আরও এমন এক জগৎ রয়েছে, যার সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন করতে না পারলে, অথবা যার বিষয় আভাসে ইঙ্গিতে, কি হৃদয়ের প্রেরণা ও অনুভূতির সাহায্যে কিছুই হৃদয়ঙ্গম করতে সম্ভব না হলে, মানবের সাধারণ জ্ঞান পূর্ণ হয় না। সুতরাং সেই গয়বী জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করতে হলে তার অস্তিত্ব ও নিগূঢ়ত্বের ওপর সর্বপ্রথমে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। এই বিশ্বাস শত প্রলোভনে টলবে না, অমানুষিক দৈহিক কষ্ট স্বীকারে হ্রাস পাবে না—পর্বতের মত শত ঝঞ্ঝাবাত্যায় অচল ও অটল, এবং হিমালয়ের মত অভ্রভেদী ও মহান হবে। দ্বিতীয়তঃ বিশ্বাস যখন স্থাপিত হল, অদৃষ্ট বস্তুর পূর্ণ অস্তিত্ব ও নিগূঢ়ত্ব সম্বন্ধে যখন সন্দেহ ঘুচে গেল, তখন তার জ্ঞানকে পূর্ণ করতে হলে বিশ্বাস্য বস্তুর অনুসন্ধান আবশ্যক।

এটা তার পক্ষ স্বাভাবিক। সে একটি বস্তুতে নিঃসন্দেহ ভাবে বিশ্বাস করে, তাকে প্রাণ দিয়ে উপলব্ধি করে, অথচ—তার বিষয় ও তার গূঢ় রহস্য সম্বন্ধে কিছুই জানতে পারেনা;—তা হলে কি তার

জানবার ইচ্ছা স্বাভাবিক কারণে প্রবল হবেনা? কিন্তু সে এই মরজগতের মানুষ হয়ে কোথায় সেই অদৃশ্য বস্তুর সন্ধান পাবে? সুফীরা বলছেন, দূরে বহুদূরে—বনে জঙ্গলে বা গহ্বরে তাকে সন্ধান করতে হবে না। সে যে তার 'গ্রীবাস্থিত ধমনী হতেও নিকটবর্তী' স্থানে অবস্থান করছে, "এই পৃথিবীতে এবং তার নিজের মধ্যেই" যে তার পরিস্ফুট 'চিহ্ন' বর্তমান রয়েছে। যাঁরা এরূপ ভাবে অদৃষ্ট বস্তুর সন্ধানে বিভোর, সুফীরা তাঁদেরকে কোরআনের কথায় অদৃষ্ট বস্তুর সন্ধান বলে দিচ্ছেন—"তারা কি দেখতে পাচ্ছেন, এই উটগুলি কিরূপে সৃষ্ট হয়েছে, আকাশ কিরূপে ঊর্ধে স্থাপিত হয়েছে; পর্বতগুলিকে কত সুদৃঢ়ভাবে পত্তন করা হয়েছে, এবং এই পৃথিবীকে কিভাবে বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে? সুতরাং আল্লাহ্ কে স্মরণকর, কেননা তুমি একজন স্মারক মাত্র" অতএব বলা হল, এই পরিদৃশ্যমান জগতের সৃষ্টি রহস্যের ভেতর দিয়ে সেই অদৃশ্য বস্তুর ইঙ্গিত ইসারা ও অভিব্যক্তির আভাস বুঝতে হবে। পরবর্তী কালে এই ভাবকে বুঝতে গিয়ে সুফীদের মধ্যে বিশ্বব্রহ্মাবাদ এসে পড়েছিল। তারা সৃষ্টি রহস্যকে বুঝতে গিয়ে যে কোন কারণেই হোক (কোন কোন কারণে তা বলবার স্থান এ নয়) সৃষ্টির সঙ্গে তাকে গোল করে বসেছিলেন এবং পৃথিবীর প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে প্রকৃতির ভেতর আকাশ বাতাসের অভ্যন্তরে, সেই অদৃশ্য বস্তুর সন্ধান খুঁজতে খুঁজতে খেই হারিয়ে ফেলেছিলেন। তাই, অনেকে বিপথগামী হয়ে চিন্তা করেছিলেন, আল্লাহ্ বুঝি এই পরিদৃশ্যমান জগত কে ছাড়িয়ে নন। এর ভেতর দিয়ে তিনি আপনাকে প্রকাশ করেন; সুতরাং এ না হলে বুঝি তাঁর প্রকাশ ও অভিব্যক্তি হয় না—এই গুলিকে বাদ দিয়ে বুঝি তাঁর পৃথক অস্তিত্ব নেই। এই ভ্রান্ত ধারণাই তাঁদেরকে বিশ্বব্রহ্মাবাদী করে তুলেছিল। এইরূপেই সৃষ্টি রহস্যের বিষয় চিন্তা করতে করতে এবং তৎপশ্চাৎ 'অদৃষ্ট' বস্তুর (গয়ব) ধ্যান, ধারণা ও সাধনা করতে করতে সুফীদের মধ্যে এমন এক অবস্থা এসে পড়ে যখন তাঁরা অকস্মাৎ দেখতে পান, সেই একান্ত অভীপ্সিত 'অদৃশ্য বস্তু' এখন আর অদৃশ্য নয়। হঠাৎ তাঁর জ্ঞান নেত্র খুলে যায়.

—তিনি তাকে যাবতীয় সৃষ্টির মধ্যে ও তার বাইরে সর্বত্র বিরাজিত অবস্থায় প্রত্যক্ষ ভাবে দেখতে পান প্রত্যক্ষভাবে বুঝতে পারেন ও প্রত্যক্ষ ভাবে উপলব্ধি করতে পারেন, এটাই 'ইরফান' বা জ্ঞান লাভ বা বোধিলাভের অবস্থা। এখন অদৃশ্য বস্তু প্রত্যক্ষীভূত হয়ে পড়ায় তার বিষয় পূর্ণ-জ্ঞান লাভ করতে সাধকের আর তেমন বিশেষ কোন প্রতিবন্ধক থাকে না বলে এ বিষয়ে পূর্বের মত বেগ পেতে হয় না। তিনি আস্তে আস্তে সম্যক জ্ঞানলাভের পথে ধীর স্থির ও প্রশান্ত মনে অগ্রসর হতে থাকেন। এই ভাবে সুফী যখন ধীরে ধীরে জ্ঞানের চরম সীমায় পৌঁছে যান, তখন অদৃশ্য ও দৃশ্য বস্তুর মধ্যেসৃষ্ট ও স্রষ্টার মধ্যে কোন প্রভেদ আছে কিনা, তা তিনি দেখতে বা বুঝতে পারেন না, তখন কেবল অদৃশ্য বস্তুই তাঁর নিকট মহান, কেবল স্রষ্টাই তাঁর নিকট সমস্ত—তখন তিনি স্রষ্টা ব্যতীত আর কোন বস্তুর অস্তিত্ব আছে কিনা, এমন কি নিজের অস্তিত্ব ও সত্য কিনা, তা পর্যন্ত ভুলে বসেন। এই সময়ে স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে বিভেদ রেখা মুছে যাওয়ায়, সুফী স্বয়ং অদৃষ্ট বস্তুতে বিলীন হয়ে যায়,—অন্ততঃ বিলীন হয়ে গেছেন বলে মনে করেন। এই প্রজ্ঞার অবস্থায় অনেকে "অহং ব্রহ্মা" আমিই ব্রহ্মা, আমিই সত্য আমিই সুন্দর আমিই শাশ্বত, অজয়, অমর অর্থাৎ "আনা-ল-হক্" প্রভৃতি অসাধারণ বাক্য অচৈতন্য অবস্থায় বলে ফেলেন, আবার অনেকে মৃতবৎ সমাধির অবস্থায়ও পড়ে থাকেন। এখানে একটি কথা বলে রাখা ভাল, কোর আন শরীফে বলা হয়েছে, নিশ্চয়ঃ আমরা আল্লাহ্‌র জন্য এবং নিশ্চয় আমরা তাঁর নিকট ফিরে যাব।" এখানে প্রশ্ন ওঠে, মানুষ মৃত্যুর পর তার নিকট ফিরে যেয়ে তাঁর মধ্যে বিলীন হবে ;. না তাঁর কাছে (তাঁর সঙ্গে মিশে না গিয়ে) আর কোথাও অবস্থান করবে ? অর্থাৎ মানবাত্মা বিশ্বাত্মায় বা পরমেশ্বরে বিলীন হবে, না পৃথকভাবে অবস্থান করবে ? সুফীরা বলতে চান, মানুষ ফিরে গিয়ে আল্লাহ্‌র মধ্যেই বিলীন হবে ; তারা যে জীবিত অবস্থায় ও আল্লাহ্‌র মধ্যে বিলীন হতে পারেন বলে স্বীকার করেন। মুসলমান শাস্ত্রবিদগণ এ বিষয়ে কোন মন্তব্য প্রকাশ করতে সাহস না করলেও, তারা যেন

বলতে চান, মানবাত্মা পরমাত্মার সঙ্গে মিশতে পারে না, তার জন্য পৃথক বাসস্থান (সিজ্জীন ও ইল্লীন) রয়েছে, শেষ বিচারের পর তাঁদের মতে, মানবাত্মা স্বর্গ বা নরকে গমন করবে এবং স্বর্গবাসী মানবাত্মা সময় সময় পরমাত্মার দর্শন লাভ করবে, এখানেই তাঁরা সমস্ত বিষয় ছেড়ে দেন, আর অধিক দূর অগ্রসর হতে চান না। সুফীরা এ বিষয়ে শাস্ত্রবিদগণের ওপর টেক্কা দিয়েছেন। তাঁদের মতে যে মানবাত্মা পরমাত্মা হতে উদ্ভূত হয়েছে, তা মুলের সঙ্গে না মিশে পারে না। মানবাত্মা পরমাত্মাতে বিলীন হয়ে অবস্থান করবেই। এরূপভাবে মানবাত্মা পরমাত্মার আত্ম-অস্তিত্ব হারিয়ে মিশে যাওয়াকে কোন কোন সুফী 'বকা বিল্লাহ' আল্লাহ্‌র প্রাপ্তি বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁদের মতে "ফনা ফীল্লাহ্‌" অবস্থায় অহংলোপ আর 'বক্কা বিল্লাহ্‌" অবস্থায় পরমাত্মায় স্থায়ীভাবে বিলীন হওয়া বুঝায়। এই হিসাবে 'ফনা ফীল্লাহ' অবস্থার পরিনতি হল "বকা বিল্লাহ"।

॥ ৪ ॥

যা হোক সুফী মতবাদ যখন যূন-নূন মিস্‌রী (মৃঃ ৮৬০ খ্রীঃ) প্রথম খ্যাতনামা সুফীদের দ্বারা জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করল, তখন ধীরে ধীরে মিশর, পারস্য, বুখারা, সমরকন্দ, তুর্কীস্থান প্রভৃতি দেশে বিস্তৃত হয়ে পড়তে লাগল। প্রত্যেক ধর্ম ও মতবাদের দেশদেশান্তরে বিস্তৃতিতে, সাধারণতঃ তার যে অবস্থা ঘটে, সুফীমতবাদও আর সে অবস্থা হতে রক্ষা পেল না। প্রত্যেক ধর্ম ও মতবাদ প্রথমতঃ এক বা ততোধিক মহাপুরুষের আবির্ভাবে এবং পরপর আরও অনেক চিন্তাশীল ও সংস্কারকে ব্যক্তিদের ধারাবাহিক চিন্তা ধারার সংযোগে বা প্রচারের ফলে, সর্বাঙ্গ সুন্দর বা অনেকখানি পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়ে জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে সমর্থ হয় ; সুতরাং তাদেরকে সুন্দরভাবে জলধারার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। ক্ষীনতোয়া স্রোতস্বিনী যেমন স্বচ্ছ ও নির্মল হয়ে, পর্বত হতে উৎপন্ন হয়ে আরও অসংখ্য জলধারার সংযোগে বৃহদকার ধারণ পূর্বক সাগরের দিকে অগ্রসর হয়, আর এই উপজলধারা গুলির নির্মাল্য, অনাবিলত্ব বা শক্তির ওপর মূলধারার স্বচ্ছতা, অনাবিলত

ও শক্তি নির্ভর করে, ঠিক তেমনিই কোন নূতন ধর্ম বা মতবাদ ও পরবর্তী চিন্তাধারার শক্তি ও সৌন্দর্যকে ছাড়িয়ে যেতে পারে না। নদী যেমন নানা দেশ-বিদেশের ওপর দিয়ে চলতে চলতে সেই দেশের নির্মল বা আবিল জল রাশিকে সঙ্গে নিয়ে অগ্রসর হয়, ঠিক তেমনই কোন নূতন ধর্ম ও ভাবধারা নানাদেশের আচার ব্যবহার ভাব ও চিন্তাধারাকে নব দীক্ষিত নরনারীর ভেতর হতে অলক্ষিতে ও অতর্কিতে সঙ্গে নিয়ে বড় হতে থাকে। এই সকল ভাব ও চিন্তাধারার অবিলতা ও অনাবিলতার ওপরেই পরবর্তীকালের ধর্ম বা মতবাদ অনেকখানি নির্ভর করে। অনেক ক্ষেত্রে এমনও হয়ে দাঁড়ায়,—পরবর্তীকালের সংযোজন ও বিয়োজনকে বাদ দিয়ে মূল খুঁজতে গেলে তখন আর আবিষ্কার অসম্ভব হয়ে পড়ে। সুফী ভাবধারার অবস্থাও এই সংযোজন ও বিয়োজনের হাত হতে মুক্ত নয়। সুফীমতবাদের জন্মদান করলেও পারস্য তার লালন পালন ও বর্ধনের ভার গ্রহণ করেছিল। পারস্যের স্বভাব নিকুঞ্জে গোলাপ বুলবুলের লীলা নিকেতনে, উষর আরবের বেদুঈন সন্তান রাজপুত্রের ন্যায় লালিত পালিত হয়ে জগতের উৎসুক দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। গোলাপের কম মাধুরী মনোরম সুরভি ও বুলবুলের প্রেমময় সোহাগ। এই বেদুঈন বালকের বহ্নিজ্বালাসম "লু"—বিভীষিকাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল, অমানুষিক কঠোরতাকে কোমলতায় পূর্ণ করে দিয়েছিল, নিরস, শুষ্ক ও শোভাহীন প্রাণকে সরস সজীব ও প্রেমময় হৃদয়দানে মুঞ্জরিত ও বিশোভিত করে তুলেছিল। ফল কথা, সুফীমতবাদ আরব ছাড়িয়ে যতই পূর্বদিকে অগ্রসর হতে থাকে, এর মধ্যে ততই পূর্ব-দেশীয় ভাবধারার সম্মিলন ঘটতে থাকে। এজন্যই অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিত ভুল করে সুফীমতবাদের উদ্ভবকে "আর্য হৃদয়ের ওপর আরবী প্রভাবের প্রতিক্রিয়া" বলে উল্লেখ করে থাকেন। কিরূপে প্রাচ্য ভাবধারা সুফী মতবাদে প্রবেশ করেছিল, তা প্রদর্শন করবার এই উপযুক্ত স্থান নয়।

আমরা দেখেছি এই মতবাদের গোড়ার কথাগুলিতে এমন সব ফাঁক রয়েছে, যার মধ্যে অনায়াসে অন্যান্য ভাব ও চিন্তাধারা প্রবেশ

করতে পারে। আমরা দেখতে পাই, সুফীমতবাদ পারস্যে প্রবেশ করেই সর্বপ্রথম বিশ্ব ব্রহ্মবাদের দিকে ঝুঁকে পড়ে। পারস্য পূর্ব হতেই বিশ্বব্রহ্মবাদের দেশ। ইসলাম এদেশে সুফীমতবাদ প্রবেশের অনেক পূর্বে প্রবেশ করলেও এদেশবাসীর হৃদয়ে তলে তলে এ বেশ লীলায়িত ছিল। সুফীমতবাদ নানা ফাঁক নিয়ে এদেশে প্রবেশ করা মাত্রই, অন্তস্থ বিশ্বব্রহ্মাবাদ ঐ ফাঁকগুলিকে অলক্ষিতে জুড়ে বসল; কারণ এ একরূপ অনিবার্য ছিল। খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর শেষভাগ হতে দশম শতাব্দীর প্রথম ভাগের মধ্যে পারস্যের সুফী সম্প্রদায়ের ভেতর পরিষ্কার বিশ্বব্রহ্মাবাদ দেখা দিয়েছিল। তাই আমরা দেখতে পাই বায়িযীদ বোসত্বামী (মৃঃ ৮৭৪ খ্রীঃ) জুনাইদ বাগদাদী (মৃঃ ৯১০ খ্রীঃ) এবং মনস্থূর হল্লাজ (হত্যা—২৬শে মার্চ, ৯২২ খ্রীষ্টাব্দ) প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত সুফীরা ন্যূনাধিক বিশ্বব্রহ্মবাদী হয়ে পড়েছেন। তাঁরা সকলেই পারস্যবাসী ছিলেন। মনস্থূর হল্লাজের কথা এখন কিংবদন্তীতে দাঁড়িয়ে গেছে। সুতরাং তাঁর মতামতের পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। বায়িযীদ বোসত্বামী বলতেন, "আমিই সত্য, আমিই সত্য ভগবান, আমাকে ভগবত প্রশংসায় আহ্বান কর।" আবার কখন কখন বলতেন, "আমি আরশ্ (ভগবত-সিংহাসন সংরক্ষার স্থান), আমি কুরসী (ভগবত সিংহাসন) আমি কলম (পাপ-পুণ্য লিখবার লিখনী)। যিনি প্রকৃত পুরুষলাভ করেন, তিনি আল্লাহ্র মধ্যে বিলীন হন। জুনাইদ বাগদাদী ঘোষণা করতেন, তওহীদকে (পরমেশ্বরের একত্বকে) অস্বীকার করাই সর্বশ্রেষ্ঠ তওহীদ। এইরূপ বিশ্বব্রহ্মবাদের ধারা ক্রমেই বেড়ে চলতে লাগল। আবু সয়ীদ বিন আবিল খুরাসানী (মৃঃ ১০৪৯ খ্রীঃ) সুফী মতবাদের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রয়েছেন। তিনিও অনেকখানি এইরূপ মতবাদই প্রচার করেছিলেন। তাঁর মতে বিশ্বব্রহ্মবাদ যে শুধু আরও একটু অগ্রসর হয়ে গিয়েছিল তা নয়, তিনি সুফী মতবাদকে কবিত্ব-পূর্ণ, পাণ্ডিত্য ও নীতিবিরুদ্ধ করে তোলবার পক্ষে একজন প্রধান ধুরন্ধর ছিলেন। এ হতে দেখা যাবে, খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর শেষভাগ

হতে, একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের মধ্যে বাগদাদ হতে খুরাসান পর্যন্ত বিশাল প্রাচ্য খণ্ডের মধ্যে সুফীমতবাদ বিশ্বব্রহ্মবাদে পূর্ণ হয়ে উঠেছে। সুফীমতবাদের এই নূতন পার্শ্বপরিবর্তনে গোঁড়া সম্প্রদায় যে একেবারে নীরব ছিলেন তা নয়; তাঁরা এই বিশ্বব্রহ্মবাদকে ধ্বংস করবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করতেও ত্রুটি করেন নি। তাঁদের কাণ্ড-কারখানায় মনসূর হল্লাজ (৯২২) খ্রীষ্টাব্দে অকালে প্রাণ হারাতে বাধ্য হন; প্রসিদ্ধ সুফী শিহাবুদ্দীন (১১৯১) খ্রীষ্টাব্দে হলব বা আলেপ্পোতে সুলতান সালাউদ্দীনের পুত্র মলিকুয জাহির কর্তৃক শিরচ্ছেদিত হয়েছিলেন; সুফীদের মধ্যে "হুরূফী" মতের প্রতিষ্ঠাতা তৈমুরলঙ্গ কর্তৃক (১৪০২) খ্রীষ্টাব্দে নিহত হন, এবং তাঁরই মতাবলম্বী তুর্কী কবি নসীমী (১৪১৮) খ্রীষ্টাব্দে জীবিত অবস্থায় ত্বক উন্মোচিত হয়ে আলেপ্পোতে দেহত্যাগ করেন। এখন বেশ দেখা যাচ্ছে, বিশ্বব্রহ্ম-বাদের যে ধারা নবম শতাব্দী হতে বয়ে চলেছে, তা পঞ্চদশ শতাব্দীতে এসেও থামছে না। মাঝখানে একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বিশ্ব-বিশ্রুত মহাপণ্ডিত "ইমাম ঘোষালী" (মৃত্যু—১১১২ খ্রীষ্টাব্দ) মসীর সাহায্যে এই বিশ্ব ব্রহ্মবাদী সুফী মতবাদকে একবার ভীষণভাবে বাধা দিতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে, মসী ও অসি উভয়েই সর্বশেষে এর ব্যাপকত্বের নিকট মস্তক অবনত করেছিল। এস্থলে তার দীর্ঘ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। ইমাম ঘোষালী প্রমুখ পণ্ডিতগণের সুফী মতবাদের সঙ্গে পাণ্ডিত্য মার্গের সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল বটে, কিন্তু তাঁদের দার্শনিক পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যার ফলে সুফীমত দস্তুর মত একটি দার্শনিক মতরূপে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা লাভ করল। ওপরে আমরা যে সকল বিষয়ের অবতারণা করেছি, তার দ্বারা মোটামুটি ভাবে প্রতীয়মান হবে, খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দী হতে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত সুফীমতবাদ কোন পন্থা অবলম্বন করে চলেছিল; সুতরাং আর অধিক অগ্রসর হয়ে কাজ নেই।

॥ ৫ ॥

বঙ্গে উত্তর ভারতীয় সুফীদের প্রভাবঃ—বঙ্গীয় সুফীদের সঙ্গে উত্তর

ভারতীয় সুফীদের সম্পর্ক যত ঘনিষ্ঠ, ভারতের আর কোন প্রদেশের সুফীদের সঙ্গে ততটা নয়। ভারতের বার হতে উত্তর ভারতে যেমন সুফীরা আগমন করেছিলেন, বঙ্গদেশও যে তেমনিই আসেন নি তা নয়। তবে, তাঁদের সংখ্যা এতই নগন্য যে, আপাততঃ তাঁদের কথা ছেড়ে দেওয়া হোক। আবার তাঁদের অনেকেই প্রথমে ভারতে এসে, ভারতীয় সুফীদের দ্বারা পরিচালিত হয়েই বঙ্গে এসেছিলেন। ফলকথা, বঙ্গদেশীয় সুফী প্রভাবের (অবশ্য খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত) মূল কেন্দ্র হল,—উত্তর ভারতের অর্থাৎ হিন্দু স্থান খণ্ডের বিখ্যাত বিখ্যাত সাধক। আমরা বঙ্গদেশীয় সুফীদের জীবনের সঙ্গে যতই পরিচিত হয়ে ওঠব এ বিষয় আরও স্পষ্ট ভাবে দেখতে পাব। বঙ্গের রাজনৈতিক অবস্থার সঙ্গে, এদেশের সুফী প্রভাবের ইতিহাসের অনেকখানি সামঞ্জস্য রয়েছে, উত্তর ভারত বিজয়ী তুর্কীগণ অত্যল্পকালের মধ্যেই বঙ্গদেশে প্রবেশ করে উত্তর ভারতের সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করে স্বাধীনতা অবলম্বন করেন, চিন্তার জগতেও উত্তর ভারত প্রাণ বিজয়ী সুফীদের পূর্ণ প্রভাব অনেকদিন পর্যন্ত বঙ্গে অক্ষুণ্ণ ছিল। তারপরে বঙ্গীয় সুফীরা ধীরে ধীরে, উত্তর ভারতীয় মুসলমান সাধকদের নায়কতা হতে মুক্তিলাভ করেছিলেন। চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত, বঙ্গীয় সুফীরা, উত্তর ভারতীয় সুফীদের একরূপ প্রতিনিধি স্বরূপ ছিলেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হতে, তাঁরা অনেক খানি স্বাধীন ভাবাপন্ন হয়ে পড়তে থাকেন। কিন্তু স্বাধীনতা অবলম্বন করলেও প্রায় অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বঙ্গীয় সুফীরা তাঁদের মূল মতবাদের জন্য, উত্তর ভারতীয় সুফীদের নিকটই প্রধানতঃ অগ্রণী ছিলেন। এমন কি অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব হতেই মূল ইসলামী সুফীমতবাদ বঙ্গদেশে আর বিশুদ্ধ থাকতে পারে নি, ধীরে ধীরে এটা বিকৃত হয়ে নূতন ও স্বাধীন মূর্তি ধরতে থাকে। দেশে সুফীমত প্রচার ও বহুলবিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে, ভারতীয় যোগসাধন পন্থা, বঙ্গের সুফী মতকে অভিভূত করে ফেলতে থাকে। কালক্রমে বঙ্গের সুফী মতবাদের সঙ্গে, এদেশীয় সংস্কার, বিশ্বাস প্রভৃতিও সম্মিলিত হতে থাকে এবং সুফী মতবাদ ও সাধন পদ্ধতি

ক্রমে ক্রমে যোগসাধন প্রভৃতি হিন্দু পদ্ধতির সঙ্গে একটা আপোষ করে নিতে থাকে। ফলতঃ বলতে গেলে, পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত বঙ্গের সুফীমতবাদ ও তার ইতিহাস, উত্তর ভারতীয় সুফীমতবাদ ও তার ইতিহাস বই আর কিছুই নয়। সুতরাং বাধ্য হয়েই আমরা ভারতীয় সুফীদের বিষয় আলোচনা করলাম। আনুমানিক খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দী হতে ভারতবর্ষে সুফী প্রভাব পড়তে আরম্ভ করে। এই সময় হতে ভারতের নানা স্থানে ভ্রাম্যমান মুসলমান সাধকগণ আগমন করতে থাকেন। তবে তাঁদের সংখ্যা এত অল্প যে, অঙ্গুলি গণনা করা যায়। ভারতের সর্বপ্রথম সুফী কে তা নির্দিষ্ট করে বলা নিতান্তই কঠিন। এ যাবৎ এ বিষয়ে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য গবেষণা চলে নি। সাধারণ ভাবে সন্ধান করতে গিয়ে, এ যাবৎ আমরা যে কয়েকজন সুফীর নাম পেয়েছি, তাঁরা কেউই একাদশ শতাব্দীর পুর্বে ভারতে এসেছিলেন বলে প্রমাণ পাই না। তাঁদের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকজনের নাম করা যায়:—

(১) শাহ্ সুলতান রূস-ইনি (১০৫৩) খ্রীষ্টাব্দে তদীয় গুরু সৈয়দ শাহ্ সুরখ খুল অনতিহ্ সহ বঙ্গদেশে আগমন করেছিলেন। ময়মন সিংহ জেলার নেত্রকোনা সাব-ডিভিসনের অন্তর্গত মদন পুরে এই সাধকের কবর ও দরগাহ বিদ্যমান আছে।

(২) সৈয়দ ন সর শাহ্ দাক্ষিণাত্যে যাঁরা সর্ব প্রথম সুফী মতবাদ নিয়ে প্রবেশ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে সম্ভবতঃ ইনিই অগ্রণী ও সর্বপ্রাচীন ব্যক্তি, মাদ্রাজের ত্রিচিন পল্লীতে এখন তাঁর সমাধিটি তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়ে রয়েছে। ১০৩৯ খ্রীষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যের এই বিখ্যাত সাধক দেহত্যাগ করেন।

(৩) মখদুম সৈয়দ আলী উলুর' দাতা গঞ্জ বখশ্—লাহোরে তাঁর দরগাহের দরজার শিলালিপি হতে জানা যায়, ইনি ১০৭২ খ্রীষ্টাব্দে (৪৬৫ হিঃ) ইহধাম ত্যাগ করেন, অনেকে বলে থাকেন, তিনিই ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম সুফীমতবাদ আণয়ন করেছিলেন। এই কথার সত্যতা যে নিতান্তই অল্প, তা বলা বাহুল্য। তাঁর পূর্বেও ভারতের

নানাস্থানে সুফীরা আগমন করেছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। এক্ষেত্রে পৃথক ভাবে কিছু বলতে পারা যায় না। সে যাই হোক, আরও, প্রায় এক শতাব্দী পরে, অর্থাৎ দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হতে, ভারতবর্ষে নিয়মিত ভাবে সুফীদের প্রভাব পড়তে থাকে। এই সময় হতে ভারতের নানা প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ স্থানে বিখ্যাত বিখ্যাত সাধক ও সুফীদের কেন্দ্র গড়ে ওঠে। সুফী সম্প্রদায়ের পর সুফী সম্প্রদায়, ভারতে আগমন করতে থাকে এবং তাঁদের শিষ্য প্রশিষ্যেরা ভারতের নানা স্থান ও জনপদে ছড়িয়ে পড়তে থাকেন। অচিরকাল মধ্যেই আসমুদ্র হিমাচল ভারতের সর্বত্রই সুফী প্রভাবের অবারিত স্রোত খরগতিতে প্রবাহিত হয়ে যায়। এই সময়ে যে সকল সম্প্রদায় ভারতে আসেন, তাঁদের মধ্যে চিশতীয়া ও সোহরাবর্দীয়া সম্প্রদায়ই প্রধান। আজমীরের (সং, অজয়মেরু) ভারত বিখ্যাত সাধক খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী সাহেবই ভারতবর্ষে চিশতীয়া সম্প্রদায়ের অগ্রদূত। ১১৪২ খ্রীষ্টাব্দে সাঞ্জিরাস্তান (আফগানিস্তানের দক্ষিণাঞ্চলে একটি জিলা) তাঁর জন্ম হয়। সিদ্ধত্ব লাভের পর ১১৯৩ খ্রীষ্টাব্দে একান্ন বছর বয়সে তিনি দিল্লী হয়ে আজমীরে গমন করেন ও সেখানে স্থায়ীভাবে বাস করতে থাকেন। তখন আজমীরের অধিপতি পৃথ্বীরাজের সঙ্গে তাঁর বিবাদ উপস্থিত হয়। কথিত আছে এই বিবাদের ফলে, চিশতী সাহেব ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, অচিরেই রাজা পৃথ্বীরাজের পতন অবশ্যম্ভাবী, অনেক দিন হতে রাজা পৃথ্বীরাজের সঙ্গে সুলতান মোহাম্মদ ঘুরীর (১১৮৯-১২০৫) বিবাদ চলছিল। সুলতান কয়েকবার আজমীরা ধিপতির নিকট পরাজিত হয়ে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করতেও বাধ্য হয়েছিলেন। চিশতী সাহেবের আজমীরে আগমনের পর, ১১৯৩ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে সুলতান মোহাম্মদ ঘুরীর হস্তে রাজা পৃথ্বীরাজ ইতিহাস প্রসিদ্ধ তিরৌরীর সমর ক্ষেত্রে পরাজিত, বন্দী ও নিহত হলেন। সাধক প্রকৃতই ভবিষ্যদ্বাণী করে থাকলে, তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছিল। তাঁর ভারত আগমনে হিন্দুর স্বাধীনতা সূর্য ভারত হতে বিদায় গ্রহণ করল। আর সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান অধিকারের বীজ স্থায়ীভাবে

ভারতের বুকে প্রতিষ্ঠিত হল। ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাসে তিরৌরীর সমরক্ষেত্র যদি প্রসিদ্ধি লাভ করে, চিশতী সাহেবের ভারত আগমনও ততোধিক প্রসিদ্ধ ব্যাপার। চিশ্‌তী সাহেবের ভবিষ্যদ্বাণী পরিপূরণার্থে অথবা দৈবদোষে ঘটনাক্রমে যে রূপেই হোক চিশতী সাহেবের আগমনের পরই যখন তিরৌরীতে পৃথ্বীরাজের পতন হয়, তখন বাধ্য হয়ে স্বীকার করতে হয়, চিশতী সাহেব ভারতে হিন্দু স্বাধীনতা অবসানের ও নবীন রাজশক্তির সঙ্গে নূতন এক ভাবধারা প্রবর্তনের অগ্রদূত। সে যাই হোক, ১২৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই মার্চ খাজা মঈনুউদ্দীন চিশতী আজমীরেই দেহত্যাগ করেন। চিশতীয়া সম্প্রদায়ের সঙ্গে সঙ্গেই ভারতে সোহরাবর্দীয়া সম্প্রদায় প্রবেশ করে, শেখ বাহাউদ্দীন ধকরিয়া মূলতানীই এই সম্প্রদায়ের ভারতীয় আদিগুরু। ১১৬৯ খ্রীষ্টাব্দে মূলতানে তাঁর জন্ম এবং সেখানে ১২৬০ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই নভেম্বর পরলোক প্রাপ্তি ঘটে। অত্যল্পকালের মধ্যে তাঁর অনেক শিষ্য ভারতের নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়ল। এই শিষ্যদের প্রচেষ্টায়, চিশতীয়া সম্প্রদায়ের পাশাপাশি সোহরাবর্দীয়া সম্প্রদায়ও ভারতে প্রতিষ্ঠা লাভ করল। চিশ্‌তীয়া ও সোহরাবর্দীয়া সম্প্রদায়ের আগমনের পর কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত ভারতে আর কোন নূতন সুফী সম্প্রদায় আগমন করে ছিলেন কিনা সে বিষয় আমরা এ পর্যন্ত সঠিক ভাবে জানতে পারিনি। সম্ভবতঃ ত্রয়োদশ হতে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতে আর কোন নতুন সুফী সম্প্রদায় আগমন করেন নি।

এই দু শতাব্দীর মধ্যে উপরোক্ত সম্প্রদায় দুটি ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল এবং জনসাধারণ কর্তৃক বিশেষভাবে সমাদর লাভ করে, ভারতের বুকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ওঠে। ঠিক এই সময়েই ভারতে অন্য একটি সুফী সম্প্রদায় কতিপয় নূতন বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রবেশ করেছিল, এটাই কাদেরীয়া সম্প্রদায়। বাগদাদের অন্তর্গত জীলান বা গীলান নামক স্থানের অধিবাসী মহাপণ্ডিত, সুবক্তা ও জগদ্বিখ্যাত সাধক সৈয়দ আবদুল কাদের সাহেবই (জন্ম—১০৭৮ খ্রীঃ মার্চ ; মৃত্যু—১১৬৬ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী) এই নূতন সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা

ছিলেন। কিন্তু তিনি জীবনে কখনও ভারতে আসেন নি। তদ্বংশীয় সৈয়দ মোহাম্মদ গৌস গীলানী সাহেব ১৪৮২ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে আসেন ও এই মতের বহুল প্রচার করেন। তিনি ভারতে এসে উত্তর রাজপুতনায় উস্ নগরে স্থায়ীভাবে বাস করছিলেন এবং এখানেই পঁয়ত্রিশ বছর পরে অর্থাৎ ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দে ভবধাম ত্যাগ করেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে, ভারতে আর একটি সুফী সম্প্রদায় প্রবেশ করে; তা নাকশবন্দীয়া সম্প্রদায়। তুর্কীস্থানের অধিবাসী খাজা বাহাউদ্দীন নাকশবন্দীয়া (মৃঃ ১৩৮৯ খ্রীঃ) এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। খাজা মোহাম্মদ বাক্বী বিল্লাহ্ এই সম্প্রদায়ের ভারতীয় আদি গুরু। তিনি তুর্কী স্থান হতে এই সম্প্রদায়ের মতবাদ ভারতে আণয়ন করেন। ১৬০৩ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীতে তাঁর মৃত্যু হয়। ভারতে সুফী প্রভাবের মূল ঐতিহাসিক সূত্র এইরূপ। এই সূত্র হতে দাক্ষিণাত্যের সৈয়দ নসরশাহ (মৃঃ ১০৩৯ খ্রীষ্টাব্দ), বঙ্গের শাহ সুলতান রূমী (আগমন—১০৫৩ খ্রীঃ) ও লাহোরের দাতা গঞ্জ বখশ (১০৭২ খ্রীঃ) প্রভৃতি একাদশ শতাব্দীর সাধকগণকে বাদ দিলে ঐতিহাসিক সূত্র ছিন্ন হয় বটে, কিন্তু ভারতে সুফী প্রভাব জানবার পক্ষে বিশেষ কোন বিঘ্ন উপস্থিত হয় না। বসন্তের অগ্রদূত কোকিলের ন্যায়, তাঁরা সুফী মতবাদের আনন্দময়ী আগমনী গান করবার জন্য ভারতে এসেছিলেন; ভারতের বিভিন্ন বিশিষ্ট স্থানে তাঁদের সেই মধুময়ী কাকলী লহরী কিছুকাল গুঞ্জন করে বেড়িয়ে ফিরলেও ব্যাপকত্ব ও স্থায়িত্বের দিক হতে, তা অকালমৃত্যু বরণ করে নিতে বাধ্য হয়েছিল। তাদের বাসন্তী-আগমনী গানে ভারতের উপবনে ফুল ফুটেনি, শাখায় শাখায় মলয় দুলেনি, কুঞ্জে কুঞ্জে মঞ্জরী জাগেনি, ফুলে ফুলে অলি ডাকেনি। তাঁরা অসময়ে এসে মনের আনন্দে শুধু গান গেয়েই গেলেন।

ভারত তা শুনল না, বা ভারতের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার মত অত বড় শক্তি তাদের ছিল না। তাঁদের প্রাথমিক চেষ্টা ব্যর্থ হলেও একথা অস্বীকার করা যায় না যে, তাঁরা ভারতকে সজাগ ও সচকিত

করে দিয়ে অনুবর্তীগণের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে রেখে গিয়েছিলেন। তাঁরা যে বীজ বপন করে গেলেন, উত্তরকালে সেই বীজ হতে ফলবান তরু উদ্ভূত হয়েছিল এবং তাঁদের বংশধরেরা তাঁর সুস্বাদু ফল আহার করে আপনাদেরকে এমন কি তার দ্বারা দশজনকেও পরিতুষ্ট করেছিলেন। সে যাই হোক, যাঁদের শুভাগমনে ভারতীয় সাধনা গঙ্গার কুলে কুলে বান ডাকল, মরা গাঙ্গের বুকে বুকে জোয়ার ছুটল, তাঁরা হলেন খাজা মঈনুউদ্দীন চিশতী ও বাহাউদ্দীন ধকরিয়া মুলতানী। প্রকৃত প্রস্তাবে বলতে গেলে, এই দুই সম্প্রদারের সাধকদের অনাবিল সাধনা, অমানুষিক তপস্যা ও দেবোপম আত্মোৎসর্গের দ্বারাই ভারতে সুফী-মতবাদ তথা মুসলমান ধর্ম প্রতিষ্ঠা লাভ করতে সমর্থ হয়। দিগ্বিজয়ী তুর্কীদের ক্ষাত্রশক্তি ও অস্ত্রের দ্বারা যা সম্ভব হয়নি, এই নিঃস্ব ও পার্থিব সহায়হীন সাধকদের দ্বারা তা সম্ভবপর হয়েছিল,—ভারত ইসলামকে আনন্দে গ্রহণ করে আপনার করে নিতে পেরেছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে যখন ভারতের প্রাণে প্রাণে কেবল চিশতীয়া ও সোহরাবর্দীয়া সম্প্রদায় দ্বয়ের সাধনার কথা ও মর্মবাদিতার বাণী মধুরভাবে লীলায়িত ও প্রতি মুহূর্তে সঞ্চারিত হচ্ছিল, তখন কাদেরীয়া সম্প্রদায় ভারতে প্রবেশ করল। তখন ভারতের নিজস্ব সাধনার সঙ্গে মিলিত হয়ে উপযুক্ত সম্প্রদায় দুটি, এদেশে যেভাবে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করে ফেলেছিল, তাদের সজোরে সরিয়ে দিয়ে, বা সমূলে উৎপাটিত করে, তৃতীয় সম্প্রদায়টি নিজের জন্য প্রশস্ত স্থান করে নিতে পারল না। বিশেষতঃ প্রথমোক্ত দু' সম্প্রদায়ের সাধনা সূত্রের মধ্যে ঐক্যের ভাগ যত বেশী, তৃতীয় সম্প্রদায়ের সাধনার সঙ্গে প্রথমোক্ত সাধনা দুটির অনৈক্য ততোধিক বলে বোধ হয়। এই ক্ষেত্রে তৃতীয় সম্প্রদায়ের সাধনার ভাগ্যে যা ঘটা স্বাভাবিক তাই ঘটল,—অল্পদিনের মধ্যে ভারতে তার স্থান হল না। নাকশবন্দীয়া সম্প্রদায় সম্বন্ধেও ঠিক একই কথা। অধুনা ভারতে কাদেরীয়া সম্প্রদায়ের প্রভাব নিতান্ত অল্প নয়, কিন্তু এ প্রভাব সময় হিসাবে অনেক পরের। চিশতীয়া ও সোহরাবর্দীয়া সম্প্রদায়-দ্বয়ের সাধনা ভারতে আগমন

করার পূর্ব হতেই অনেকখানি ভারতীয় ভাবাপন্ন হয়ে পড়েছিল। ভারতে আগমনের পর এদেশীয় সাধনার সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ যোগ-সূত্রের সৃষ্টি হল! ভারতের প্রাণের সঙ্গে আরব ও পারস্যের প্রাণের ত্রিবেণী সঙ্গম ঘটে গেল! ভারত বিখ্যাত সাধক কবীর (১৩৯৮-১৪৪৮) উক্ত প্রাণত্রয়ের পুণ্য তীর্থ প্রয়াগ ক্ষেত্রে পরিণত হলেন। তাঁর মধ্যে ভারতীয় যোগসাধনা ও সুফীদের ব্রহ্মবাদ সম্মিলিত হল। সুফীরা সাক্ষাৎভাবে তাঁর ভেতর দিয়ে ভারতীয়দের, আর ভারতীয়েরা ও সুফীদের প্রাণের সন্ধান লাভ করলেন। এইজন্যই, ভারতীয় সাধক ও সুফীদের ইতিহাসে কবীর চিরদিন একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে থাকবেন। কবীরকে সাধারণতঃ রামানন্দের শিষ্য বলে সকলে অবগত আছেন! কিন্তু তিনি প্রধানতঃ চিশতীয়া সম্প্রদায়ভুক্ত সাধক ছিলেন। একদিকে রানানন্দ যেমন তাঁর গুরু ছিলেন, তেমনিই শেখ তক্কী সোহরাবর্দীয়া ও তাঁর "মুরশিদ" (গুরু) ছিলেন। তিনি রামানন্দের নিকট হতে ভারতীয় সাধনা ধারার সঙ্গে হিন্দীর ভেতর দিয়ে যেমন পরিচয় লাভ করেন, শেখ তক্কীর নিকট হতেও তেমনি দীক্ষা গ্রহণ করে সুফী মর্মবাদের বিষয় অবগত হন। এরপর শেখ ভীকা চিশতীর নিকট হতে "খিরকহা-ই-খিলাফত" বা আধ্যাত্ম উত্তরাধিকারীর নিদর্শন প্রাপ্ত হয়ে স্বয়ং নূতন মণ্ডলীর প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতীয় ভাষায় অর্থাৎ হিন্দীতে তিনিই সর্বপ্রথম সুফী মতানুকূল আধ্যাত্মিক বিষয় প্রচার করেছিলেন। তাঁর মধ্যে যে ত্রিবেণীর সঙ্গম হল, তাতে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে ভারতবাসী এসে অবগাহন করতে লাগল। হিন্দু মুসলমান মিলনের দিক হতে দেখতে গেলে, কবীর বাস্তবিকই উভয় সম্প্রদায়ের পুণ্যতীর্থ। ভারতের এই মিলন-ক্ষেত্রে এযাবৎ যাঁরা আত্মোৎ-সর্গ করে যশের মন্দিরে প্রবেশ করেছেন, কবীর তাঁদের সকলেরই আধ্যাত্মিক পূর্বপুরুষ। ভারতের সর্বত্র একদিন কবীরের প্রভাব অনুভূত হয়েছিল। ভারতীয় ভক্তিবাদের নব সংস্করণে কবীরের উদাস ও উদার ভাব কতখানি ক্রিয়া করেছিল তার জাজ্জ্বল্যমান সাক্ষী ভারতের চিন্তা জগতের ইতিহাস। মধ্যযুগে ভারতীয় সাধকেরা বলে থাকেন,—

"ভক্তি দ্রাবিড়-উপজী, লায়ে রামানন্দ,
প্রগট কিয়ো কবীরনে সপ্তদ্বীপ নৌখণ্ডে।

অর্থাৎ ভক্তি উপজিল দ্রাবিড় দেশে, এদেশে আনলেন রামানন্দ। কবীর তা সপ্তদ্বীপ ও নবখণ্ড পৃথিবীতে প্রকাশ করলেন। তাঁর দিগন্ত-বিস্তারী ভাবস্রোত ভারতের একপ্রান্ত হতে অপর প্রান্তকে বিপ্লবিত করে দিয়েছিল! বাংলা দেশ তার প্রভাব এড়াতে পেরেছিল কি? ষোড়শ শতাব্দীর চৈতন্যদেবের ধর্মমতের মধ্যে কবীরের মতবাদের কোন প্রতিধ্বনি কি নেই?

॥ ৬ ॥

ভারতে কতকগুলি সুফী সম্প্রদায়ের প্রভাব পড়েছিল, তা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। এদেশে সুফী প্রভাব অনুভূত হবার পূর্ব (অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর পূর্ব) হতে ভারতের বাইরের দেশের সুফীদের মধ্যে অসংখ্য সম্প্রদায় দেখা দিয়েছিল। এরূপ হওয়া কিছুই আশ্চর্যের বিষয় নয়, কেননা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি, সুফী আন্দোলন ব্যক্তিগত। প্রত্যেক প্রধান প্রধান সুফী স্বীয় স্বীয় বিশিষ্ট পদ্ধতির অনুসরণ করে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন, এবং তার পরে তা লোক সমক্ষে প্রকাশ ও প্রচার করেন, সুতরাং প্রত্যেক সুফীর সাধনায় ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের ছাপ অনুযায়ী কিছু-না কিছু বৈশিষ্ট্য থাকবেই। যে প্রসিদ্ধ সুফীকে কেন্দ্র করে যে মণ্ডলী গঠিত হয়েছিল, তা প্রতিষ্ঠাতার নাম বহন করেই পরিচিত হয়েছে। এরূপ অনেক সুফী মণ্ডলী বা সম্প্রদায়ের প্রভাব ভারতে পড়েছিল বলে জানা যায়। ভারতীয় সুফী মতবাদের পুস্তক পুস্তিকায়, আমরা অনেক সুফী সম্প্রদায়ের নাম দেখতে পাই, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, কখন কার দ্বারা এই সম্প্রদায়গুলির মতবাদ ভারতে আমদানী করা হয়েছিল এবং কখন ও কিরূপ ভাবে তারা ভারতবাসীদের দ্বারা গৃহীত হয়েছিল, তার কোন বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে একথা সত্য যে, এদের প্রভাব হতে ভারত মুক্ত ছিল না। আমাদের মনে হয়, সে প্রভাব ধীরে ধীরে কতিপয় বিশিষ্ট ও উঠন্ত সম্প্রদায়ের প্রভাবের নীচে চাপা পড়ে গিয়ে

কালক্রমে অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলতে বাধ্য হয়। ভারতবর্ষে যতগুলি বিদেশীয় সুফী সম্প্রদায়ের প্রভাব পড়েছিল বলে জানা যায়, তার মধ্যে চতুর্থ টির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য। ভারতীয় সুফীরা এই চতুর্দশ মণ্ডলী সম্বন্ধে বলে থাকেন যে, হযরত মোহাম্মদ তদীয় জামাতা হযরত আলীকে "ইলম-ই-মারফৎ" বা মর্মমুখ জ্ঞান দান করেন, আলী সেই জ্ঞান, হাসান-হোসেন খাজা, কামীল ও হাসান বাসরী এই চার ব্যক্তিকে দান করেন। এই অনুগ্রহ লব্ধ ব্যক্তি চতুষ্টয়ের মধ্যে, হাসান বাসরী সুফীদের মূল উৎস। হাসান বাসরীর দুজন প্রধান শিষ্য ছিলেনঃ—একজনের নাম খাজা হাবীব আজমী এবং অপর ব্যক্তির নাম আবদুল-ওয়াহিদ-বিনজায়েদ। উপরোক্ত চতুর্দশ মণ্ডলীর হাবীব আজমীকেই তাঁদের পরমার্থ জ্ঞানের মূল উৎস বলে মেনে থাকেন। অবশিষ্ট পঞ্চমণ্ডলী আবদুল ওয়াহিদ-বিনজায়েদকেই কেন্দ্র করে গড়ে ওঠেছিল। এই চতুদশ মণ্ডলীর তালিকায় একটি বিষয় লক্ষ্য করা আবশ্যক। ওপরে আমরা যে সকল সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করেছি, এতে তার সকল গুলির নির্দেশ নেই। এই তালিকাটি যে নিতান্ত অসম্পুর্ণ তাতে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না, 'চতুর্দশ মণ্ডলীর অস্তিত্ব সম্বন্ধে সবচেয়ে বিশ্বাস যোগ্য ও প্রচীন ঐতিহাসিক প্রমাণ 'আইন-ই-আকবরী' এ ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে বিরচিত হয়েছিল। ওপরে আমরা যে তালিকাটি উদ্ধৃত করেছি, আইন-ই-আকবরীতেও অবিকল সেই তালিকাটিই দেওয়া আছে। তা হলে, ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত কি 'চতুর্দশ মণ্ডলীর' মধ্যেই ভারতীয় সুফী সম্প্রদায়ের পূর্ণ তালিকা পাওয়া গেল ; না, তা কখনও নয়। আইন-ই-আকবরীতে কেবল প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ সুফী মণ্ডলী গুলিরই নাম দেওয়া হয়েছিল। আইন-ই-আকবরী রচিত হবার অন্যূন এক শতাব্দী পূর্বে কাদেরীয়া সম্প্রদায় ভারতে প্রবেশ করে (১৪৪২ খ্রীঃ), তথাপি এই ইতিহাসে তা পরিত্যক্ত হয়েছে। শত্বারী নামক আর এক সম্প্রদায়ের কথা আমরা জানি। আইন-ই-আকবরী রচিত হবার পূর্বে ভারতে তার অস্তিত্ব ছিল। আকবরের পিতা হুমায়ুন এই শত্বারী সম্প্রদায়ভুক্ত প্রসিদ্ধ সাধক মোহাম্মদ গৌস-

এর একজন বিশিষ্ট শিষ্য ছিলেন। ১৫৬২ খ্রীষ্টাব্দে এই সাধকের মৃত্যু হলে গোয়ালিয়রে সম্রাট আকবর তাঁর এক সুরম্য সমাধি নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। এই প্রসিদ্ধ শত্তারী সম্প্রদায়ের ভারতাগমনের বিষয় আইন-ই-আকবরীতে উল্লেখ নেই। এখন বেশ দেখা যাচ্ছে, আইন-ই-আকবরীতে প্রদত্ত এই 'চতুর্দশ মণ্ডলীর' তালিকা এবং সুফীদের বর্ণিত তালিকাও সম্পূর্ণ নয়। ভারতে কত সম্প্রদায়ের সুফীই যে এসেছিলেন, তার সঠিক সংখ্যা নির্ণয় করা অসম্ভব। দ্বাদশ শতাব্দী হতেই ভারতে নিয়মিত ভাবে সুফী প্রভাব অনুভূত হতে থাকে। অবস্থা যেরূপ দেখা যাচ্ছে তাতে মনে হয়, দ্বাদশ শতাব্দীর পর হতেই, সমুদ্র তরঙ্গবৎ একটির পর একটি করে এই সুফী মণ্ডলীগুলি ভারতে প্রবেশ করেছিল। ষোড়শ শতাব্দীর অন্যূন দু শতাব্দা পূর্বে ভারতে আরও একটি প্রসিদ্ধ সুফী সম্প্রদায় প্রবেশ করেছিল। তা "মদারী সম্প্রদায় বদাউদ্দীন শাহ-ই-মদার" নামক জনৈক চতুর্দশ শতাব্দীর সাধক এই সম্প্রদায় ভারতে প্রতিষ্ঠিত করেন। কোন কোন পণ্ডিত এই সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দীহান হয়েছেন। এই মণ্ডলীর প্রবর্তককে কেন্দ্র করে, ভারতের নানা স্থানে যে সমস্ত অদ্ভুত ও আজগুবী গল্প পরবর্তীকালে গড়ে ওঠেছিল। বিশেষতঃ এই মণ্ডলীভুক্ত সাধকদের ইসলাম বিরুদ্ধ আচরণ দেখে বঞ্চিতদের সন্দেহ আরও ঘনীভূত হয়েছিল বলে মনে হয়। বদাউদ্দীন শাহ-ই-মদারের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমরা কোন সন্দেহ করি না। একদিন তৎ প্রবর্তিত মণ্ডলী ভারতের নানা স্থানে যে সমাদর লাভ করেছিল, তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ, অদ্যাপি এই সম্প্রদায় ভূক্ত সাধকের ভারত ব্যাপী প্রভাব, কানপুর হতে ৪০ মাইল দূরবর্তী মকনপুর নামক স্থানে এই সাধকের সমাধি আছে। উত্তর ভারতীয় মদার মণ্ডলী ভূক্ত সাধকেরা এখনও এই দরগাহে প্রতি বছর সমবেত হন। বঙ্গদেশও এই মণ্ডলীর প্রভাব হতে মুক্ত ছিল না। ফরীদ পুর জিলার মদারী পুরেও এই দরবেশের একটি কৃত্রিম সমাধি রয়েছে। স্থানীয় প্রবাদ,—শাহ-ই মদারের নামানুসারেই মদারী পুরের নামকরণ করা হয়েছিল।

ফরীদ পুরের রহাবী সম্প্রদায়ের অত্যাচারে মদারী পীরের এই দরগাহ্‌টি এখন আর পূর্বের মত উন্নত অবস্থায় নেই। চট্টগ্রামের নানা স্থানের সঙ্গে মদারী পীরেরও স্মৃতি জড়িত রয়েছে। এই জিলার মদারশা গ্রাম ও সহরের নিকটবর্তী মদার বাড়ী মদারী পীরের স্মৃতিই বহন করে আসছে। উত্তর বঙ্গের দিনাজপুর জিলায় হেমতাবাদ থানার অন্তর্গত বালিয়া দীঘি গ্রামে, এখনও মদারী সম্প্রদায় ভুক্ত সাধকদের জাগ্রত আড্ডা আছে।

বঙ্গের নানা স্থানে এখন- মদারের বাঁশ উৎসবের দ্বারা মুসলমান জনসাধারণ প্রতি বছর এই দরবেশের পুণ্য স্মৃতি স্মরণ করে থাকে। বদীউদ্দীন শাহ-ই-মদারের সময় সম্বন্ধে অনেকেরই সন্দেহ আছে। তিনি যে খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর লোক তা নিঃসন্দেহ। কেননা শেখ আবদুল কুদ্দুস গানগূহী (মৃত্যু ১৫৩৮ খ্রীঃ) নামক মদার শাহের একজন প্রসিদ্ধ শিষ্যের গুরুর তালিকা......হতে আমরা অবগত হই, তিনি সৈয়দ জালাল উদ্দীন বুখারী (মৃত্যু—১২৯১ খ্রীঃ) ও তদীয় পৌত্র সৈয়দ জালাল মুখদুম জাহানীয়া জাঁহা-গশত (১৩০৭—১৩৭৯) বুখারীর সম সাময়িক। আবার অনেক সুফী ইতিহাসে এও দেখা যায়,—জাঁহা-গশত সাহেব মদারী শাহ হতেও আধ্যাত্ম উত্তরাধিকারীর নিদর্শন লাভ করেছিলেন। এখন বেশ দেখা যাবে, বদীউদ্দীন শাহ-ই-মদার কিছুতেই চতুর্দশ শতাব্দীর পরের লোক নন। আমরা মনে করি—চতুর্দশ শতাব্দীই তাঁর জীবনকাল। এ পর্যন্ত পাঠককে আমরা অনেকগুলি ভারতীয় সুফী সম্প্রদায়ের সংবাদ দান করেছি এবং এও জানিয়েছি যে, তার সমস্ত গুলির সমান প্রভাব ভারতে কখনও ছিলনা। কালক্রমে ভারতে মাত্র তিনটি সম্প্রদায়ই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল—তারা চিশতীয়া, সোহরাবদীয়া সম্প্রদায় প্রায় এক সঙ্গেই ভারতে প্রবেশ করে এবং অচিরকাল মধ্যেই ভারতের বুকে সুদৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ওঠে। কাদেরীয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে তা ঘটে নি। পঞ্চদশ শতাব্দার শেষ ভাগে (১৪৮২) এ ভারতে প্রবেশ করলেও, সপ্তদশ শতাব্দীতেই এর প্রতিষ্ঠা সুদৃঢ় ও ব্যাপক হয়। নাকশবন্দীয়া সম্প্রদায়ও এই

সময়েই উত্তর ভারতের নানাস্থানে ছড়িয়ে পড়ে। কিরূপে এই ব্যাপার সংঘটিত হয় তা নিম্নে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করব।

॥ ৭ ॥

বিদেশী সুফীদের মধ্যে যেমন কালক্রমে অসংখ্য সম্প্রদায় দেখা দিয়েছিল এবং তার কতকগুলি ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছিল, ভারতীয় সুফীদের মধ্যেও তেমনই অচিরেই অসংখ্য সম্প্রদায় দেখা দিয়েছিল এবং তার কয়েক সম্প্রদায় বঙ্গে প্রবেশ করেছিল। ভারতীয় সুফীদের মধ্যে যত শাখামণ্ডলী দেখা দিয়েছিল, পৃথিবীর অন্য কোন স্থানের সুফীদের মধ্যে এত শাখা মণ্ডলী গঠিত হয়েছিল কিনা সন্দেহ। ওপরে যে সকল মণ্ডলীর নাম করা হয়েছে, তাতে এমন কোন মণ্ডলী নেই, যার দু চারটি শাখা-মণ্ডলী বার হয়ে পড়েনি। কোন কোন মণ্ডলীর এত শাখা মণ্ডলী বার হয়েছিল যে, তাদের সংখ্যা দেখলে আশ্চর্য হতে হয়। উদাহরণ স্বরূপ তৌফী মণ্ডলীর উল্লেখ করা যায়। এই মণ্ডলীর প্রায় ৬৬টি শাখা মণ্ডলী বার হয়েছিল। চিশতীয়া ও সোহরাবর্দীয়া মণ্ডলী হতেও নিতান্ত কম শাখা বার হয়নি।

প্রথমোক্ত মণ্ডলীতে প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ চতুর্দশটি এবং শেষোক্ত মণ্ডলীতে ন্যূনাধিক সপ্তদশটি শাখা বার হয়ে পড়েছিল। এই সমুদয় শাখা-মণ্ডলীর পৃথক পৃথক নাম করতে ও তার বিবরণ লিখতে গেলে অযথা গ্রন্থের কলেবর বেড়ে যায়—সুতরাং পরিত্যাজ্য। আমাদের এই টুকু জানলে যথেষ্ট হবে যে, ভারতীয় সুফীদের মধ্যে কালক্রমে অসংখ্য শাখা দেখা দিয়েছিল। আবার এই শাখাগুলির প্রত্যেকটিতে যে কিছু না কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল, তা নিতান্তই সত্য। ভারতীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্য —তত্ত্বানুসন্ধিৎসা। এই হেতু ভারতীয়গণ কর্তৃক নূতন ধর্ম গৃহীত হলেও তাতে তাদের মনের ছাপ না পড়ে যায় নি। আমাদের মনে হয়, তাই ভারতীয় সুফীমতবাদে এত মত ও সম্প্রদায় দেখা দিয়েছিল। এই শাখা মণ্ডলীগুলি সাধারণতঃ মূল মণ্ডলীগুলির প্রাধান্য ও অধীনতা স্বীকার করলেও, মূলতঃ তা হতে ধীরে ধীরে সরে পড়ছিল। ইতঃপূর্বে আমরা দেখেছি, প্রকৃত পক্ষে খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীই ভারতে

সুফী প্রভাব বিস্তৃতির কাল। এই সময়েই সুফী প্রভাব ভারতবর্ষে স্থায়ীভাবে স্থান লাভ করেছিল। এই সময়ে সুফী মতবাদের মূলধারা পারস্য, সমরকন্দ, বোখারা প্রভৃতি দেশে কোন গতি ও পথ গ্রহণ করে চলেছিল, তাও আগে বলা হয়েছে। তা হতে দেখা যাবে, এই দেশগুলি তখন বিশ্বব্রহ্মবাদে ভরপুর হয়ে উঠেছে। সুফী মতবাদের যে ধারা ভারতে এসে পৌঁছেছিল, তা খাস আরব হতে আসে নি,—উপরোক্ত দেশগুলি হতে এসেছিল। সুতরাং এ কথা সহজেই সঠিক ভাবে অনুমান করা যেতে পারে যে, ভারতের বহির্দেশসহ বিশ্ব ব্রহ্মবাদকে সঙ্গে নিয়ে ভারতীয়রা এদেশে প্রবেশ করেছিল। এ স্থলে বলে রাখা ভাল, কেউ যেন মনে না করেন,—খ্রীষ্টীয় একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে পারস্য ও আরবে একেশ্বরবাদী সুফী ছিলেন না, থাকলেও থাকতে পারেন। কিন্তু তাঁরা বা তাঁদের শিষ্য প্রশিষ্যেরা ভারতে এসেছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। এ কথাও সত্য যে, ভারতীয় সমস্ত মণ্ডলীর বিস্তৃত মতবাদ জানবার সৌভাগ্য উপাদানাভাবে এ পর্যন্ত আমাদের ঘটে ওঠে নি। সমস্ত মণ্ডলীর মতবাদ জানবার সৌভাগ্য আমাদের না হলেও যতগুলি মণ্ডলীর বিষয় অবগত হয়েছি প্রত্যেকটিতেই আমরা বিশ্বব্রহ্মবাদের স্পষ্ট ছাপ দেখতে পাই। মোটের ওপর, ভারতে যতগুলি সুফী সম্প্রদায় প্রবেশ করেছিল, তারা বিদেশীয় বিশ্বব্রহ্মবাদকে সঙ্গে নিয়েই প্রবেশ করেছিল বলে আমাদের বিশ্বাস। ভারত প্রাচীন কাল হতেই সাংখ্য ও বেদান্তের দেশ। চিরকালই মর্মবাদী দার্শনিকের লীলাক্ষেত্র এবং চিরদিনই নিগূঢ় আধ্যাত্ম বাদের জন্মস্থান। আবার চিরদিনই। পারস্য, সমরকন্দ ও বোখারা প্রভৃতি দেশের মর্ম ভারতের মর্মের সঙ্গে একই সূত্রে গ্রথিত।

কাজে কাজেই, ঐ সকল দেশ হতে বিশ্বব্রহ্মবাদের বাণী ও মর্মবাদের গূঢ় রহস্য নিয়ে সুফীরা যখন ভারতে প্রবেশ করলেন—প্রথমতঃ বিদেশীয় "তুর্ক" এর ধর্ম ও দর্শন বিধায় ভারত তাকে গ্রহণ করতে একটু দ্বিধা ও সংকোচ বোধ করলেও কিছুদিনের মধ্যে যখন তার সম্যক পরিচয় লাভ করল,—তখন ভারত তাকে দু হাত বাড়িয়ে বুকে টেনে নিল।

অচিরেই ভারতবর্ষ এই পারস্য, সমরকন্দের নব মর্মবাদের মধ্যে প্রাচীন কালের কোন বিস্মৃত জনের মনোরম মূর্তির সাক্ষাৎ লাভ করল, আর এই নব মর্মবাদও ভারতের প্রাণে একটি প্রাচীন যোগসূত্রের আবিষ্কার করে ফেলল। তাই অতি সহজেই, এটি ভারতের একপ্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল। মাত্র একটি শতাব্দী অতীত না হতেই, এ সমগ্র ভারতের প্রাণে একটি নূতন মাট ও নবীন আসর জমিয়ে তুলল। মুসলমানদের ক্ষাত্র-শক্তি যত শীঘ্র ভারতকে গ্রাস করতে পারে নি, তার এক তৃতীয়াংশ সময়ের মধ্যেই এই সুফী মতবাদ ভারতের হৃদয় জয় করে নিতে সমর্থ হয়েছিল। এই ভারত বিজয় ব্যাপারে আলেকজান্দর হলেন কবীর (১৩৭৮-১৪৪৮)। ভারতীয় সাধনার সঙ্গে, সুফী তাসাউফের বা ব্রহ্মবাদের মিলন ঘটল। উভয়বিধ সাধনায় মৈত্রী সংস্থাপিত হল। এতদিন এই দুই সাধনা পরস্পর ভাবের আদান প্রদান করতে করতে ধীরে ধীরে নিকটবর্তী হয়েছিল,—পরিশেষে কবীরের মধ্যে উভয়ের মিলন ঘটল। এই জন্যই বলতে হয়, যদি—মুসলমানদের মধ্যে প্রকৃতই কেউ ভারত বিজয় করে থাকেন। তবে তিনি কবীর;—ঔরঙ্গজেব বা আকবর নন। এই জন্যই কবীরের অন্তর্দ্ধানের পরেও—ভারতের পূর্ব হতে পশ্চিম, উত্তর হতে দক্ষিণ সর্বত্রই তাঁর প্রতিধ্বনি জেগে উঠেছিল। এইরূপ ভাবে ভারতীয় সাধনা ও সুফী তাসাউফের মিলন ঘটার ফল হল কি? ফল ভাল হল কি মন্দ হল, সে বিচার পাঠকদের স্বীয় অভিরুচির ওপরই নির্ভর করে। সাধারণতঃ দু ব্যক্তির মিলন ঘটলে যে অবস্থা হয়, এক্ষেত্রেও তাই হল—সুফী তাসাউফের তার মৌলিক বিশুদ্ধতা হতে কতকটা সরে দাঁড়িয়ে, আর ভারতীয় সাধনা কতকটা অগ্রসর হয়ে, মিলনের পথ প্রশস্ত করে দিল। ফলে উভয় সাধনার রক্ষণশীল দিক ক্রমে ক্রমেই শিথিল হয়ে পড়ল। এই শিথিলতার সুযোগ গ্রহণ করেই, ভারতীয় সুফীরা অসংখ্য শাখা মণ্ডলীর প্রতিষ্ঠা করে ফেললেন। ফলে, ভারতের নানাস্থানে অসংখ্য মত দাঁড়িয়ে গেল—ভারতের সুফী জগৎ নিত্য নূতন মতের উদ্ভবে ধীরে ধীরে ভারাক্রান্ত

হয়ে ওঠল। এখন সুফী মতবাদের মৌলিক বিশুদ্ধতার কতকাংশ লোপ পেল, আর ভারতীয় সাধনার বৈশিষ্ট্যও কতকাংশ হ্রাস পেল। ফল কথা, ভারতের চিন্তা-জগত মিশ্রণ দোষে বা মিশ্রণ-গুণে ভরপুর হয়ে গেল। ভারত অচিরেই এই ভাবে মিশ্রণের বিরুদ্ধে একটি প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। সুফীদের মধ্যে এই প্রতিক্রিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবর্তক হলেন, শেখ আহমদ সরহিন্দী (১৫৬৩-১৬২৪)। তিনি মুজাদ্দিদ-ই-আলফ-ই-শানী" অর্থাৎ হিজরী "দ্বিতীয় হাজারের সংস্কারক" নামে পরিচিত। তিনি প্রধানতঃ নাকশবন্দীয়া সম্প্রদায় ভুক্ত সাধক এবং একজন মহাজ্ঞানী ও সুলেখক ব্যক্তি ছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীর ভারতবর্ষে তাঁর মত মহাপণ্ডিত ছিলনা বললেও অত্যুক্তি হয়না। তিনি সকল সম্প্রদায়ের সুফী ও ভারতবাসী মুসলমানদের সংস্কার সাধনে মনোযোগ দিলেন। হিন্দুগণও তাঁর প্রচারের হাত হতে নিষ্কৃতি লাভ করে নি। তাঁর সুপ্রসিদ্ধ ও গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ "মকতুবাত" (লিপিমালা) গ্রন্থ পাঠ করলে একদিকে যেমন তাঁর সংস্কার প্রচেষ্টা দেখে বিস্মিত হতে হয়, তেমনিই অন্যদিকে তাঁর "তাসাউফ" (ব্রহ্মবাদ) জ্ঞানের অতল গভীরতা দেখে অবাক হতে হয়। এই "মকতুবাত" গ্রন্থের মধ্যেই তিনি কখনও সুফীকে সৎপথে পরিচালিত করছেন, আর কখনও হিন্দুকে ইসলামের শিক্ষা ও সৌন্দর্য সুন্দর রূপে সহজভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। তাঁর এইরূপ সংস্কার মূলক প্রচারের ফলে চতুর্দিকে সাড়া পড়ে গেল,—শা অহ সম্প্রদায় তাঁর শত্রু হয়ে দাঁড়াল। এই সময় স্বয়ং সম্রাট জাঁহাঙ্গীরও বিচলিত হয়ে পড়লেন এবং তাঁকে বন্দী করলেন। কিন্তু কিছুকাল পরে সম্রাট নিজের ভুল বুঝতে পেরে তাঁকে কারাগার হতে মুক্তি দান করলেন এবং যুবরাজ খুর্রমকে (শাহজাহানকে) তাঁর হাতে দীক্ষা দান করালেন। কারাগার হতে মুক্তি লাভ করে শেখ আহমদ দ্বিগুণ উৎসাহ ও জোরে সংস্কার কার্য চালিয়ে ছিলেন। তাঁর নিকট হাজার হাজার লোক দীক্ষা গ্রহণ করেছিল। তিনি যে সংস্কারের ভিত্তি পত্তন করলেন। পরবর্তী কালে সম্রাট ঔরঙ্গজেব তাকে ব্যাপক ও

আরও কঠোর করে তুলেছিলেন। সুফীদেরকে সংস্কার করতে যেয়ে ঔরঙ্গজেব সারমদ নামক প্রসিদ্ধ সাধককেও হত্যা (১৬৫৯ খ্রীঃ) করেছিলেন। মুজাদ্দিদ-ই-আলফ শানীর মসী, অনেক ক্ষেত্রে ঔরঙ্গজেবের অসিতে পরিণত হয়েছিল। এইরূপ সংস্কারের ফলে ভারতে কাদেরীয়া ও নাকশবন্দীয়া সম্প্রদায় সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হল। জেনে রাখা অত্যাবশ্যক যে, এই শেষোক্ত সম্প্রদায় মুসলমানদের নিকট অনেকখানি সংস্কার পন্থী বলে গৃহীত হয়েছে,—ইসলাম বিরুদ্ধ ভাব ও চিন্তা যেন এই সম্প্রদায়ের বড় বেশী নেই। আর নাকশবন্দীয়া সম্প্রদায় মুজাদ্দিদ-ই-আলফ-ই শানীর নিজের সম্প্রদায়। সুতরাং এই সংস্কারের যুগে এদের বেশ আদর হল। এই সময় হতেই নাকশবন্দীয়া সম্প্রদায় "মুজাদ্দীয়া" নামে পরিচিত হল। ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে যে আমূল পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল, তার ফলে ধীরে ধীরে ভারত হতে সংস্কারের চেষ্টা দূরীভূত হল। রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে মুসলমানদের ধর্ম, সমাজ ও শিক্ষা প্রভৃতি যাবতীয় অবস্থার পরিবর্তন ঘটল,—ভারতীয় সুফী মতবাদের ধারা ও ভিন্ন পথে পরিচালিত হল। সে সকল বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা এ স্থলে বাহুল্য মাত্র।

॥ ৮ ॥

যদিও প্রাচীন বা প্রথম যুগের বঙ্গীয় সুফীদের কেউ কেউ তাঁদের বাণী লিপিবদ্ধ করে গেছেন বলে জানতে পেরেছি ; দুর্ভাগ্যবশতঃ নানা চেষ্টার পরেও, এ যাবৎ তা আমাদের হস্তগত না হওয়ায়, তাঁদের চিন্তার গতি ও মূল ধারার সঙ্গে তার সম্বন্ধের বিষয় অবগত হওয়া একরূপ অসম্ভব। তথাপি নিঃসন্দেহে বলতে পারা যায় যে, পঞ্চদশ এমন কি ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত বঙ্গীয় সুফীদের চিন্তার গতি প্রধানতঃ ভারতীয় সুফীদের দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হত এবং সেইজন্য তার সঙ্গে সমসূত্রে আবদ্ধ ছিল। তাই বলে বঙ্গীয় সুফীরা স্থানীয় প্রভাবের হাত হতে যে একেবারে মুক্ত ছিলেন তা নয়। উপাদানের অভাবে তাকে বেছে নেওয়া কঠিন। পরবর্তীকালে বঙ্গীয় সুফীদের যে

শোচনীয় অবস্থা ঘটেছিল, তার মূলে প্রধানতঃ স্থানীয় প্রভাবই ছিল বলে মনে হয়। অন্ততঃ ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত বঙ্গীয় সুফীগণ মূল বিষয়ে ভারতীয় সুফীগণকেই অনুসরণ করতেন। এইজন্য আমরা বঙ্গীয় ও ভারতীয় সুফী চিন্তাধারাকে এক বলেই মনে করি। ভারতীয় সুফী বিশেষতঃ বঙ্গীয় সুফীদেরকে বুঝতে গেলে, তাঁদের ভাবজগতের সঙ্গে সম্যক পরিচয় আবশ্যক। এই ভাবজগতে কালক্রমে কিরূপ পরিবর্তন ও বিবর্তন সংঘটিত হয়, তার চিত্র অঙ্কন করতে হলে, বিদেশীয় সুফীমতবাদের সঙ্গে ভারতীয় সুফীমতবাদের তুলনামূলক সমালোচনা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। আরবী বিশেষতঃ ফারসী ভাষায় আমাদের সম্যক ও গভীর জ্ঞানের অভাবে। এ কাজ আমাদের জন্য নিতান্তই দুঃসাধ্য সন্দেহ নেই। তথাপি স্বায় কৌতূহল নিবারণ করতে গিয়ে, এ বিষয়ে যে সামান্য অনুশীলন করেছি তার ফল সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হল। ইসলামের মূল মন্ত্র হল, তওহীদ বা আল্লাহ্‌র পূর্ণ সর্বাঙ্গসুন্দর একত্ববাদ। ভগবানের পূর্ণ ও বিশুদ্ধ একত্বকে মেনে নিয়েই ইসলাম ধর্ম আরম্ভ হয়েছে। "ঐসলামিক ভগবৎ সত্ত্বা" পূর্ণভাবে বিশুদ্ধ। সংখ্যা বাহুল্য ও ভাগ বাটোয়ারা হতে বিমুক্ত। এ ভগবত-সত্ত্বার বহুত্বকে এবং ঐহিক ব্যাপারে কোন জীবের অংশ গ্রহণকে স্বীকার করে না। ঐসলামিক ভগবান সৃষ্টির বহির্ভূত সর্বগুণান্বিত এমন এক পূর্ণ সত্ত্বা, যাকে মানুষ দেখতে পায়না, ধারণা করতে পারে। স্পর্শ করতে পারে না, অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করতে পারে; তিনি সৃষ্টি হতে বিমুক্ত ও এর স্বাভাবিক দোষগুণ হতে পবিত্র; সৃষ্টির ভেতর দিয়ে তাঁর লীলা মানুষের নিকট প্রকাশ পেলেও এর অবর্তমানে অন্য কোন বিচিত্ররূপে তাঁর এই অপরূপ লীলা প্রকাশ পেত। এইজন্য সৃষ্টিকে তাঁর একমাত্র প্রকাশ স্থল এবং তার অবর্তমানে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব থাকত কিনা সন্দেহ। ভগবত সত্ত্বাকে বর্ণনা করতে গিয়ে কোর আন বলছে। "বল (মোহাম্মদ) 'আল্লাহ্‌ এক। 'আল্লাহ্‌ তিনিই, যাঁর নিকট হতে কিছুই স্বাধীন ও মুক্ত নয়, তিনি (কাউকেও) জন্মদান করেন না এবং তিনিও (কারও নিকট

হতে) জাতক নন ; এবং তার তুল্য কেউ নেই। তিনি অনাদি, অনন্ত ও স্বয়ংভু।—তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন, সমস্তই তাঁর মুখাপেক্ষী। অতি সংক্ষেপে ঐসলামিক "তওহীদ" এর মূলমন্ত্র হল এটাই। এখন দেখা যাক, এই "তওহীদ" ভারতীয় সুফীদের এবং তৎসূত্রে বঙ্গীয় সুফীবাদের হাতে কিরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে কিরূপ ধারণ করেছে ? এ প্রসঙ্গে বলা হয় ভারতীয় সুফী মতে "তওহীদ" দ্বিবিধ। যথা : তওহীদ-ই-ওয়াজদী অর্থাৎ অস্তিত্ব প্রধান একত্ব এবং তওহীদ-ই-শহুদী অর্থাৎ প্রমাণ প্রধান একত্ব। প্রথমোক্ত "তওহীদ", একত্ব সম্বন্ধীয় ধারণার প্রথম অবস্থা, এবং শেষোক্ত "তওহীদ" এর দ্বিতীয় বা পূর্ণ পরিণত অবস্থা। প্রথমোক্ত অবস্থা সিদ্ধ হলে, শেষোক্ত অবস্থায় পূর্ণত্ব লাভ ঘটে। এই দ্বিবিধ তওহীদের সংজ্ঞা : এইরূপ তওহীদ-ই-ওয়াজদীঃ (অস্তিত্ব প্রধান একত্ব) তওহীদের এই অবস্থায় আল্লাহ্‌কে এক বলে ধরে নেওয়া, তিনি সর্বত্র বর্তমান আছেন বলে জানতে হয়, এবং যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থকে এই একক আল্লাহ্‌র যহূর বা অভিব্যক্তি বলে জ্ঞাত করতে হয়। এর মূল কথা হল, ঈশ্বর ভিন্ন কোন বস্তু নেই, তিনি সর্বভূতে বিরাজমান। সর্ববস্তুতে তাঁর অস্তিত্ব রয়েছে, ঈশ্বর এক হলেও পৃথিবীর প্রত্যেক স্থাবর জঙ্গমে বিদ্যমান আছে বলে, পৃথিবীর প্রত্যেক সজীব ও নির্জীব পদার্থ তাঁর প্রকাশ স্বরূপ। পৃথক পৃথক স্থানে ও পৃথক পৃথককালে তাঁকে পৃথক পৃথকভাবে দেখতে হবে। এই অবস্থায় কেবল অস্তিত্বই বৈশিষ্ট্য, এবং সর্বত্রই আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব দেখতে হয়। একমাত্র অস্তিত্বের ভাবই প্রধান বলে একে 'অস্তিত্ব-প্রধান-একত্ব' বলে উল্লেখ করা হল।

তওহীদ-ই-শহুদী (প্রমাণ-প্রধান একত্ব) : তওহীদের এই অবস্থায় 'সালিক' (আধ্যাত্মিক পথ-যাত্রী) সৃষ্টিকে ভুলে গিয়ে কেবল এক স্রষ্টাকেই দর্শন করেন। এক ঈশ্বর ভিন্ন তিনি আর কোন পদার্থই দেখতে পান না—অথচ পদার্থগুলির অস্তিত্ব বিদ্যমান। ভগবান আধ্যাত্মিক পথ-যাত্রীর মন এমনিই অধিকার করে বসেন যে, তিনি সমস্ত বস্তুর অস্তিত্ব ভুলে কেবল এক ঈশ্বরকেই দর্শন করেন। আকাশে

প্রকৃতপক্ষে সকল সময় তারকারাজি বিদ্যমান থাকলেও, সূর্য দিয়ে যেমন সূর্য ভিন্ন আর কিছুই দেখা যায় না, এই প্রমাণ প্রধান একত্বের অবস্থাও অনেকখানি তদ্রূপ। জাজ্বল্যমান চাক্ষুষ প্রমাণই এই অবস্থার বৈশিষ্ট্য! সুতরাং একে 'প্রমাণ প্রধান একত্ব' বলা হল। এই দ্বিবিধ তওহীদের মধ্যে ঐক্য ও অনৈক্য কোথায়, তাও একবার দেখা যাক। প্রথমোক্ত তওহীদে, বিভিন্ন সৃষ্টির ভেতর এক স্রষ্টা বর্তমান আছেন বলে কল্পনা করতে হয়, আর শেষোক্ত তওহীদে, সৃষ্টির কথা একেবারে ভুলে গিয়ে কেবল এক স্রষ্টাকেই দর্শন করতে হয়। একটি কল্পনার লীলায় লীলায়িত ও ভাব প্রবণতার ভাবে নিপীড়িত আর অপরটি জাজ্বল্যমান চাক্ষুস প্রমানের বিশ্বাসে ভরপুর। উভয়ের মধ্যে একত্ব বস্তুটি সাধারণ, —উভয়েই একত্বে বিশ্বাস পরায়ণ; তবে প্রথমোক্তটিতে বহু বিভিন্ন বস্তুর মিলন মূলক একত্ব, আর শেষোক্তটিতে স্বভাবজাত পূর্ণএকত্ব বিরাজমান। আমাদের এই বিবরণ হতে দেখা যাবে, 'অস্তিত্ব প্রধান একত্বের' পূর্ণ ও পরিণতি অবস্থা হল, 'প্রমাণ-প্রধান একত্ব'। ভারতীয় সুফীদের মতে যে পর্যন্ত "অস্তিত্ব-প্রধান-একত্ববাদীরা" ক্রমশঃ প্রধান একত্ববাদীর শ্রেণীতে উন্নীত না হন, সেই পর্যন্ত তাঁদের সিদ্ধিলাভ হয় না। তাঁরা বলেন, প্রত্যেক সৃষ্টির ভেতর ঈশ্বরের অস্তিত্ব কল্পনা করতে করতে, আধ্যাত্ম প্রেম সৃষ্টিকে ভুলিয়ে কেবল এক স্রষ্টাতেই আধ্যাত্মিক পথযাত্রীর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে দেয়। তখন আধ্যাত্মিক পথযাত্রী এক স্রষ্টা ভিন্ন আর কিছুই দেখতে পান না। এই অবস্থার নামই 'প্রমান-প্রধান একত্ব'। নাকশ বন্দীয়া সম্প্রদায় ভিন্ন ভারতীয় অন্যান্য প্রায় সকল সম্প্রদায়ের অগ্রে 'অস্তিত্ব-প্রধান-একত্ব' সিদ্ধ হয় ও পরে 'প্রমাণ-প্রধান একত্ব' সাধিত হয়। তওহীদ সম্বন্ধে নিম্নে কয়েকজন ভারতীয় সুফীর বাণী তাঁদের কবিতা সঙ্কলন হতে উদ্ধৃত করছি। আশা করি, এর দ্বারা পাঠকের সঙ্গে ভারতীয় সুফীদের চিন্তাধারার সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটবে। খাজা মঈনুউদ্দীন চিশতী (১১৪২-১২৩৬) সাহেব বলেছেন:—'আমি মূর্তির সৌন্দর্যের মধ্যে মূর্তি-নির্মাতার শরীর দেখেছি। (মূর্তি ও তার নির্মাতার মধ্যে) বিশুদ্ধ একত্ব বিদ্যমান। (তাই) আমি এখন মূর্তি

উপাসক। আমি যখন (আল্লাহ্‌র) গুণ ও সত্তার এককে অন্য হতে পৃথক দেখছি না। তখন যা আমি দেখি, আল্লাহ্‌ ব্যতীত আর কিছুই দেখতে পাই না। যে কোন দিকেই আমাকে নিয়ে যাও না কেন (প্রশংসা আল্লাহ্‌রই) আমি নিজেকে সে থেকে একেবারেই ভিন্ন দেখতে পাইনা। তুমি যদি তার (আল্লাহ্‌র) মুখ দেখতে ইচ্ছা কর, আমার চেহারার দিকে তাকাও, আমি তার দর্শন ; সে আমা হতে পৃথক নয়। আমি সত্য ঘোষণা করি না, আমার বন্ধু আদেশ করে—ঘোষণা কর। আমি যখন ঘোষণা করি না, প্রাণ প্রিয় আদেশ দেয়, কর। যা কিছু সে আমার নিকট ব্যক্ত করেছে, প্রত্যেকবার আমাকে আদেশ করেছে গুপ্ত রেখো। বুঝতে পারছি না কেন সে এইবার আদেশ করছে, ব্যক্ত কর। আশ্রমে সাধুর কাছে যা বলতে পারা যায় না, সে আমাকে আদেশ করে,—নিঃশঙ্কচিত্তে সকলের কাছে তা ঘোষণা কর। মনসূরের রহস্য গুপ্ত রাখা আমার মত মানুষের কাজ নয়। যখন গুপ্ত রাখি রজ্জু ও ফাঁস বলে,—ব্যক্ত কর। যে দিকেই আমি মুখ ফেরাই, তাঁর সৌন্দর্য দর্শন করি, কেন না আমার শরীরের প্রত্যেক অণু-পরমাণু তাঁর অভিব্যক্তিতে পরিণত হয়েছে। একদিন আমি কাবা মন্দির প্রদক্ষিণ করতাম। আর আজ তা আমাকেই প্রদক্ষিণ করছে। আমি ভূমিষ্ঠ হয়ে দৃষ্টিপাত করতেই দেখলাম, প্রেমিক, প্রিয়তম ও প্রেম এক অর্থাৎ তওহীদের রাজ্যে সমস্তই এক।' শরাফ-উদ্দীন আলী একজন ভারত-বিখ্যাত দরবেশ ছিলেন। পানিপথে তাঁর জন্ম হয় এবং সেখানে ১৩২৪ খ্রীষ্টাব্দে ১৫ই সেপ্টেম্বর তাঁর মৃত্যু ঘটে। তিনি একটি নূতন মণ্ডলী গঠন করেছিলেন। ভারতে তা "কলন্দীয়া" মণ্ডলী নামে প্রসিদ্ধ। তওহীদ সম্বন্ধে তাঁর ধারণা কিরূপ তারও নমুনা দেখান হল। 'প্রত্যেক দর্শনে প্রিয়তমকে দেখতে পাওয়া যায়। প্রতিটিধ্বনি প্রতিধ্বনিতে তাঁরই বিলাপ ও আকৃতি বিরাজিত। যা কিছু দেখতে পাও, প্রকৃত পক্ষে তা সমস্তই তিনি—প্রদীপ, পুষ্প, পতঙ্গ, বুলবুল সমস্তই তাঁর কাছ হতে এসেছে। তিনি তোমার ভেতর জন্মলাভ করেছেন, তুমি তোমার সম্বন্ধে অজ্ঞ।

ভারতীয় সুফীদের বাণী অনুসন্ধান করলে, এরূপ অসংখ্য কথা পাওয়া যায়। তাঁরা কিরূপে কোন পথে চলে ছিলেন তার আভাস তাঁদের বাণীতে লিপিবদ্ধ রয়েছে। এ সকল বিষয় দীর্ঘ আলোচনার স্থান এখানে নয়। সুতরাং আমরা আর তাঁদের বাণী আলোচনায় অধিকদূর অগ্রসর হলাম না। পাঠকগণকে তওহীদ সম্বন্ধে ভারতীয় সুফীদের যে পরিচয় প্রদত্ত হল, এর পরবর্তী প্রত্যেক মন্তব্য, এরূপ ভাবে তাদের বাণীর সাহায্যে প্রমাণ করা যেতে পারবে। ভারতীয় সুফীদের বিশ্বাসের (ঈমানের) দিক আলোচনার পর, তাঁদের কর্মময় লৌকিক দিকটুকুও আলোচনা করা নিতান্ত আবশ্যক। নইলে তাঁদের প্রতি নিতান্তই অবিচার করা হয়। তাঁদের বিশ্বাসের দিক যেরূপ হোক, তাঁরা ভারতবাসীর জন্য যা করেছেন, তা চিরদিনই ভারতের আদর্শ স্থানীয়। যুগে যুগে ভারতে মহাপুরুষ ও সদয়বান ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটেছিল, যুগে যুগে তাঁরা মূল্যবান বাণী প্রচার করে গিয়েছেন। নরের সেবা করে নারায়ণকে সন্তুষ্ট করবার কথা মূলতঃ ভারতেরই বৈশিষ্ট্য। এই মধুময় বাণী অনেক পরে পৃথিবীর নানাস্থানে নানা মহাপুরুষের বাণীর ভেতর দিয়েও প্রকাশ পেয়েছিল।

॥ ৯ ॥

ভারতের বুকে যুগে যুগে নানা সংসার ত্যাগী মহাপুরুষেরও আবির্ভাব হয়েছিল; জাগতিক সুখ, ঐশ্বর্য ও বিলাসের বিপক্ষে তাঁরাও আজীবন সংগ্রাম করে দেহত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু মুসলমান সুফীদের আগমনের পর হতে বিশেষতঃ ভারতে সুফীদের প্রভাব স্থায়ী হওয়ার পর হতে, হিন্দু মুসলমান যত সাধু ও মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছিল, ভারত ইতিহাসের আর কোন অধ্যায়ে তেমনটি হয়নি। মুসলমান সাধকদের আগমনের ফলে, ভারতের প্রাচীন সেবাধর্ম, ভারতের প্রাণের জিনিস সংসার নিস্পৃহতা ও বৈরাগ্য, এবং ভারতের অস্তোন্মুখ প্রাচীন সাধনা যেরূপ নূতন প্রাণ, নবীন বল, ও অভিনব শক্তি লাভ করেছিল, তা স্বীকার না করলে সত্যের অপলাপ করা হয়। নানা কারণে ভারতে চলচ্ছক্তি যখন থেমে গিয়েছিল

ভারতের দৌর্বল্য যখন চরমে উঠেছিল, তখন সুফীরা নব বল ও নূতন প্রেরণা নিয়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছিলেন। এদের কর্মের দিক আলোচনা করতে গেলে ভক্তিভরে মস্তক আপনিই অবনত হয়ে পড়ে। এরা একাধারে ভগবৎ প্রেমিক, তাই বিশ্ব প্রেমিক, এবং বিশ্ববিজয়ী কর্মী ছিলেন।

সংসারের সুখ, দুঃখ, জ্বালা, যন্ত্রণা হতে দূরে—বহুদূরে অবস্থান করে তাঁরা কর্ম ও সাধনার জন্য আত্মোৎসর্গ করে গিয়েছিলেন। তাই একটি শতাব্দী অতীত না হতেই, ভারতের প্রতি পল্লী ও জনপদ তাঁদের অবিশ্রান্ত ও অক্লান্ত কর্মতৎপরতায় পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। নির্যাতিত, নিপীড়িত, রুগ্ন ও ক্লিষ্ট মানুষের দুঃখে তাঁরা প্রাণ খুলে কেঁদে ছিলেন। তাঁদের নিরাশ ও মৃত প্রাণে সঞ্জীবনী সুধার সঞ্চারণ ও সংসার জ্বালা-পীড়িত ব্যর্থ ও ব্যথিত হৃদয়ে সহানুভূতি বহন এবং তাদের বধির শ্রবণে মন্ত্রশক্তি দান প্রভৃতি অসংখ্য কাজ করে তাঁরা ভারতের প্রাণ হরণ করেছিলেন। তাঁরা জাতির কথা চিন্তা করেন নি, সমাজের কথা ভাবেন নি। ধর্মের কথা স্মরণ করেন নি,—যেখানেই মানুষের পতন হয়েছে, যেখানেই মানুষের করুণ বিলাপ ও আর্তনাদ উঠেছে, মানের কথা ভুলে অপমানের কথা বিস্মরিত হয়ে, সেইখানেই স্বর্গীয় দূতের ন্যায় উদ্ধারের বাণী বহন করে ছুটে গিয়ে, তাঁদেরকে আপন কোলে স্থান দান করেছেন। তাঁরা ক্ষুধার্তকে আহার দিয়েছেন, নিরাশ্রয়কে ছায়া দিয়েছেন, পীড়িতকে শয্যাপাশে দাঁড়িয়ে অথবা শুভাশীর্বাদ সাহায্যে শুশ্রূষা করেছেন, মৃত্যুর পরে কাঁধে করে কবর দিয়েছেন। তাঁদের সংস্পর্শে বারাঙ্গনা মানুষ হয়েছে। পাপী পাপাচরণ ত্যাগ করে সন্ন্যাসী সেজেছে, স্বার্থপর, কর্ণের মত বা হাতিমের ন্যায় দাতা হয়েছে। সংসারী পরোপকারে আত্ম বিলিয়ে দিয়েছে। তাঁরা জিতেন্দ্রিয়, ভোগ বিলাস বিমুখ ও সংসার বিরাগী সন্ন্যাসী ছিলেন বলে, মানুষ কখনও কখনও তাঁদেরকে অতিমানুষ বা দেবতা বলেও ভ্রম করেছে। তাঁদেরকে দেখলে বাস্তবিকই নিস্পৃহতা ও শান্তির দূত বলে মনে হত; তাই মানুষ আপনিই তাঁদের পাশে ছুটে

চলত। মানুষের এই অযথা অত্যাচার হতে তাঁদের কেউ কেউ দূরে থাকতে চেষ্টা করেছেন—কিন্তু তাই বলে তাঁরা কখনও মানুষকে ঘৃণা করেন নি। তাঁদের কর্মময় নৈতিক দিক বাস্তবিকই ভারতবাসীর জন্য আশীর্বাদ স্বরূপ। তাঁদের এই দিকটি খাজা মঈনুউদ্দীন চিশতী সাহেবের এই কটা বাণীর ভেতর হতে উজ্জ্বল ভাবে ফুটে উঠেছে :—'যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার বন্ধু ও তাঁকে বাঞ্ছিত বলে মনে করবে। তার মধ্যে চারটি বস্তু পাওয়া যাবে,—ভদ্রতা, প্রেম, বদান্যতা ও সংসঙ্গ।' এ তিনটি বস্তু মানব হৃদয়ে মুক্তা স্বরূপ,—শত্রুর সঙ্গে মিত্রতা করা, আত্মদৈন্য গুপ্ত রাখা, স্বীয় দুঃখ কারো নিকট ব্যক্ত না করা।

"যিনি দরিদ্র, ক্ষুধার্ত, পীড়িত ও মৃতের বন্ধু হন ; আল্লায় আত্ম সমর্পণ করা ও কারো মুখাপেক্ষী না হওয়া তাঁর উচিত। চিশতীয়া মণ্ডলীর আরো কতকগুলি শিক্ষা আলোচনার যোগ্য। এই সম্প্রদায় ভুক্ত দরবেশরা এই উপদেশ ও শিক্ষাগুলি মেনে চলে থাকেন। এই শিক্ষাগুলিতে এই মণ্ডলীর কৃচ্ছ্র সাধন ও সন্যাসের দিকই অধিক পরিস্ফুট। সম্প্রদায় ভুক্ত হলেই, তাঁদেরকে শিক্ষা দেওয়া হয়। বিপদকে করুণা, বিষাদকে আনন্দ ও উপবাসকে গৌরব বলে মনে করবে ; বেদনা ও আরামকে এক বলে গণ্য করবে। সৎলোকের সংসর্গ রাখবে ; দরিদ্রকে ভালবাসবে ; সাংসারিক ব্যক্তি হতে দূরে থাকবে ; ধনীদের কাছে কিছু চাইবেনা ; অভাব মোচনার্থে আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করবে ; আল্লাহ্‌তে আত্ম সমর্পণ করবে ; সমস্ত কাজ আত্ম-নির্ভর করে তাঁর হাতেই ছেড়ে দেবে ; মিথ্যা ও পরনিন্দা হতে আত্মরক্ষা করবে ; গুরুর সঙ্গ ত্যাগ করবে না ; ভগবদ্ভক্ত মধুর বাণী অনুধাবণ করবে ও তাঁদের কাহিনী অপর্যাপ্ত রূপে পাঠ করবে।" আমাদের উপরোক্ত আলোচনা, বিষয়ের গুরুত্ব হিসাবে নিতান্তই সংক্ষিপ্ত ও অপ্রচুর হলেও, আশা করি ভারতীয় সুফীদের মধ্যে কতটুকু ভারতীয় এ ভাব অচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত হয়ে রয়েছে ; তার একটি মোটামুটি আভাস মিলবে। পাঠকদেরকে চিন্তা করে দেখবার অবসর দেওয়া

এবং তুলনা করে বুঝে নেবার সুযোগ দেওয়ার জন্যই এর পাশে বিশুদ্ধ ঐসলামিক 'তওহীদ' কে অতি সংক্ষেপে আলোচনা করেছে। ভারতীয় সুফীদের পরিবর্ধিত 'তওহীদ' হতে ঐসলামিক তওহীদ টুকুকে বাদ দিলে দেখা যাবে, এর অবশিষ্টের অধিকাংশই বিশুদ্ধ ভারতীয় উপাদান হতে গৃহীত হয়েছে। হিন্দুদের "সর্বং খলিদং ব্রহ্মবাদ" এর গোড়ায় অপর্যাপ্ত পরিমাণে রস সিঞ্চন না করলে, ভারতীয় সুফীদের এই 'তওহীদ' বা ব্রহ্মবাদ কোন পথ অবলম্বন করত, তা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। কালক্রমে ভারতীয় সুফীমতবাদের সঙ্গে উপনিষদ প্রমুখ ভারতীয় দর্শনের চিন্তাধারা ধীরে ধীরে মিশে গিয়ে এদেশে সুফী মতবাদও সেই চিন্তা ধারায় পরিপুষ্টি সাধন করতে করতে ভারতবাসীর হৃদয় জয় করতে লাগল। এ স্থলে প্রসঙ্গক্রমে আর একটি বিষয়ের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা আবশ্যক।

ভারতে সুফী প্রভাব পড়বার পূর্ব হতে, সুফী মতবাদ ভারতীয় চিন্তা ধারায় পরিপুষ্ট হতে থাকে। খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতেই ভারতে সুফীমত প্রবেশ করে। তৎপূর্ব-সুফীমতেও ভারতীয় দর্শন ও চিন্তা ধারার স্পষ্ট ছাপ দেখতে পাই। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বহু গবেষণার পরেও সুফীমত-বাদের মধ্যে যে ভারতীয় দর্শনের ছাপ রয়েছে, তাকে অস্বীকার করতে পারেন নি। মুসলমানগণ একথা স্বীকার করুন, না করুন, কোন নিরপেক্ষ ও উদার ব্যক্তি একথা অস্বীকার করতে পারবেন না যে, ভারতীয় চিন্তায় পরিপুষ্ট না হলে খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দী পূর্ব সুফীমত বর্তমানে আমরা যে অবস্থায় লাভ করেছি, এইরূপ অবস্থায় কখনও লাভ করতাম না। সে যাই হোক, সুফীমতবাদের প্রারম্ভকাল হতে এর ওপর ভারতীয় প্রভাব পড়তে থাকে। ভারতীয় প্রভাব খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত, অন্তরাল হতে সুফীমতবাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে থাকলেও এর ভারত প্রবেশের পূর্বে, ভারতীয় চিন্তা প্রকাশ্যভাবে সুফীমতবাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল বলে মনে হয় না। এতদিন ভারতীয় প্রভাব অন্তরাল হতেই ভারতীয় পুস্তকের আরবী ও ফারসী অনুবাদ ও ভারতীয় (অর্থাৎ বৌদ্ধ) ভ্রাম্যমান সাধু (অর্থাৎ

ভিক্ষু) সন্ন্যাসী প্রভৃতির ভেতর দিয়ে গোপনে গোপনে ওঠন্ত সুফীমতবাদের মূলে রস সিঞ্চন করেছিল। অনুবাদের দিক হতে চিন্তা করলে আমরা দেখতে পাই, 'আব্বাসী' বংশীয় খলীফা আলমনসুর (খ্রীঃ ৭৫৪-৭৭৫) এবং হারুন-আর-রসীদ (খ্রীঃ ৭৮৬-৮০৯) প্রমুখ খলীফাদের পৃথিবীর জ্ঞান বিজ্ঞান আহরণের প্রচেষ্টাই প্রাথমিক যুগের সুফীদের সঙ্গে ভারতীয় চিন্তাধারার পরিচয় ঘটিয়ে দিয়েছিল। এই সময়ে, অনেকগুলি ভারতীয় পুস্তক, হয় সোজা সংস্কৃত হতে, নতুবা সংস্কৃত হতে পাহ্‌লবী (অর্থাৎ প্রাচীন ফারসী) ভাষায় অনুবাদিত পুস্তক হতে আরবী ভাষায় অনুবাদিত হয়। এই অনুবাদিত পুস্তকের মধ্য হতে, এস্থলে 'বুদদ' পুস্তক (এই পুস্তকে বুদ্ধদেবের মতবাদ লিপিবদ্ধ আছে) এবং বলৌহর বুদাসাফ "বা বরলাম্‌ ও যোসফত"। এই যে আব্বাসী খলীফাদের সময় হতে মুসলমানদের বিদেশীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান আহরণের প্রচেষ্টা চলল, খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দী বিদ্যোৎসাহী সময়, জ্ঞান আহরণের কাজ সুচারুরূপে চলেছিল। তদ্ব্যতীত বিশিষ্ট বিশিষ্ট জ্ঞান পিপাসু ব্যক্তিরা নানা দেশ বিদেশের জ্ঞান আহরণে জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন। এই সকল বিষয় বিস্তৃতভাবে বলবার স্থান এ নয়। যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি প্রধানতঃ আপন প্রেরণায় পরদেশের জ্ঞান আহরণে নিযুক্ত ছিলেন, তার মধ্যে এ স্থলে বিশ্ব বিশ্রুত মহাপণ্ডিত আল বিরূণীর নাম উল্লেখ না করে পারা যায় না। খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে তিনি পতঞ্জলীর দর্শনও কপিলের সাঙ্খ্য—সূত্রকে আরবী ভাষায় অনুবাদ করে, মুসলিম জগতের জন্য রহস্যময় ভারতীয় দর্শনের দ্বার অবারিত করেন। ভারতীয় সুফীদের পূর্ববর্তীরা যে এ দ্বারা মোটেই প্রভাবিত হন নি, তা নিশ্চয় করে বলতে যাওয়া মূর্খতা বই আর কিছুই নয়! বৌদ্ধদের সঙ্গে দু ভাবেই প্রাচীন মুসলমানেরা পরিচিত হন। প্রথমতঃ আব্বাসী বংশীয় খলিফাদের সময়ে ভ্রাম্যমান বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ আরবের নানাস্থানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। জাহিরের (মৃঃ-৮৬৬ খ্রীঃ) বিবরণ হতে আমরা এ হেন একদল ভারতীয় সাধুর সন্ধান লাভ করি। তাঁদেরকে জাহির 'যিনদীক' সাধু

বলে অভিহিত করলেও আমরা তাঁদেরকে কেবল 'ম্যানীফিয়ান' বা ম্যানী সম্প্রদায়ভুক্ত বলে ছেড়ে দিতে পারি না। জাহিরের বিবরণ হতে বোঝা যায়, এঁরা ভারতীয় সাধু বিশেষতঃ বৌদ্ধ ভিক্ষু হোন বা না হোন অন্ততঃ বৌদ্ধ ভিক্ষু ভাবাপন্ন সাধু ছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর পূর্বে মুসলমান রাজ্য যখন বোখারা ও সমরকন্দ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়ে, তখন পূর্ব পারস্য ট্রানসক্রানিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে বৌদ্ধভিক্ষুদের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। যে বলখ্ শহর হতে অসংখ্য মুসলমান সুফী জন্মলাভ করেন, তাতে বৌদ্ধ বিহার তখনও বেশ জাগ্রত ছিল। বলখ্ অধিপতি ইব্রাহীম বিন-অদহম্ (খৃঃ—৭৭৭ খ্রীঃ) রাজ্য ত্যাগ করে বুদ্ধদেবের মতই সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। এই সকল বিষয় চিন্তা করলে দেখা যাবে, ভারত প্রবেশের পূর্ব হতেই সুফী মতবাদ নানাভাবে ভারতীয় প্রভাবে প্রভাবিত হতে থাকে।

॥ ১০ ॥

তারপর খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে সুফীমতবাদ নিয়মিত ভাবে ভারতে প্রবেশ করলে হিন্দু যোগ ও দর্শনের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে। তা পুস্তকের সাহায্যে যতদূর সাধিত হয় নি, ভারত-আগত সুফীদের সঙ্গে, ভারতীয় হিন্দু সাধু সন্ন্যাসীর সংশ্রব সাহায্যে ততোধিক সাধিত হয়। ভারতীয় ও ভারত আগত সুফীদের বিস্তৃত জীবনী পাঠ করলে দেখা যায়, তাঁরা নানা মতাবলম্বী ভারতীয় সাধুদেরকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষাদান করেছেন। অথবা ভারতীয় সাধুদের সঙ্গে অলৌকিক ক্রিয়া-কাণ্ডের দ্বারা, কি তর্কের দ্বারা পরাজিত করতে চেষ্টা করেছেন। খাজা মঈনুউদ্দীন চিশতী (১১৪২-১২৩৬ খ্রীঃ) হতে আরম্ভ করে ভারতীয় প্রত্যেক সুফী হিন্দু সাধু সন্ন্যাসী ও ব্রাহ্মণের সংশ্রবে এসেছেন। এহেন সংশ্রবের ফলে, উভয় শ্রেণীর সাধকের ওপর উভয়ের প্রভাব বিস্তার নিতান্তই স্বাভাবিক। ওপরে সুফীমতবাদের মধ্যে ভারতীয় প্রভাব প্রবেশের যে সকল পথ নির্দেশ করা হল, তা হতে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়ে যায়, ভারতীয় প্রভাব সুফীমতবাদ উদ্ভবের সময় হতে আরম্ভ করে তার ভারতে প্রবেশের পর পর্যন্ত, এটি ভারতীয় প্রভাব হতে মুক্ত ছিল

না। সুফী মতবাদ ভারতে প্রবেশ করলে, তাতে ভারতীয় প্রভাব অসম্ভাবিত রূপে ক্রিয়া করেছিল। নিম্নে আমরা সংক্ষেপে এই ক্রিয়ার স্বরূপ নির্ণয় করতে চেষ্টা করব। পূর্বে আমরা দেখেছি, খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর পূর্ব সুফীমতবাদে কি প্রবলভাবে বিশ্বব্রহ্মবাদ দেখা দিয়েছে। তার মূলে ভারতীয় চিন্তাধারা যদি কোন ক্রিয়া না করে, দৃঢ় একেশ্বরবাদী মুসলমান, এ কোথা হতে লাভ করেছিল? সত্যই পৃথিবীর সকল যুগের মর্মবাদী সাধকের মধ্যে, কোন কোন সময় এহেন মানসিকতা প্রকাশ পেয়েছে;—তাঁদের ওপর ভারতীয় প্রভাব আরোপ করা যায় না। সেই হেতু, সুফীমতবাদের ঐতিহাসিকতা ও পারিপার্শ্বিকতার কথা স্মরণ রাখলে, এর ওপর ভারতীয় প্রভাব একেবারে অস্বীকার করা অসম্ভব। হয়ত, অপরাপর দেশের মর্মবাদী সাধকদের মধ্যে যেমন দেখা দিয়েছিল, তেমনিই মুসলমান মর্মবাদী সাধকদের মধ্যেও স্বাভাবিক ভাবে বিশ্বব্রহ্মবাদ দেখা দিয়েছিল। তবুও স্বীকার করতে হয়, এই স্বাভাবিক বিকাশটি ভারতীয় প্রভাবে সজাগ ও বলিষ্ঠ হয়ে ওঠেছিল। তাই, আমরা দেখতে পাই, একাদশ শতাব্দীর পূর্ব সুফীমতবাদে। যে বিশ্বব্রহ্মবাদ দেখা দেয়, তা ইসলামী আবছায়ায় আবৃত। তাতে ঠিক 'সর্বং খালদং ব্রহ্মবাদ' বলা চলে না। একে সাবধানতার সঙ্গে মর্মবাদের অস্পষ্ট দিক বলে উল্লেখ করা সমীচীন। এই চিন্তাধারার শৃংখলা নেই, যেন একটু অস্পষ্ট। একটু বাতুলতা প্রযুক্ত। এ যখন পারস্যে এসে কিছুদিন বাস করল, তখন যেন একটু শৃংখলা লাভ করল, একটু স্পষ্ট হল। এইরূপ হওয়ার কারণ ভারতীয় ও আর্যপ্রভাব। চিরদিনই ভারত ও পারস্যের আত্মা সমসূত্রে গ্রথিত। ভারত, পারস্যের মধ্যস্থতায় হোক কি সোজাসুজিই হোক, সুফীদের ওপর প্রভাব বিস্তার না করলে, সুফীমতবাদ পারস্যে এসে স্পষ্টতর হত কিনা সন্দেহ। তারপর সুফীমতবাদ যখন ভারতে প্রবেশ করে, তখন হতে এটি ভারতীয় প্রভাব পরিপুষ্ট হয়ে বিশ্বব্রহ্মবাদের ভিত্তি সুদৃঢ় করে। পারস্যবাসী সুফীদের 'হামাহ্ উস্ত' সকল বস্তুই ভগবান অর্থাৎ বিশ্বব্রহ্মবাদ, ভারতে এসেই পূর্ণভাবে বিকাশ পায়, অর্থাৎ পারস্যের 'হামাহ্ উস্ত' ভারতে এসে সর্বং খলিদং ব্রহ্মবাদে পরিণত হয়।

সুফীদের 'ফনা' বা অহং লোপ মতবাদের গোড়ায় ও ভারতীয় প্রভাব সুস্পষ্ট। পারস্যের অন্তর্গত বিসত্বামের মর্মবাদী সাধক বায়িযীদ (খৃঃ অঃ) এই মতের প্রতিষ্ঠা করেন। বায়িযীদ বিসত্বামীর গুরু আবু আলী সিন্ধুদেশবাসী ছিলেন। সুতরাং বায়িযীদ এই মতবাদের ধারণাটি যে তাঁর গুরুর নিকট হতে লাভ করে ছিলেন, তা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। ফনার মধ্যে ভারতীয় প্রভাব নিহিত আছে বলেই, সর্ব বিষয়ে না হলেও এর সঙ্গে অনেক বিষয়ে 'নির্বাণ' মতবাদের মিল রয়েছে। জগত হতে সমস্ত সম্বন্ধ ছিন্ন করে আল্লাহ্‌র সঙ্গে মিশে যাওয়ার অবস্থার নামই 'ফনা'। আর জগতের পাপ হতে, কর্ম হতে মুক্ত হয়ে, ভগবত প্রাপ্তি ঘটলে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের 'নির্বাণ' লাভ ঘটে। ভগবত লাভের নূতন পন্থা উদ্ভাবন করতে গিয়ে নাকশ্‌বন্দীয়া মণ্ডলী, মানব শরীরে পরমার্থ আলোকের ছাট বিশিষ্ট "লতীফা" বা 'আলোক কেন্দ্র" নির্ধারিত করেছে। ভারতীয় অন্যান্য মণ্ডলীগুলি পরবর্তী সময়ে এই 'ষড় আলোক কেন্দ্র'কে স্বীকার করে নিয়েছে। লতীফা সাধন প্রয়াসী ভারতীয় সুফীদের প্রধান উদ্দেশ্য হল কোন কোন বিশিষ্ট পদ্ধতির অনুসরণ করে 'লতীফা' নির্গত বিবিধ বর্ণের আলোকমালার ধ্যান করতে করতে এক এক আলোককে, এক কেন্দ্র হতে অন্য কেন্দ্রে স্থানান্তরিত করা। এইরূপে আলোকমালা স্থানান্তরিত করতে করতে না কি সুফীর সমগ্র শরীর আলোকিত হয়ে ওঠে এবং তিনি নিজেকে মৌলিক আলোকের সঙ্গে এক বলে মনে করতে থাকেন এবং পরিশেষে তার সঙ্গে একেবারে মিশে এক হয়ে যান। নাকশবন্দীয়া মণ্ডলীর এহেন ভগবৎ লাভের পন্থা নির্ধারণ, হিন্দু যোগ শাস্ত্রের 'কুণ্ডলিনী' সাধনের অনুকরণ বই আর কিছুই নয়। এই উভয়বিধ পদ্ধতির মধ্যে বিশেষ কোন বিরোধ নেই। ভারত হতে এ লাভ না করলে এদেশীয় সুফীরা তা কোথা হতে পেয়েছিল? প্রধান প্রধান প্রাচীন সুফী এবংবিধ পন্থার বিশেষ কোন আবশ্যকতা উপলব্ধি করেন নি। প্রকৃতপক্ষে এইরূপ পন্থার মধ্য দিয়ে ভগবৎ প্রাপ্তিকে অনৈসলামিক পন্থা বলে উল্লেখ করা যায়। ভারতীয় সুফীদের ওপর এদেশীয় প্রভাবের স্বরূপ জানবার পর, স্বতঃই মনে একটি

কৌতূহল জাগে—কিরূপে এই প্রভাব সুফী মতবাদের মত এতখানি বিদেশীয় একটি নূতন চিন্তাধারার প্রভাব বিস্তার করল? এবং কখন কিভাবে তার ক্রিয়া চলেছিল? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে যাওয়া বিপজ্জনক ও অত্যন্ত শক্ত ব্যাপার। সময় সম্বন্ধে উত্তর দেওয়া একরূপ অসম্ভব—কারণ এ বিষয়ে এখনও সম্যকরূপে অনুশীলন হয় নি। সাধারণ ভাবে এইটুকু পর্যন্ত বলতে পারা যায়, দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হতে এর আরম্ভ হয় এবং কবীরের পর হতে তা ক্রমশঃই চরমে ওঠতে থাকে। কিরূপে সুফীমতবাদে ভারতীয় প্রভাব প্রবেশ করল, তার সামান্য পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হচ্ছে :—সুফীরা আল্লাহ্‌র সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলে থাকেন, আল্লাহ্‌ আকাশ ও পৃথিবীর আলোক স্বরূপ। পরবর্তীকালে এই মত একটু পরিবর্তিত হয়ে রং ধরল, সৃষ্টিই আল্লাহ্‌র আলোক স্বরূপ অর্থাৎ যেহেতু আল্লাহ্‌ আলোক এবং সৃষ্টি তাঁর আলোক স্বরূপ। সেই হেতু সৃষ্টির বাইরে তাঁর অস্তিত্ব নেই। সৃষ্টির ভেতর দিয়েই তাঁকে প্রকাশিত হতে হয়। সুতরাং সৃষ্টি না হলে তাঁর প্রকাশ হয় না—ইত্যাকার মত দাঁড়িয়ে যেতে লাগল। আরও পরবর্তীকালে এর সঙ্গে উপনিষদের সৃষ্টিবাদ মিলিত হয়ে আরও একটু নূতন রং ধরল।

এই সৃষ্টিবাদ মিলনের ফলে সুফীদের মধ্যে কত যে নূতন নূতন সৃষ্টি রহস্যের উদ্ভব তার ইয়াত্তা নেই। সুফীরা বলে থাকেন ইসলামে 'শরীয়ত' বা কর্মভাগের যেমন 'কলিমা', 'নামায', 'রোজা', 'হজ' ও 'যাকাত'—এই পাঁচটি সর্বপ্রধান বিষয় রয়েছে, তেমনি 'ত্বরীকত' বা মর্মভাগেরও যিকর 'রাবিতা' (সংযোগ সূত্র), ও মুরাক্কিবাহ" (ধ্যান) এই তিনটি প্রধান বিষয় রয়েছে। কর্মভাগের কর্তব্য পঞ্চকের কোন একটি পালন অথবা বিশ্বাস পর্যন্ত না করলে, যেমন প্রকৃত মুসলমান হওয়া যায়না, ঠিক তেমনিই মর্মভাগের ত্রি কর্তব্যের কোন একটি সম্পাদন না করলেও নাকি প্রকৃত সাধক হওয়া দায়।

যিকর বা জপঃ আল্লাহ্‌র পবিত্র নাম "আল্লাহ্‌ শব্দকে সতত" জপ

করার নাম 'যিকর'। মনকে সংসার চিন্তা হতে বিশুদ্ধ ও নির্মল করে কেবল ভগবৎ চিন্তায় বিভোর করে রাখবার জন্য প্রাথমিক অনুষ্ঠান হল 'যিকর'। কোন মানসিক বিষয় সাধন করতে হলে সে বিষয়ে গভীর একাগ্রতা নিতান্ত প্রয়োজন। ভগবানের চিন্তায় একাগ্রতা বৃদ্ধির জন্য, এই 'যিকর' আবশ্যকীয়। এটি যেন বীজ বপনের পূর্বে ক্ষেত্র প্রস্তুত করবার পন্থা। মনকে সমস্ত চিন্তা হতে ফিরিয়ে নিয়ে একমাত্র ভগবৎ চিন্তায় পরিচালিত করতে হলে, ভগবানের নাম সতত ভক্তিভরে জপ করতে হয় এবং তারদ্বারা ভক্তের সমস্ত চিন্তা ভগবানময় হয়ে যায়। এইরূপে ভাগবৎ চিন্তার লীলাক্ষেত্র মানব-হৃদয়, কেবল ঈশ্বর চিন্তায় ভরপুর হয়ে উঠলে মানব ভগবান সম্বন্ধে উচ্চচিন্তা করতে সমর্থ হয়। সুফীদের এই 'যিকর' কালক্রমে ভারতীয় কৃচ্ছসাধন মূলক জপে পরিণত হল। ভারতীয় সাধু সন্ন্যাসীরা যে প্রণালীর সাহায্যে ভগবানের নাম জপ করতেন, ঠিক সেই প্রণালীর অনুসরণ করে ভারতীয় সুফীরা (এবং তাঁদের সম-সাময়িক কতিপয় অন্যান্য দেশের সুফীও) পূর্ব সুফীদের 'যিকর'কে বিশুদ্ধ ভারতীয় 'প্রাণামে' পরিণত করতে লাগলেন। পূর্ববর্তী সুফীদের সরল ও সহজ 'যিকর'কে কতকগুলি বিশিষ্ট বিশিষ্ট প্রকরণ, বিশেষ বিশেষ ভাব, নির্দিষ্ট নির্দিষ্ট সময় এবং স্থিরীকৃত সংখ্যার গণ্ডীর মধ্যে ফেলে নিরুদ্ধ শ্বাস ও দৈহিক কৃচ্ছতার আমদানী করে ভারতীয় সুফীরা একে সাধু সন্ন্যাসীর তপ জপ প্রাণায়ামের পর্যায়ে এনে দাঁড় করালেন। সুফীরা যে ধীরে ধীরে মূল হতে সরে পড়ছিলেন, তা হয়ত প্রথমতঃ তাঁরা বুঝতে পারেন নি—কিন্তু তাঁরা যে সরে পড়েছিলেন তা নিতান্তই সত্য।

॥ ১১ ॥

রাবিতা বা সংযোগ সূত্রঃ 'রাবিতা' শব্দের মৌলিক অর্থ হল, সংযোগ সূত্র। বাঞ্ছিতের সঙ্গে সংযোগ সাধনের জন্য, পরমার্থ বিষয়ে অভিজ্ঞ ও পরি ব্যক্তির সদুপদেশ ও সাহায্য নিয়ে বাঞ্ছাকারী ও বাঞ্ছিতের মিলন সূত্রে যে নৈতিক যোগসূত্র রচনা করে, তার নাম

'রাবিতা'। পরমার্থ বিষয়ে উপদেশ দাতার নাম 'মুরশিদ' বা গুরু। 'রাবিতায়' কোথাও গুরু পূজার বা গুরু ধ্যানের কথা নেই। গুরু পরমার্থ বিষয়ে অভিজ্ঞ বলে ভক্তকে উপদেশ দান করেন। আর ভক্ত তার উপদেশানুযায়ী কাজ করে স্বীয় চেষ্টায় বাঞ্ছিতের সঙ্গে মিলিত হন। এটি ঠিক জ্ঞান লাভের পথে শিক্ষকের কাজ। শিক্ষার্থী শিক্ষকের উপদেশ মত কাজ করে যে জ্ঞানার্জন করে, তা তার নিজস্ব চেষ্টা, একাগ্রতা ও ঐকান্তিক আগ্রহেরই মধুময় ফল। অর্জিত জ্ঞান ও তল্লাভে সতুপদেশ দানের জন্য শিক্ষার্থীর নিকট হতে শিক্ষক নৈতিক ভক্তি লাভ করবার একান্তই যোগ্য। কিন্তু পূজার বা ধ্যানের পাত্র নন। অথবা এমনও নয়, হৃদয়ের সমগ্র একাগ্রতা ও ভক্তি দিয়ে অহোরাত্র কেবল শিক্ষককে পূজা করলে, কিংবা শিক্ষকের মূর্তি ধ্যান করতে থাকলে আর সে স্বয়ংজ্ঞানার্জনে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকলে জ্ঞান আপনিই শিক্ষার্থীর ভেতর প্রবেশ করবে।

প্রাথমিক যুগের সুফীরা এহেন 'রাবিতার' কথাই চিন্তা করতেন। এতে অনৈসলামিক কোন কথা নেই। ধীরে ধীরে এই 'রাবিতা' সরে 'ফনা ফীশ-শেখ' বা 'গুরুতে বিলীন' অবস্থায় এসে দাঁড়াল। এই ফনা ফীশ শেখ হল,—শিক্ষার্থীর পক্ষে তার অভীপ্সিত আধ্যাত্ম জ্ঞানলাভের কথা ভুলে নিজের স্বাধীন ইচ্ছা ও মুক্ত বুদ্ধির ক্রিয়াকে, গুরুর ইচ্ছা ও বুদ্ধির মধ্যে সম্পূর্ণভাবে লীন করে দিয়ে স্বয়ং নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে জ্ঞান লাভের প্রত্যাশা করা। আরও ভীষণ কথা হল, এই অবস্থায় শিষ্যকে গুরুর বিদ্যমানতা কি অবিদ্যমানতা সকলক্ষেত্রে ও সকল সময়ে, কেবল গুরুর মূর্তিকেই হৃদয়ের মধ্যে অঙ্কিত করে ভক্তি শতদলে পূজা ও স্তিমিত নেত্রে ধ্যান করতে হয়। ভগবানের কথা দূরে রেখে, বাঞ্ছিতের কথা ভুলে, কেবল গুরুর মূর্তি ধ্যান করা কি ইসলামিক। এই রাবিতা ভারতে এসে কালক্রমে "ফনা ফীশ শেখ" হতেও অনৈসলামিকতার দিকে অগ্রসর হয়ে পড়ল। ভারতের মূর্তিপূজা ও ভক্তিবাদ, "ফনা ফীশ শেখ" কে পূজার খেয়ালে এবং তদানুষঙ্গিক ভক্তির প্রাবল্যে ভরে দিল। 'রাবিতা' সর্বপ্রথম নৈতিক যোগসূত্র ছিল; পরে গুরুমর

ভাবে পূর্ণ হয়ে ওঠে, উপায়ের দ্বারা অভীষ্ট পশ্চাতে পড়ে গেল; আরও পরে ভারতে এসে তা স্পষ্ট গুরুপূজা এবং দেবোপম ভক্তির আমেজে রঙ্গীন হয়ে ওঠল। সুফীদের মতে আধ্যাত্মিক পথ-যাত্রী (সালিক) নিরাকার ও নিরুপম ভগবানকে অন্তরে ধারণ করতে পারেন না বলেই নাকি সাকরে ও উপমা যোগ্য গুরুর প্রতিমা অন্তরে ধ্যান করবে, তাঁকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করবে, এবং তাঁর কথাকে কোরআনের কথা হতেও সমধিক জ্ঞান করবে। এ যেন হিন্দু দার্শনিকের প্রতিমা পূজার সাপক্ষে দর্শন সম্মত ব্যাখ্যা। নিরাকার ভগবানকে ধারণা করতে সাধারণের পক্ষে কষ্ট হয় বলে, কর্মভেদে তাঁর বিভিন্ন কাল্পনিক মূর্তি নির্মাণ করে, তার ভেতর দিয়ে সেই নিরাকার ভগবানকে পূজা ও ভক্তি করার বিধান। "রাবিতা"র ওপর এহেন অসম্ভব ভারতীয় প্রভাবের ফলে, ভারতের সর্বত্র, বিশেষতঃ সমগ্র বাংলা দেশে অজ্ঞ ও অশিক্ষিত লোকদের মধ্যে, আজ ভীষণ ভাবে পীর পূজা, তাঁদের প্রতি দেবোপম ভক্তির বহুল প্রচলন, এমন কি তাঁদের মৃত্যুর পর গোরপূজা প্রভৃতি অসংখ্য অনৈসলামিক কুসংস্কারের প্রচলন হয়ে, তা একশ্রেণীর মুসলমানের ধর্মের অঙ্গীভূত বস্তুতে পরিণত হয়ে গেছে।

॥ ১২ ॥

মুরাকিবাহ্ বা ধ্যান :—'যিকর' দ্বারা হৃদয়কে বিশুদ্ধ ও নির্মল করে; 'রাবিতার' দ্বারা অভিজ্ঞ গুরুর সদুপদেশ লাভ করার পর, ধীর, স্থির ও প্রশান্ত চিত্তে বসে, সংসারের কথা ভুলে গিয়ে আল্লাহ্‌র ধ্যান করার নাম "মুরাকিবাহ্।" এইরূপে পবিত্র, উপদিষ্ট, ধীর ও প্রশান্ত মনে আল্লাহ্‌র ধ্যান করতে করতে মানুষ নাকি স্বাভাবিক ভাবে জ্যোতির্ময় আল্লাহ্‌কে জ্যোতিষ্মান দেখতে পান, এবং সেই অপরূপ জ্যোতিতে আপনাকে বিলীন করে দিয়ে আপনার অস্তিত্বের কথা ভুলে যান। এটিই ফনা ফীল লাহ" বা পরমার্থে বিলীনতার অবস্থা। সুফীমতবাদ ভারতে আসবার পর হতে, এই মুরাকিবাহ" এর মধ্যেও পরিবর্তন দেখা দিল।

কালক্রমে ভারতীয় সুফীরা এতে নির্দিষ্ট ভঙ্গীয় বৈঠক, বিশিষ্ট প্রকারের মন সংযোগের উপায়, এবং বিশেষ বিশেষ ধ্যান ধারণার নূতন প্রণালী আমদানী করে ফেললেন। এইরূপ নূতন প্রণালী আমদানী করার ফলে, এ যে ভারতীয় যোগশাস্ত্রের পর্যায়ভুক্ত হয়ে ওঠছে, তা তাঁরা বুঝতে পারলেন কিনা, জানিনা। আদি সুফীদের সরল ও সহজ 'মুরাক্বিবাহ' ভারতে এসে কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই এইরূপে যোগশাস্ত্রের 'আসন', 'ধারণা', 'ধ্যান' ও 'সমাধির' চতুর্বেণীতে পরিণত হয়ে ওঠল। যোগ ও সুফী মতবাদের সম্মিলন ভারতে যে চতুর্বেণীর নবতীর্থ প্রতিষ্ঠিত হল, তাতে কেবল যে ত্রিবেণী ভক্ত ভারতবাসী হিন্দু অবগাহণ করে পরমার্থ পথ উন্মুক্ত করবার চেষ্টা করল তা নয়। পীর পূজক মুসলমানও এর মিলিত সলিলে স্নান করে আল্লাহ্‌র সঙ্গে সম্মিলনের পথ অন্বেষণ করতে লাগল। ওপরে যে ভারতীয় সুফীমতবাদের প্রবেশ, প্রতিষ্ঠা, বিস্তৃতি, পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের ধারা নির্ণয় করতে চেষ্টা করলাম, আশা করি, পাঠক তা হতে একটি সাধারণ জ্ঞান লাভ করতে পারবেন। বিষয়টি এত বিস্তৃত বিশাল ও কৌতুহল জনক যে অল্প কথায় বলতে পারা একরূপ মুস্কিল। বিশেষতঃ পরে বঙ্গদেশ সম্বন্ধে লিখতে গেলেই, ভারতীয় সুভীদের যে সকল বিষয় মনে রাখতে হবে, তার সঙ্গে পরিচয় করে দিতে না পারলে আমাদের বর্তমান উদ্দেশ্যই সফল হবেনা। আশাকরি, আমাদের বর্তমান সংক্ষিপ্ত ইতিহাস সে উদ্দেশ্য পূর্ণ করবে। সুতরাং আর অধিক দূর অগ্রসর হয়ে কাজ নেই।

॥ ১৩ ॥

বঙ্গদেশে সুফী প্রভাব প্রবেশের ধারা : বঙ্গীয় সুফীমত (অবশ্য খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত) কোন স্থানীয় মুসলিম চিন্তা-প্রসূত নবীন মতবাদ নয়; এ উত্তর ভারতীয় সুফীমতবাদের একটি শাখা মাত্র। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষপাদ হতে উত্তর ভারতীয় সুফী মতবাদের একটি ক্ষীণ ধারা বাংলায় প্রবেশ করতে থাকে। খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বাংলায় তুর্কী শাসন স্থায়ীত্ব লাভ করলে, উত্তর

ভারতীয় সুফীমতবাদের এই ক্ষীণধারা, অর্ধ শতাব্দীর মধ্যেই প্রবলভাব ধারণ করে একটি প্রকাণ্ড নদীতে পরিণত হয়। প্রধানতঃ গঙ্গার উভয় কূল ধরে উত্তর ভারতীয় সুফীমতবাদ বাংলায় প্রবেশ করেছিল। গঙ্গার দু কূল প্লাবী ত্বরান্তবাহী প্লাবন যেমন বাংলায় প্রবেশ করে এর বিশাল ও সমতল ভূভাগকে সরস ও উর্বরা করে দেয়, গঙ্গা তটবাহী উত্তর ভারতীয় সুফী ভাব ধারাও খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষপাদ হতে নিয়মিত ভাবে বঙ্গে প্রবেশ করে ভাব-প্রবণ বাঙ্গালীর হৃদয় ভূমিকে, অনতিবিলম্বেই সরস ও সজীব করে তুলে একটি নবীন ভাব, নূতন প্রেরণা ও অভিনব আকুলতার সবুজ রঙ্গে রঙ্গীণ করে দিয়েছিল। উত্তর ভারতীয় সুফীরা ইসলামের সাম্য, একতা, বদান্যতা, ভ্রাতৃভাব ও বিশ্ব মানব প্রীতির যে অমর বাণী বহণ করে বঙ্গে প্রবেশ করে দিগ্বিদিকে তার উড্ডীয়মান বিজয় বিজয়ন্তীর গতিরোধ করবার মত শক্তি তখন বাঙ্গালীর ছিলনা। বাংলা তখন সবে স্বাধীনতা হারিয়েছে। ক্ষমতা হারিয়ে, শক্তি বিসর্জন দিয়ে, নবসভ্যতা প্রদীপ্ত, নবীন প্রেরণা প্রণোদিত ওঠন্ত তুর্কীজাতির সম্মুখে দাঁড়াবার মত পৌরুষ বাঙ্গালীর ছিলনা বললেও অত্যুক্তি হয়না। বাস্তবিকই বাঙ্গালী তখন মেরুদণ্ড বিহীন। আত্মক্ষমতায় আস্থাহীন বাঙ্গালী সত্যই তখন ধীরে ধীরে প্রাচীন শিক্ষা ও সভ্যতায় বিশ্বাস হারিয়ে ফেলছিল। এই সময়েই ইসলামের অমর বাণীবাহী সুফীগণ ধর্ম প্রচারের দ্বারা যেরূপ দ্রুত গতিতে বাঙ্গালীর প্রাচীন শিক্ষা ও সভ্যতাকে গ্রাস করতে থাকে, তা চিন্তা করে দেখতে গেলে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়।

সুফীদের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সুফী ভাব প্লাবনে দেশের এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ভেসে গেল; হিন্দু সমাজের কঠোর বন্ধন, নৈয়ায়িকের কূটতর্ক। হিন্দু সাধক ও সন্ন্যাসীর আলৌকিক ইন্দ্রজাল, কিছুই এর গতিরোধ করতে পারল না। দেশে যে আকস্মিক ভাবের বান ডাকল, তা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয়ে ষোড়শ শতাব্দীতে এসে বাংলার ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ চৈতন্য দেবের (১৪৮৮—১৫৩৩ খ্রীঃ) আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সর্বপ্রথম বাধা প্রাপ্ত হল।

তারপর হতে, বর্ধিষ্ণু সুফী প্রভাবের ভাটা পড়ে, এবং ধীরে ধীরে মন্দীভূত হয়ে যেতে থাকে। সে যা হোক, বাংলার মুসলিম-চিন্তা জগতে উত্তর ভারতীয় মুসলিম-চিন্তা-জগতের আধিপত্য যত দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়েছিল, উত্তর ভারতের রাষ্ট্র-নৈতিক আধিপত্য তার এক তৃতীয়াংশ সময় পর্যন্ত বাংলায় স্থায়ী হয় নি। তুর্কী বিজয়ের পর একটি শতাব্দীও অতীত না হতেই, বাংলা উত্তর ভারতীয় রাষ্ট্রনীতির নাগপাশ ছেদ করে স্বাধীনতা অবলম্বন করেছিল: কিন্তু বাংলার মুসলিম চিন্তা জগৎ খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত উত্তর ভারতীয় মুসলিম-চিন্তা জগতের যত প্রকার আধিপত্য স্বীকার করেছে, তন্মধ্যে উত্তর ভারতীয় সুফী চিন্তার প্রভাবই সর্বশ্রেষ্ঠ। ভারতীয় ইসলামের (আরবের প্রাচীন ইসলাম্ ভারতের ইসলাম হতে পূর্বে) যত পৃথক ছিল, এখন তার শতগুণ পৃথক হয়ে পড়েছে; তাই ভারতীয় ইসলাম ও আরবীয় ইসলামের পার্থক্য স্তরে স্তরে, ভারতীয় ইসলামের আচার বিচার, সংস্কার-নীতি ও বিশ্বাস পরম্পরায় যেমন নানা সুফীভাব, চিন্তা ও বিশ্বাস সংশ্লিষ্ট রয়েছে, বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে এখনও যে তা ন্যূন সংখ্যায় পাওয়া যায় তাও নয়ই, বরং তা অধিক সংখ্যায় বিকৃত, অর্ধ বিকৃত বা অবিকৃত ভাবে পাওয়া যায়। এতেই সহজে অনুমান করা যায় বাঙ্গালী মুসলমানদের ওপর উত্তর ভারতীয় সুফীদের প্রভাব কত প্রবল ছিল।

উত্তর ভারতীয় সুফীরাই বাংলায় সুফী প্রভাবের মূল উৎস খ্রীষ্টিয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষপাদ হতেই উত্তর ভারতীয় সুফীরা বাংলার প্রতি বিশেষ ভাবে দৃষ্টিপাত করেন। এই সময় হতেই, উত্তর ভারতীয় প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ সুফী কর্তৃক আদিষ্ট ও উপদিষ্ট হয়ে তাঁদের শিষ্য প্রশিষ্যেরা বাংলায় আগমন করতে থাকেন। উত্তর ভারতীয় সুফীদের মধ্যে, বাংলায় সুফীভাব ও ইসলাম প্রচারের জন্য যাঁরা প্রধানতঃ দায়ী তাঁদের মধ্যে খাজা মঈনুউদ্দীন চিশতী (১১৪৪—১২৩৫ খ্রীঃ), খাজা কুতবউদ্দীন বখতিয়ার কাকী (১১৪২—১২৩৬ খ্রীঃ), শেখ [ফরী]দউদ্দীন গঞ্জ-ই-শকর (১১৭৪—১২৬৯ খ্রীঃ) শেয়খুল-মাশায়িখ

নিজামউদ্দীন আওলিয়া (১২৩৬—১৩২৫ খ্রীঃ) শেখ শরফউদ্দীন আলী-শাহ কলন্দর (মৃ ১৩২৪ খ্রীঃ), বদীউদ্দীন শাহ্-ই-মদার (১৩১৫-১৪৩৬ খ্রীঃ), শেখ আহমদ সরহিন্দী মুজাদ্দিদ-ই-আলফ-ই-শানী (১৫৬৩—১৬২৪ খ্রীঃ) প্রভৃতি সাধক গণই প্রসিদ্ধ। এই সাধকগণ বিভিন্ন সুফী সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন। তাঁদের শিষ্য-প্রশিষ্যেরা ও যে গুরুর সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই।

এই সকল সুফী সাধকের কর্ম-নিষ্ঠা ও আন্তরিক প্রচেষ্টায় ভারতের সর্বত্র ইসলাম প্রচারিত হয়েছে। ফলে যুগ যুগ ধরে ভারতের অস্তিত্বের সঙ্গে মুসলমানদের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ রূপে মিশে একাকার হয়ে গেছে। ভারতের বিভিন্ন জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলে এক. এক সম্প্রদায়ভুক্ত অখণ্ড এক। এক অপরের পারি পূরক।

[প্রথম খণ্ড সমাপ্ত]